পুলিশ সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

পুলিশ সংস্কার কমিশন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

---

১৫ জানুয়ারি ২০২৫

সূচিপত্র

ক্র:	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	২	৩
১।	পুলিশ সংস্কার কমিশনের গঠন ও কাঠামো এবং সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য	০১
১.১	পুলিশ সংস্কার কমিশনের গঠন ও কাঠামো	০১
১.২	কমিশন সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	০২
২।	প্রেক্ষাপট	০২
৩।	বাংলাদেশে পুলিশের ক্রমবিকাশ: ১৭৯২ থেকে অদ্যাবধি সংস্কার উদ্যোগ	০৩
৪।	উদ্দেশ্য	০৯
৪.১	মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশ বাহিনীর জন্য পরিকল্পনা/সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন	০৯
৪.২	জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা	১০
৪.৩	বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো হালনাগাদ করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রণয়ন করা	১০
৪.৪	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়ন	১০
৫।	কমিশন কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ	১০
৫.১	গবেষণা ও বিশ্লেষণ	১০
৫.২	‘কেমন পুলিশ চাই’ জনমত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ ও মতামত	১১
৫.৩	সিভিল সোসাইটির ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও মাঠ পরিদর্শন বিষয়াদি	২৫
৬।	কমিশন কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়াদি	২৯
৬.১	আইনি ও প্রবিধানিক: পুলিশ আইন, ১৮৬১সহ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং পিআরবি, ১৯৪৩ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ প্রস্তাব	২৯
৬.২	পুলিশ সদস্যদের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন সরলীকরণ, ঝুঁকি ভাতা/আর্থিক প্রণোদনা	২৯
৬.৩	মানবাধিকার ও আইনের শাসন	৩২

ক্র:	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	২	৩
৬.৪	বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, নির্যাতন এবং বেআইনি গ্রেপ্তার	৩৭
৬.৫	বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং রিমান্ড সংক্রান্ত	৩৯
৬.৬	মিডিয়া ট্রায়াল	৪৪
৬.৭	বল প্রয়োগ (use of force)	৪৫
৬.৮	পুলিশে সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বিভাগীয় মামলা ব্যবস্থাপনা	৫৫
৬.৯	বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তাবিত সংস্কার ও পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে key performance indicators (KPIs)-এর ভূমিকা	৫৮
৬.১০	বাংলাদেশ পুলিশের দুর্নীতি: বিস্তার, প্রকার ও প্রতিকার	৬০
৬.১১	সাইবার ক্রাইম, ইকোনমিক ক্রাইম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম	৬৫
৬.১২	সাইবার ক্রাইম, ইকোনমিক ক্রাইম, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম মোকাবিলায় দক্ষ প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি এবং আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক	৬৬
৬.১৩	চাকরিপ্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন	৬৭
৬.১৪	প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি: লোকবল, সাজসরঞ্জাম, অবকাঠামো, যানবাহন, অস্ত্র-গোলাবারুদ	৬৭
৬.১৫	ক্ষমতাকেন্দ্রিক পুলিশিং থেকে জনকেন্দ্রিক পুলিশিং	৬৮
৬.১৬	কমিউনিটি পুলিশিং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে আইনি কাঠামো ও বাজেট বরাদ্দ	৭৮
৬.১৭	সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৭৮
৬.১৮	প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা	৮২
৬.১৯	অবকাঠামো উন্নয়ন	৮৬
৬.২০	সার্ভিস ডেলিভারি উন্নয়ন/সম্প্রসারণ	৮৭
৬.২১	ভবিষ্যৎ টেক পুলিশিং	৮৭
৬.২২	বাংলাদেশ পুলিশের জন্য আইসিটি কোর গঠন:	৮৭
৬.২৩	প্রস্তাবিত জাতীয় জননিরাপত্তা/পুলিশ কমিশন	৮৯

ক্র:	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	২	৩
৬.২৪	মহিলা পুলিশসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	৮৯
৬.২৫	জেন্ডার ও শিশুবান্ধব পুলিশিং	৯২
৬.২৬	ভৌগোলিক অবস্থান ও পুলিশিং	৯৮
৬.২৭	সিআইডি ফরেনসিক সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	৯৯
৭।	সুপারিশমালা	১০২
৮।	সমাপনী মন্তব্য	১১০
৯।	সংলগ্নীসমূহ	১১১

নির্বাহী সারাংশ

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশকে একটি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব সফর রাজ হোসেন-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের কার্যক্রম আরও কার্যকর করতে পরবর্তীতে দুজন অতিরিক্ত সদস্যকে কো-অপ্ট করা হয়। সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য কমিশন প্রাথমিক (প্রাইমারি) ও মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি)- উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় মিক্সড মেথড পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যার অংশ হিসেবে 'কেমন পুলিশ চাই' শীর্ষক একটি জাতীয় জরিপ পরিচালিত হয়। পাশাপাশি পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ, পুলিশের নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত ভিকটিম, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারাগার কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিশন নরসিংদী জেলা কারাগার পরিদর্শন করে এবং সেখানে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে। সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বিভিন্ন গাইডলাইন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার প্রেরিত পুলিশিং সংক্রান্ত রিপোর্ট, জাতীয় পত্রিকা এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কে সৃষ্ট গভীর ক্ষত নিরাময়ের লক্ষ্যে বর্তমান পুলিশ সংস্কার কমিশন স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায়, এসব সুপারিশ পুলিশ বাহিনীকে আরও জনবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক হয়ে উঠতে সহযোগিতা করবে। কমিশন ১৫টি থিমেটিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—মানবাধিকার সুরক্ষা, বলপ্রয়োগ নীতি, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সংস্কার, অযাচিত হয়রানির (আটক/গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদকেন্দ্রিক) অবসান, বিদ্যমান বিভিন্ন সেবার মানোন্নয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুলিশের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং জনসম্পৃক্ত পুলিশিংয়ের প্রসার।

মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ সংস্কার কমিশন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করছে। এছাড়া, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দ্রুত তদন্তের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে মানবাধিকার সেল প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষায় একটি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং র‍্যাবের অতীত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি, গণঅভ্যুত্থানের সময় পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনায় দায়ী ব্যক্তি ও পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। মব নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বলপ্রয়োগনীতির ক্ষেত্রে, বর্তমান সংস্কার কমিশন পাঁচ ধাপের একটি বলপ্রয়োগ পরিকল্পনাকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার সুপারিশ করেছে, যা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন এবং ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন্সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর বলপ্রয়োগ নীতিমালার অনুসরণে সুবিন্যস্ত। এটি আধুনিক প্রযুক্তিগত কৌশল বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত, যা ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঝুঁকি এড়িয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

পুলিশের নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরণে একটি পৃথক পুলিশ কমিশন গঠনের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া যায়। এছাড়া 'কেমন পুলিশ চাই' শীর্ষক জনমত জরিপসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার মিটিংয়েও পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায়, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রমকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়ে এ কমিশন নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে, বিবেচ্য কমিশনের গঠন-কাঠামো, কার্যাবলি ও পরিধি কেমন হবে, তা আরও বৃহত্তর পরিসরে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সমীচীন হবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত বিদ্যমান আইনি কাঠামো বিশেষ করে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন্স (পিআরবি) সংশোধন বা হালনাগাদের জন্য বর্তমান সংস্কার কমিশন

সুপারিশ করেছে। এসব আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা সম্পূর্ণ নতুন আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে পুলিশকে জনবান্ধব, জবাবদিহিমূলক ও মানবাধিকার সংরক্ষণে সক্ষম একটি বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যে এই সকল প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন ও হয়রানি রোধে সংস্কার কমিশন বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেছে। কমিশন Civil Appeal No.53 of 2004-এ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা [8 SCOB (2016) AD] পরিপূর্ণ ও যথাযথ বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। কমিশনের সুপারিশে তল্লাশির সময় পুলিশ কর্মকর্তাদের পরিচয় প্রদানের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশি সেবার মানোন্নয়নে কমিশন থানায় জিডি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, তদন্ত ব্যয়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান এবং ফৌজদারি মামলার জন্য বিশেষায়িত তদন্ত দল গঠনের সুপারিশ করেছে। ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় চাকরিপ্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা অনুসন্ধানের বাধ্যবাধকতা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা বাতিলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

পুলিশের দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশন স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ হিসেবে ওয়াচডগ বা ওভারসাইট কমিটি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার জন্য বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের সুপারিশ করেছে। পুরস্কার প্রদানের বর্তমান কাঠামো পুনর্মূল্যায়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে সততা ও নিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। পুলিশের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে পদোন্নতি ও পদায়নে প্রশিক্ষণের ফলাফল বিবেচনা করা, প্রশিক্ষণার্থীর অর্জন এসিআরে প্রতিফলিত করা এবং অর্গানাইজড ক্রাইমের ক্ষেত্রে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিশেষায়িত ইউনিটে কাজ করা বাধ্যতামূলক করা, Standard Operating Procedure (SOP) মেনে বলপ্রয়োগ এবং মানবাধিকার ও নৈতিকতার ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনসেবার মনোভাব ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দায়িত্ব পালনে প্রশিক্ষণের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পুলিশের কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নত করার জন্য তাদের স্বাস্থ্যসম্মত ও মানবিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ কমাতে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া ফিটলিস্ট হালনাগাদ করে পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়নের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং কনস্টেবল ও এসআই পর্যায় থেকে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং নিশ্চিত করতে বিভাগীয় পদোন্নতির নীতিমালা সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জনসেবা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে নারী পুলিশের বর্তমান সংখ্যা ১৬৮০১ (আনুমানিক) থেকে বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ২৯,২৪৮-এ উন্নীত করার জন্য অর্গানোগ্রামে নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বোপরি পুলিশের জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টাউন হল সভা এবং শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে পুলিশিং ও আইন সংক্রান্ত চর্চা অন্তর্ভুক্ত করে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি থানাভিত্তিক মামলা কার্যক্রমের অগ্রগতি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

পুলিশের সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদি ও চলমান প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বর্তমান সংস্কার কমিশন স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, যা পুলিশকে জনগণের কাছে আসতে সহযোগিতা করবে। তবে কমিশনের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য ও অঙ্গীকারের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিশি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

১। পুলিশ সংস্কার কমিশনের গঠন ও কাঠামো এবং সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য

১.১ পুলিশ সংস্কার কমিশনের গঠন ও কাঠামো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৩৩০-আইন/২০২৪ দ্বারা দেশে জনমুখী, জবাবদিহিমূলক এবং দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাবেক সচিব জনাব সফর রাজ হোসেনকে কমিশন প্রধান করে ০৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করে। **(সংলগ্নী-১)**। পরবর্তীতে আরও ০২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করা হয়। কমিশনের সদস্যদের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র.	নাম ও পদবি
১	জনাব সফর রাজ হোসেন সাবেক সচিব ও কমিশন প্রধান
২	জনাব আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ ও সদস্য সচিব
৩	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও সাবেক মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও সদস্য
৪	জনাব মোহাম্মদ হারুন চৌধুরী সাবেক বিভাগীয় কমিশনার (যুগ্মসচিব) ও সদস্য
৫	জনাব শেখ মোঃ সাজ্জাত আলী সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, বর্তমানে পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি ও সদস্য
৬	জনাব মোঃ রফিকুল হাসান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ও সদস্য
৭	জনাব মোঃ গোলাম রসুল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বর্তমানে এসবি প্রধান ও সদস্য
৮	জনাব মোহাম্মদ আশফাকুল আলম কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি), পিটিসি, টাঙ্গাইল ও সদস্য
৯	জনাব শাহনাজ হুদা অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য
১০	জনাব এ এস এম নাসিরউদ্দিন এলান মানবাধিকার কর্মী ও সদস্য
১১	জনাব মোঃ জারিফ রহমান গবেষক, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ও সদস্য

১.২ কমিশন সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

কমিশন সভায় আলোচনার মাধ্যমে কমিশন প্রধানের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞ সদস্যদের নিম্নরূপভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়:

১। কমিশন সদস্যদের প্রথম প্রস্তুতিমূলক সভা ০৬-১০-২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন ও কমিশন সদস্য আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব প্রদান করে কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জাহাংগীর আলমকে সংযুক্ত করা হয়।

২। কমিশন সদস্য মোহাম্মদ হারুন চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত (যুগ্মসচিব)-কে সার্বক্ষণিক কমিশনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ বিষয়ে কমিশন প্রধান এবং সদস্য সচিবকে অবহিত রাখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তা ছাড়া তাকে কমিশনের পক্ষ থেকে ‘কেমন পুলিশ চাই’ জরিপ কর্মের পরিচালনার দায়িত্বও দেওয়া হয়। মোহাম্মদ ইকবাল, সাবেক অতিরিক্ত সচিব-কে কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুতের খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিশনের ০৩ (তিন) জন পুলিশ সদস্য শেখ মোঃ সাজ্জাত আলী, বর্তমান ডিএমপি কমিশনার, মোঃ গোলাম রসুল, অতিরিক্ত আইজিপি (চলতি দায়িত্ব) ও এসবি প্রধান এবং মোহাম্মদ আশফাকুল আলম, কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি), পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। তাদেরকে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ এবং সরবরাহের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মোঃ রফিকুল হাসান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রাথমিকভাবে আইন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও দলিলাদি সম্পর্কে কমিশনকে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কমিশন সদস্য শাহনাজ হুদা, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমিশন সদস্য ও মানবাধিকার কর্মী নাসির উদ্দিন এলান-কে মানবাধিকার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ও গবেষণালব্ধ দলিলাদি সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিশনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ও সদস্য মোঃ জারিফ রহমানকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি কমিশনে উত্থাপন করা এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
কমিশনের সকল কার্যক্রমে সকল সদস্য সার্বিকভাবে সহায়তা করেন এবং পারস্পরিক মতবিনিময়, ব্রেইন স্টর্মিং, অংশীজনদের সভা, মাঠ পরিদর্শন, ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে কমিশনকে সহায়তা করেছে।

২। প্রেক্ষাপট:

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনগণ একটি গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের কারণে সেই স্বপ্ন আজও পূর্ণতা পায়নি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল, স্বার্থান্বেষী অপরাজনৈতিক চর্চা রাষ্ট্রকে তার বিপরীত পথে নিয়ে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শাসকগোষ্ঠী যেভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, তা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বাংলাদেশ পুলিশ, যে প্রতিষ্ঠানের ওপর দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত, বিভিন্ন সময়ে দেশের জনগণের বিপক্ষে নিয়ে জুলুমকারির ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

বিশেষ করে, কিছু অসাধু রাজনীতিবিদ ক্ষমতা ধরে রাখতে পুলিশকে নাগরিকদের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। একই সঙ্গে পুলিশের মধ্যে থাকা উচ্চাভিলাষী ও রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট কিছু কর্মকর্তা এবং অধস্তন সদস্যরা সেই রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগসাজশে পুলিশকে অপব্যবহারের পথ সুগম করেছে। তাদের নির্দেশে বিভিন্ন সমাবেশ, মিছিল এবং গণজমায়েতে অযাচিত পুলিশি হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক সদস্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকারবিরোধী

কার্যক্রমের অভিযোগ রয়েছে এবং অনেক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ও তৎকালীন সরকার-সমর্থিত কর্মকর্তারা এবং অনেক অধস্তন সদস্য ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং মানবতাবিরোধী সহিংস বলপ্রয়োগ করে। এর ফলে পুলিশ একটি অকার্যকর ও অবিশ্বাস্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মোটকথা, বিগত স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, তাদের পোষ্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, তাদের অনুগত মিডিয়া, এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রকে একটি দমনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল, সেখানে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে, ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান একটি নতুন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মাঝে একটি সুস্থ ও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে যে ধাপগুলো অতিক্রম করা প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো পুলিশ বাহিনীর ও তাদের সেবার মানোন্নয়নে কার্যকর সংস্কার। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে 'পুলিশ সংস্কার কমিশন' গঠন করেছে। পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্ট গভীর ফাটল মেরামতের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ পদ্ধতি থেকে শুরু করে মানবাধিকার, জনসম্পৃক্ততা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এই কমিশন টেকসই সংস্কারের প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও, পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত সদস্যদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

৩। বাংলাদেশে পুলিশের ক্রমবিকাশ; ১৭৯২ থেকে অদ্যাবধি সংস্কার উদ্যোগ:

বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর বর্তমান অবয়ব ও বিন্যাসের অধিকাংশই ব্রিটিশ উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া। সম্রাট অশোকের শাসন আমলে 'মনুসংহিতা', বিশ্ব পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনি, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', ইত্যাদির মাধ্যমে জানা যায় যে, সরকারবিরোধী তৎপরতা দমনের প্রয়োজনে গোয়েন্দাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্যই মূলত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম শাসনামল বিশেষত মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সময় 'ফৌজদার' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার নিয়ন্ত্রণে জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য গঠিত বাহিনীর প্রধান ছিলেন 'কোতোয়াল'। তার অধীনে তীরন্দাজ ও বরকন্দাজ বাহিনী পুলিশি ভূমিকা পালন করত। মাঝামাঝি স্তরে 'থানাদার' পদবিযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন যাকে বর্তমানে একটি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'অফিসার ইনচার্জ' হিসেবে তুলনা করা যায়।

মুঘল শাসনের একেবারে শেষ পর্যায়ে প্রশাসনিক যন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে। এই সময়ের তথা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানকারী জমিদাররা নিজেদের জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে পুলিশের বিকল্প হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী নিযুক্ত করত। পুলিশ বাহিনীর বিকল্প হিসেবে তারা নিয়োজিত ছিল। এ ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা ১৭৫৭ সাল অবধি বলবৎ ছিল। এই সময় থেকেই ব্রিটিশরাজ পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার সাধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাধারণ জনগণসহ অন্যান্য উৎস থেকে কত বেশি রাজস্ব আদায় করা যাবে, সে উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

২। ব্রিটিশ শাসনামলে সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ১৮৬১ সালে পুলিশ অ্যাক্ট জারি করা হয়। এটিই ছিল উপমহাদেশে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার প্রথম আইনগত ভিত্তি। পরবর্তীকালে পুলিশের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য বিভিন্ন নামে ১৯টি কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়। প্রণীত হয়েছে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৪৩ সালের পুলিশ রেগুলেশনস অব বেঙ্গল

(পিআরবি[1]); কিন্তু প্রকৃত বাস্তবে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনে যে স্পিরিট, তা এখনো বহাল আছে। তাই সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীর কাঠামো, চর্চিত সংস্কৃতি এবং লালিত আদর্শ ও মূল্যবোধের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং পরবর্তী সময় ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ হিসেবে নামকরণ করা হয়। এই পরিসরে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের সুপারিশসমূহের নির্যাস কালানুক্রমিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১৭৯২ থেকে অদ্যাবধি সংস্কার উদ্যোগ: উল্লেখযোগ্য সংস্কার উদ্যোগসমূহ

(ক) বাংলা, বিহার ও ওড়িশার কালেক্টরশিপ পুলিশের জন্য প্রবিধান (১৭৯২): পনেরো বছর পর ব্রিটিশরা ১৭৭২ সালের ১৫ই আগস্ট দুই ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠা করে, যথা: দেওয়ানি আদালত ও ফৌজদারি আদালত। উল্লেখ্য, এই সময়টা ছিল লর্ড কর্নওয়ালিশের শাসনামল। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পূর্বে লর্ড কর্নওয়ালিশ ক্ষমতায় এসে পাস করেন 'রেগুলেশন ফর দি পুলিশ অব দি কালেক্টরশিপ ইন বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড ওড়িশা'। তিনি লক্ষ করলেন, পুলিশের অধস্তন কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ, অদক্ষ এবং দমনপীড়নে অভ্যস্ত; পাশাপাশি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেহেতু নানাবিধ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন সেহেতু তাদের পক্ষে অধস্তন কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে তদারকি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯২ সাল জমিদারদের নিজ নিজ এলাকায় পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। জমিদারদের এলাকাগুলো পুলিশের এখতিয়ারভুক্ত করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। এসব অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার পদবি ছিল 'দারোগা'। পাইক, চৌকিদার এবং গ্রাম্য ওয়াচম্যানরা এই দারোগার অধীন ছিল। গভর্নর ইন কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া কোনো দারোগাকে বরখাস্ত করা যেত না।

(খ) বার্ডস কমিটি: ১৮১৮ সালে সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীকে একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মি. বার্ডের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন হয় এবং উক্ত কমিটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই কমিটি পুলিশের অদক্ষতার দুটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করে। প্রথমত অপর্যাপ্ত তদারকি এবং দ্বিতীয়ত অপর্যাপ্ত বেতনভাতা—এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে সমগ্র পুলিশ বাহিনী একাধারে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অন্যদিকে অযোগ্য হিসেবে পরিণত করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সময় পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করা হয়। সুপারিনটেনডেন্ট জেনারেল অব পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ ২৩ জন লোকাল (স্থানীয়) সুপারিনটেনডেন্ট এবং ৩২ জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং ৮৮৮ জন দারোগা ৪৪৪০ জন জমাদার এবং ৬৬৬০০ জন বরকন্দাজের পদ সৃষ্টি করা হয়। উল্লেখ্য, তখন অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় থানার সংখ্যা ছিল ৮৮৮টি। এই সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলায় পুলিশ সুপারের পদ সৃষ্টি করা হয়। বাংলা, বিহার ও ওড়িশা মতো এই বিশাল অঞ্চলে পুলিশ বাহিনীর জন্য এই স্বল্পসংখ্যক পুলিশ সদস্য কার্যকর কোনো প্রভাব রাখতে সক্ষম হননি।

এই কমিটি উল্লেখ করে যে, অদক্ষতার মূল কারণ ছিল অপর্যাপ্ত তদারকি। অন্যদিকে থানাদারদের অপর্যাপ্ত বেতন তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে গড়ে তুলেছিল। এই কমিটি পুরোনো চৌকিদারি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য দৃঢ় চেষ্টা চালিয়েছিল এবং দারোগাদের বেতন বৃদ্ধি ও যথাযথ ভাতা প্রদানের সুপারিশ করেছিল।

১৮৬১ থেকে অদ্যাবধি সংস্কার উদ্যোগ

(ক) এম, এইচ কোর্ট পুলিশ কমিশন (১৮৬০): ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ভয়াবহতা পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর বিষয়টি অনিবার্য করে তোলে। ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে এম, এইচ কোর্টের নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই প্রণীত হয় ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন। আইনটি একই সঙ্গে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় বলবৎ হয়, যা এখনও বাংলাদেশে অনুসৃত হচ্ছে। এটিই মূলত বাংলাদেশ পুলিশের প্রাণভোমরা। লর্ড ক্যানিং এইচ, এম কোর্টকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এই কমিশন জনসাধারণের কাছে পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নত করা, অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ করা এবং তদন্তের মান এবং কমিশনের মান বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। কমিশনের প্রতিবেদনটি কয়েকটি

[1] ১৯২৬ সনে প্রথম জারী করা হয়।

পরিবর্তনসহ অনুমোদিত হয়েছিল এবং ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন হিসেবে পাস হয়েছিল (Act no. V of 1861)। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের বিধান অনুসারে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টকে কেবল তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরও কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হতো। এই ব্যবস্থা এক ধরনের দ্বৈতশাসনের অধীনে পুলিশকে ন্যস্ত করে এবং বেসামরিক প্রশাসনকে পুলিশের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ এনে দেয়।

এই কমিশনই সর্বপ্রথম ইউনিফর্মধারী সিভিল পুলিশের জন্ম দিয়েছিল, যা সামরিক বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, জনজীবনে শান্তি রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও শনাক্তকরণের জন্য সিভিল দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং জেলাগুলোতে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের পুলিশ মহাপরিদর্শকের অধীনে রাখা হয়েছিল। কমিশনের নির্দেশনা ছিল যে, জেলার দায়িত্বে থাকা প্রধান ম্যাজিস্ট্রিয়াল অফিসার (তৎকালীন মাদ্রাজ এবং বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে কালেক্টর এবং অন্য কিছু প্রদেশে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়) জেলার পুলিশ প্রশাসনের প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা হবেন এবং পুলিশ অফিসাররা তার কাছে এবং তার আদেশে পুলিশ নিয়ন্ত্রিত হবে।

(খ) ফ্রেজার পুলিশ কমিশন (১৯০২): পুলিশ ট্রেনিং কলেজে সকল পুলিশ অফিসার এবং স্কুলে নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের জন্য এই কমিশন গঠন করা হয়। ১৯২১ সালে ভারতীয় আধিকারিকদের সরাসরি ইম্পেরিয়াল সার্ভিসে নেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত পুলিশ অফিসার এবং স্থানীয় পুলিশের মধ্যে সর্বদা বৈষম্য বিরাজ করত। পুলিশি কাঠামোটি এমন ছিল যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ব্রিটিশদের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং নিম্ন অধস্তনদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং তদারকির মাধ্যমে খুব কঠোর পরিদর্শনের অধীনে রাখা হতো।

(গ) হ্যাচ-বার্নওয়েল কমিটি (১৯৬৫): এই কমিটি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করে এবং পুলিশের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের পরামর্শ দেয়; কিন্তু বাস্তবে উল্লেখযোগ্য কিছুই করা হয়নি।

(ঘ) বিচারপতি জি. বি. কনস্ট্যান্টাইন কমিশন (১৯৬০-৬১): পুলিশের সাংবিধানিক অবস্থান, পরিবহন ও লজিস্টিকের ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ, বেতন ও ভাতা এবং কিছু বিশেষায়িত পুলিশ যেমন পৌরসভা পুলিশ, গ্রাম পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ, রিজার্ভ পুলিশ এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠনের মতো বিস্তৃত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ৭৯টি সুপারিশ করেছিল। এই কমিশন জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যও পৃথক সুপারিশ করেছিল।

(ঙ) এ. ও. মিঠা পুলিশ কমিশন (১৯৬৯): ১৯৭১ সালে মেজর জেনারেল এ. ও. মিঠার নেতৃত্বে এ. ও. কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন পুলিশ বাহিনীর জন্য সম্পূর্ণ নিবেদিত একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক উইং প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে এবং পুলিশের ‘তদন্ত’ কার্যক্রমকে ‘প্রসিকিউশন’ কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার জোর সুপারিশ করে। পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে ধরনের ‘রেজিমেন্টেশন’ চালু আছে তা দ্রুত হ্রাস করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। এই কমিশন নিয়োগ এবং বিদ্যমান ‘র‍্যাংক স্ট্রাকচার’ পরিবর্তনের পক্ষেও সুপারিশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে এই কমিশনের সুপারিশগুলো কার্যকর করা যায়নি।

(চ) ফৌজদারি আইন সংস্কার কমিটি (১৯৮২): কমিটির পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, প্রসিকিউটিং অফিসার হিসেবে পুলিশের কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং পুলিশের কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর গুণমান ও কর্মক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি দৃঢ়ভাবে মত দেয় যে খণ্ডকালীন পিপি’র, এপিপি’র মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করার ফলে পুরো ব্যবস্থায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। তাই পুলিশের কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং পুলিশের কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টরের পদ বিলুপ্ত করার সুপারিশ করে এবং চার শ্রেণির স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পৃথক ক্যাডার যেমন— (ক) পাবলিক প্রসিকিউটর, (খ) অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, (গ) ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর এবং (ঘ) সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটরের পদ সৃষ্টি করার সুপারিশ করেন। কমিটি প্রসিকিউটিং অফিসারদের বিভিন্ন বিষয় এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

(ছ) ব্রিগেডিয়ার এনাম কমিটি (১৯৮৩): এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সার্কেল ইন্সপেক্টর এবং অফিসার-ইন-চার্জের পদ যথাক্রমে এএসপি এবং ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করা হয়। তবে, এই কমিটি পুলিশের সংখ্যা কমানোর দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে।

(জ) বিচারপতি আমিনুর রহমান পুলিশ কমিশন (১৯৮৮-৮৯): ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বিচারপতি আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিটি ৩২৮ পৃষ্ঠার বিশটি অধ্যায় সংবলিত একটি অত্যন্ত বিস্তৃত প্রতিবেদন, যা ছিল দুটি খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে সমস্ত রেফারেন্স উপকরণ এবং নথি রয়েছে, যা সংযুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য এই কমিশন প্রায় ২০০টি সুপারিশ জমা দেয়। কমিশন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, 'পুলিশ বিভাগকে তার ত্রুটিগুলোর জন্য একমাত্র দায়বদ্ধ করা যাবে না'। এটি সরকার, পুলিশ এবং নাগরিকদের ভাগ করে নেওয়া দরকার। এই কমিশন পুলিশ বাহিনী অকার্যকর হওয়ার পেছনে ৯টি প্রধান কারণ চিহ্নিত করে:

১) সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবলের অভাব;
২) যানবাহন, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব;
৩) সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীর নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব জনগণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়ার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন সেটির অভাব, সর্বোপরি বিচারকগণের সঙ্গে পেশাগত আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা;
৪) ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ নীতি-প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির বিধি বিধান;
৫) সংঘটিত অপরাধ সঠিকভাবে রেকর্ড করে রাখায় গাফিলতি এবং অপরাধ সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ অসত্য পরিসংখ্যান;
৬) দায়সারা গোছের অসন্তোষজনক তদন্ত শেষে অপরাধী বলে সাব্যস্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন করা;
৭) পুলিশি দায়িত্ব পালনে অযাচিত হস্তক্ষেপ;
৮) পুলিশের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি; এবং
৯) পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদারকি, তদন্ত ও নিয়ন্ত্রণের অভাব।

এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশ সদর দপ্তরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। বিভক্তির বিন্যাস হবে নিম্নরূপ:

১) প্রশাসন ও অপারাশেন অধিদপ্তর
২) নিয়োগ, জনশক্তি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অধিদপ্তর
৩) অর্থ, উন্নয়ন, ক্রয়/সংগ্রহ এবং সরবরাহ অধিদপ্তর
৪) অপরাধ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

পুলিশের মহাপরিদর্শক, ৩ জন অতিরিক্ত আইজিপি এবং ৪ জন ডিআইজির পাশাপাশি এসপি, এএসপি, সিভিলিয়ান ও অন্যান্য মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফের সহায়তায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

পুলিশ সদর দপ্তরের প্রস্তাবিত পুনর্গঠনে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কর্মী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: অতিরিক্ত আইজিপি-১, ডিআইজি-২, এআইজি, পরিচালক-৫, এবং অন্যান্য সম্পূরক কর্মী। কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে 'পুলিশ বিভাগ' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ এবং উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত বিভাগের সেক্রেটারি হিসেবে আইজিপি'র পক্ষে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে বিভিন্ন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা, সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা প্রদান করতে সহজতর হয়, সে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

এই কমিশনের কাছে প্রতিভাত হয় যে, বিভিন্ন থানার আয়তন এবং জনসংখ্যা বিভিন্ন রকম। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে থানার এলাকাগুলো নির্ধারণ করা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন অতিরিক্ত ৬০টি মহকুমা/থানা স্থাপনের প্রস্তাব দেয়।

কমিশন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে থানাগুলোর কর্মী বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে: এক লাখ পর্যন্ত জনসংখ্যার থানাগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্তমান কর্মী অব্যাহত থাকতে পারে। ১-২ লাখ জনসংখ্যার পুলিশ স্টেশনগুলোতে ইন্সপেক্টর (ওসি)-১, এসআই-৩, এএসআই-৩ এবং কনস্টেবল-৩০ এর ন্যূনতম জনবল থাকতে হবে এবং যেসব থানায় ১ লাখ থেকে ৪ লাখ জনসংখ্যা রয়েছে তাদের ইন্সপেক্টর (ওসি)-১, এসআই-৪, এএসআই-৪ এবং কনস্টেবল-৪০ এবং P.Ss। ৪ লাখ জনসংখ্যা এবং ইন্সপেক্টর (ওসি)-১, এসআই-৫, এএসআই-৫ এবং কনস্টেবল-৫০ এর উর্ধ্বে করার সুপারিশ করে।

প্রতিটি মহকুমায় আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার স্বার্থে কমিশন সুপারিশ করেছে যে, একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা (এসআই) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকতে হবে যিনি এসপি (জেলা বিশেষ শাখা)-এর নিয়ন্ত্রণে থানার ওসির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় সাধন করবেন।

কমিশন জোরালোভাবে সুপারিশ করে যে, অবিলম্বে সিআইডির আওতায় ড্রাগ কন্ট্রোল নামে একটি পৃথক বিভাগ চালু করা উচিত, যাতে অবৈধ মাদক পাচারকারী মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত কর্মী থাকতে হবে। এছাড়াও, কমিশন ব্যাংক জালিয়াতি, কর্মকর্তাদের দ্বারা জনসাধারণের অর্থের জালিয়াতি, মুদ্রা নোটের জালিয়াতি, স্বর্ণ চোরাচালান, বৈদেশিক মুদ্রা এবং নারী ও শিশুদের অবৈধ পাচারের মতো হোয়াইট-কালার অপরাধ মোকাবিলায় বিশেষ বিভাগ স্থাপনের পরামর্শ দেয়। কমিশন সুপারিশ করে যে, ডিএমপি এবং সিএমপির ট্র্যাফিক বিভাগে দুর্ঘটনা, নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি সম্পর্কিত নথির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পিউটার সুবিধা থাকা উচিত। 'পুলিশ জনগণের বন্ধু' এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য কমিশন বিশেষভাবে সুপারিশ করে।

প্রশিক্ষণার্থী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখতে এবং কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে একাডেমি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পদের জন্য ব্যতিক্রমী গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া উচিত। এই ব্যক্তিদের নিজ নিজ পদমর্যাদার শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে পদোন্নতি বা বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা উচিত। সারা দেশে এই কমিশন পুলিশ কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি পুলিশ স্টাফ কলেজ গড়ে তোলার পক্ষে জোর সুপারিশ প্রদান করে।

(ঝ) জনাব মাহমুদুল হাসান রিপোর্ট (১৯৮৯): এই কমিটি জনবল ও রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য জোরালো তাগিদ প্রদান করে। এছাড়াও, এই কমিটি ডিআইজি এবং আরআরএফ-এর দপ্তরে নিযুক্ত জনশক্তির পাশাপাশি জেলা সদর দপ্তরে বিশেষ সশস্ত্র বাহিনীকে পুনর্গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছে। (Range Reserve Force). দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির জনবলের অবস্থাও কমিটি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছে। তদানুসারে কমিশন প্রতিটি থানায় উপপরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিদর্শকদের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে একজন এএসপিকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুপারিশ করে। এই কমিটি পুলিশ সদর দপ্তর, মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিআইডি এবং বিশেষ শাখার পুনর্গঠনের ওপর বিশেষ জোর দেয়। কমিটি, পুলিশ গোয়েন্দা, নৌ পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ চালু করারও আহ্বান জানিয়েছে। মজার বিষয় হলো, সকল সুপারিশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু এরশাদ শাসনের পতনের কারণে বেশিরভাগ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যায়নি।

(ঞ) ইউএনডিপি (UNDP) ও ডিএফআইডি (DFID) কর্তৃক গৃহীত পুলিশ সংস্কার (২০০৩-২০১৪): জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ২০০৫ সালের শেষের দিকে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির প্রথম পর্যায় চালু করে এবং সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপরে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় এবং এটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত চলতে থাকে। পরবর্তী সময় ইউএনডিপি'র নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ পুলিশ শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু করা

হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের মেয়াদ মাত্র তিন বছরের জন্য অনুমোদিত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এ প্রকল্পটি তিনটি পক্ষের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে, যথা: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইউএনডিপি এবং যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (DFID)। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল নারী, শিশু ও দরিদ্রদের মতো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ পুলিশকে সহায়তা প্রদান করা:

- পুলিশের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি;
- অপরাধ প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন;
- উন্নত বৈজ্ঞানিক তদন্ত;
- বিদ্যমান সম্পদের সঠিক ব্যবহার;
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং পন্থার ওপর যথাযথ জোর;
- দুর্নীতি দমন; এবং
- কর্মক্ষমতা পরিমাপ এবং তদারকি।

ইউএনডিপি'র অর্থায়নে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) দরিদ্রদের আইনি সহায়তা প্রদান করেছে, মানব নিরাপত্তা সচেতনতা সম্পর্কিত কর্মসূচি প্রদান করেছে, মানব নিরাপত্তা সম্পর্কিত বেসরকারি আইন পরিবর্তনের জন্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেছে ইত্যাদি। এসব এনজিওর মধ্যে রয়েছে (ক) বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, (খ) আইন ও সালিশ কেন্দ্র, (গ) বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, (ঙ) অধিকার, এবং (চ) বাংলাদেশ মানবাধিকার বস্তাবায়ন সংস্থা।

নিঃসন্দেহে, এই সংস্কার কর্মসূচিগুলো বাংলাদেশ পুলিশের উন্নতিতে অবদান রেখেছে, তবুও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে যা আরও সংস্কারের প্রয়োজন। সংস্কারের বিষয়গুলো হলো:

- আইন ও বিধিমালা সংশোধন
- প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- সক্ষমতা বৃদ্ধি
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- সেবা সরবরাহের উন্নতি
- দুর্নীতি দমন
- পুলিশ ওয়েবসাইটের উন্নয়ন
- কমিউনিটি পুলিশিং প্রতিষ্ঠা

খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন আইজিপি এ এস এম শাহজাহান, নয়জন কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপির প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে 'খসড়া বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭' তৈরির জন্য একটি পুলিশ আইন খসড়া কমিটি গঠন করে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দুই বছরের রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থার সময় ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ পুলিশ ১৮৬১ সালের পুরোনো পুলিশ আইন প্রতিস্থাপনের জন্য খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭ প্রণয়ন করে। এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটির নিকট প্রতিভাত হয় যে, বাংলাদেশে ৯৩৫টি আইন রয়েছে, যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পুলিশের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রকট তা হলো কোন পরিস্থিতিতে পুলিশের কী ভূমিকা হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনার/আইনের ধারার অনুপস্থিতি কিংবা একেবারেই নীরব থাকা। এক্ষেত্রে আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা ও সঠিক নির্দেশনা থাকা অত্যাবশ্যক। জরুরি না,

কোনোভাবে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ পুলিশ এবং ইউএনডিপি ২০০৭ সালের খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশটিতে পূর্ববর্তী আইনগুলোর গঠনমূলক দিকগুলোকে একত্রিত করার কাজটি গ্রহণ করেছিল।

লক্ষণীয় যে, আমিনুর রহমান খান কমিশনের রিপোর্ট অনেক বেশি বিস্তৃত ও বাস্তবধর্মী ছিল। কিন্তু সেটি বাস্তবায়নের চেষ্টা না করে পরের বছর মাহমুদুল হাসান কমিটি গঠিত হয়। ইত্যবসরে পুলিশের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। নানা মহল থেকে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার সাধনের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা নীতিনির্ধারকেরা পুলিশ সংস্কারে এগিয়ে আসেনি। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)র উদ্যোগে শুরু হয় 'পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি'। এই কর্মসূচির মাধ্যমেই প্রণীত হয় বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ (খসড়া)। এই অধ্যাদেশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার, জনগণের অধিকার, সংবিধান ও আইন অনুসারে কর্ম পরিচালন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণে পুলিশের দায়িত্ব, কর্তব্য, ভূমিকা বিস্তারিত বিধৃত ছিল। কিন্তু তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অসংখ্য প্রস্তাব আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলেও প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি।

৪। উদ্দেশ্য

৪.১ মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশ বাহিনীর জন্য পরিকল্পনা/সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন

মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ সংস্কার কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিশ বাহিনীর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রস্তাব করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ, পুলিশ বাহিনীর সক্ষমতার বৃদ্ধি এবং পুলিশ সদস্যদের সার্বিক কাজের পরিবেশ উন্নতির প্রতি জোর দেওয়া হবে।

মধ্যমেয়াদি প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে পুলিশ সংস্থা পুনর্গঠন, নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থা সংস্কার, জনবল নিয়োগ, পুলিশি সেবা সহজীকরণ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে কাঠামোবদ্ধ সমন্বয়করণ ও আইন সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাবগুলোর ক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিককাল থেকে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ও ভাবমূর্তি থেকে পুলিশ বাহিনীকে বের করে আনতে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের মাধ্যমে একটি দক্ষ ও জবাবদিহিযোগ্য পুলিশ বাহিনী গড়ার প্রতি জোর দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো পুলিশ বাহিনীকে আরও জনগণবান্ধব, দক্ষ ও জবাবদিহিযোগ্য করে তোলা।

৪.২ জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ সারাদেশে এক ধরনের ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে। একইসঙ্গে ব্যাপক বদলি কার্যক্রমের কারণে পুলিশের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়াতেও একপ্রকার ছেদ পড়েছে। অন্যদিকে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার ওপর প্রভাব ফেলেছে। এমতাবস্থায় জননিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুলিশকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের মাধ্যমে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কার্যকর প্রস্তাব প্রণয়ন এই কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪.৩ বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো হালনাগাদ করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রণয়ন করা

পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকে পুনর্গঠনের বিকল্প নেই। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান আইনি কাঠামো, উন্নত দেশ ও আমাদের প্রতিবেশী দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন গুড প্র্যাকটিস ও ইতোপূর্বে বাংলাদেশে যেসব সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সে সকল নথিপত্র রিভিউ করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রণয়ন করা হবে। একইসঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়া হবে।

৪.৪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়ন

বাংলাদেশ পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরাধ তদন্ত পদ্ধতি, সনাতন ও ডিজিটাল ফরেনসিক কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় জনবল, সম্পদ ও প্রযুক্তির যৌক্তিক পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো বাহিনীর কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিকবান্ধব করে তোলা। এই উদ্দেশ্য পূরণে সংস্কারমূলক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামগ্রিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।

৫। কমিশন কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

৫.১ গবেষণা ও বিশ্লেষণ

পুলিশ সংস্কারের উদ্দেশ্যে কার্যকর প্রস্তাবনা প্রণয়নে বর্তমান কমিশন গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এই গবেষণায় গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় ধরনের তথ্যকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সরাসরি অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি জানা গেছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে পুলিশ কর্মকর্তা, সাধারণ জনগণ, ভুক্তভোগী, বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। এছাড়াও, পুলিশের বিদ্যমান নীতিমালা, আইন এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এই গুণগত তথ্যগুলো পুলিশ সংস্কারের জন্য কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন তা বুঝতে সাহায্য করবে।

সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বৃহৎ একটি নমুনার কাছে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এই জরিপের মাধ্যমে পুলিশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনমত জানা যাবে। যেমন, মানুষ পুলিশের কাজের প্রতি কতটা সন্তুষ্ট, কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশকে আরও উন্নতি করতে হবে, ইত্যাদি। এই সংখ্যাগত তথ্যগুলো গুণগত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে একটি সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপনা তৈরি করা সম্ভব হবে। মোটকথা, এই গবেষণার লক্ষ্য হলো পুলিশ সংস্কারের জন্য সঠিক ও কার্যকরী প্রস্তাবনা তৈরি করা। প্রস্তাবনাগুলো যাতে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে পুলিশকে আরও জনবান্ধব ও দক্ষ করে তোলে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হচ্ছে।

৫.২ 'কেমন পুলিশ চাই' জনমত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ ও মতামত

'কেমন পুলিশ চাই'

জনমত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ ও মতামত:

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বিগত ৩১-১০-২০২৪ ইং তারিখে 'কেমন পুলিশ চাই' উপপাদ্যের আওতায় একটি প্রশ্নমালা অনলাইনে প্রচার করা হয়। ব্যাপক প্রচারের জন্য সংবাদমাধ্যমে স্ক্রল প্রচার করা হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রচারিত হয়। ১৫ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখের মধ্যে মতামত প্রেরণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত মোট ২৪,৪৪২ জন মতামত প্রদান করেছেন। মতামত গুগল ফরম্যাটে গৃহীত হয়েছে।

জরিপের সীমাবদ্ধতা:

সময়স্বল্পতার কারণে জরিপ কাজটিকে পরিপূর্ণ গবেষণাধর্মী উদ্দেশ্য ও অবয়বে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি বা টুলস (Statistical measures and tools) ব্যবহার করা হয়নি। বরং পুলিশ বাহিনীর আচরণগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে দ্রুত তথ্যজ্ঞাপক বাহন হিসাব কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণে শতকরা হিসাব, পাইচার্ট (Pie chart) ও বার (Bar) ডায়াগ্রামে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত জরিপকাজে বিভিন্ন বিধিবিধান ও বিগত সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা, সমসাময়িক পটপরিবর্তন, ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা থাকলে তা উত্তরদাতার জন্য সহায়ক হয় এবং অধিকন্তু কোনো তথ্য সংগ্রহকারী (data collector) নিয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি, তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা আমজনতার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

তথ্য বিশ্লেষণ ও মতামত:

জরিপে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের আলোকে মতামত লিখন প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ সংস্কার কমিশনে আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১। বয়স

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

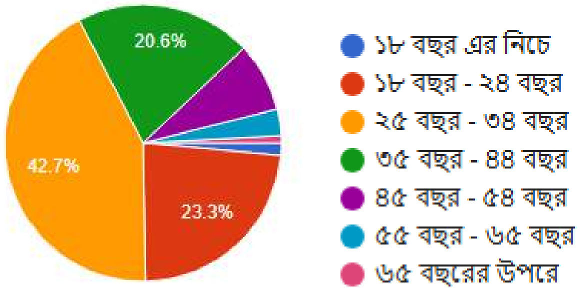

বয়স	রেসপন্স
১৮ বছর এর নিচে	৩৪৮ (১.৪%)
১৮ বছর - ২৪ বছর	৫৬৮৮ (২৩.৩%)
২৫ বছর - ৩৪ বছর	১০৪২৭ (৪২.৭%)
৩৫ বছর - ৪৪ বছর	৫০৪৪ (২০.৬%)
৪৫ বছর - ৫৪ বছর	১৯৭২ (৮.১%)
৫৫ বছর - ৬৫ বছর	৭৫৪ (৩.১%)
৬৫ বছরের উপরে	২০৯ (০.৯%)

মতামত: ২৪,৪৪২ জন উত্তরদাতার ক্ষেত্রে ১৮-৪৪ বছরে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিই অধিক (৮৬.৬%)

২। লিঙ্গ

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

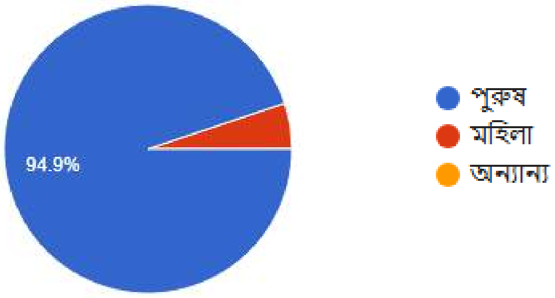

লিঙ্গ	রেসপন্স
পুরুষ	২৩১৯১ (৯৪.৯%)
মহিলা	১২৫১ (৫.১%)
অন্যান্য	০ (০%)

মতামত: উত্তরদাতাদের প্রায় ৯৫% পুরুষ।

৩। পেশা

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

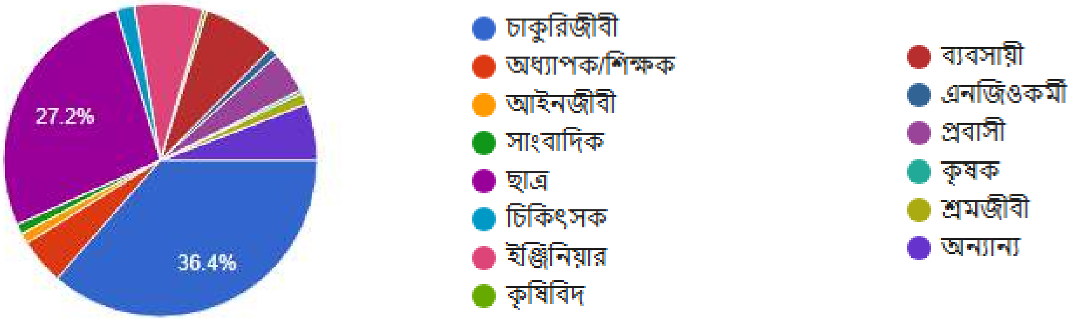

পেশা	রেসপন্স	পেশা	রেসপন্স
চাকরিজীবী	৮৮৯৮ (৩৬.৪%)	কৃষিবিদ	৯৬ (০.৪%)
অধ্যাপক/শিক্ষক	১১৫৮ (৪.৭%)	ব্যবসায়ী	১৮৫৬ (৭.৬%)
আইনজীবী	২৬৭ (১.১%)	এনজিওকর্মী	২২৬ (০.৯%)
সাংবাদিক	২৫৫ (১.১%)	প্রবাসী	১০৪৫ (৪.৩%)
ছাত্র	৬৬৪৫ (২৭.২%)	কৃষক	৮৫ (০.৩%)
চিকিৎসক	৪৫০ (১.৮%)	শ্রমজীবী	২৮৮ (১.২%)
ইঞ্জিনিয়ার	১৭৩৭ (৭.১%)	অন্যান্য	১৪৩৬ (৫.৯%)

মতামত: উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক ১৪টি বিভাগে সর্বোচ্চ চাকরিজীবী (৩৬.৪%), পরবর্তীতে ছাত্র (২৭.২%) ও ব্যবসায়ী (৭.৬%) ও ৭.১% ইঞ্জিনিয়ারের অংশগ্রহণ প্রণিধানযোগ্য।

৪। জেলা:

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

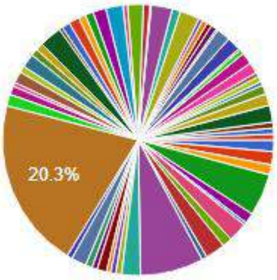

জেলা	রেসপন্স	জেলা	রেসপন্স	জেলা	রেসপন্স	জেলা	রেসপন্স
কক্সবাজার	৩৩৭ (১.৪%)	গাজীপুর	৫৭৭ (২.৪%)	ঝালকাঠি	১৫৪ (০.৬%)	নরসিংদী	৩৩৬ (১.৪%)
কিশোরগঞ্জ	৩৮৫ (১.৬%)	গোপালগঞ্জ	১৫৪ (০.৬%)	ঝিনাইদহ	১৯২ (০.৮%)	নাটোর	১৯০ (০.৮%)
কুড়িগ্রাম	২৯৩ (১.২%)	চট্টগ্রাম	১৮৩৮ (৭.৫%)	টাঙ্গাইল	৪৪১ (১.৮%)	নারায়ণগঞ্জ	৪০১ (১.৬%)
কুমিল্লা	১২২৮ (৫.০%)	চাঁদপুর	৫৪৩ (২.২%)	ঠাকুরগাঁও	১৫৭ (০.৬%)	নীলফামারী	২১০ (০.৯%)
কুষ্টিয়া	৩০৩ (১.২%)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৭০ (০.৭%)	ঢাকা	৪৯৬৮ (২০.৩%)	নেত্রকোনা	২২১ (০.৯%)
খাগড়াছড়ি	৮২ (০.৩%)	চুয়াডাঙ্গা	১৫৩ (০.৬%)	দিনাজপুর	৩৩৯ (১.৪%)	নোয়াখালী	৬৪৯ (২.৭%)
খুলনা	৫৫৮ (২.৩%)	জয়পুরহাট	১১৭ (০.৫%)	নওগাঁ	২৫৪ (১.০%)	পঞ্চগড়	১০০ (০.৪%)
গাইবান্ধা	২৮৫ (১.২%)	জামালপুর	২৭৮ (১.১%)	নড়াইল	১১১ (০.৫%)	পটুয়াখালী	২৩৯ (১.০%)
পাবনা	৩০৭ (১.৩%)	বান্দরবান	৩১ (০.১%)	মেহেরপুর	৬০ (০.২%)	লালমনিরহাট	১২৮ (০.৫%)
পিরোজপুর	২০৩ (০.৮%)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬১৭ (২.৫%)	মৌলভীবাজার	১৭৬ (০.৭%)	শরীয়তপুর	১৬১ (০.৭%)
ফরিদপুর	২৪১ (১.০%)	ভোলা	২৪১ (১.০%)	যশোর	৪০০ (১.৬%)	শেরপুর	১১৩ (০.৫%)
ফেনী	৩৭৯ (১.৬%)	ময়মনসিংহ	৫৭৬ (২.৪%)	রংপুর	৩৯৩ (১.৬%)	সাতক্ষীরা	২৬৪ (১.১%)
বগুড়া	৪৯৭ (২.০%)	মাগুরা	১১০ (০.৫%)	রাঙামাটি	৫৯ (০.২%)	সিরাজগঞ্জ	৩৪২ (১.৪%)
বরগুনা	১৩৪ (০.৫%)	মাদারীপুর	১৫১ (০.৬%)	রাজবাড়ী	১৩৫ (০.৬%)	সিলেট	৪৯২ (২.০%)
বরিশাল	৪৫৮ (১.৯%)	মানিকগঞ্জ	১৪৫ (০.৬%)	রাজশাহী	৩৪০ (১.৪%)	সুনামগঞ্জ	১৭৭ (০.৭%)
বাগেরহাট	১৯৪ (০.৮%)	মুন্সিগঞ্জ	১৭০ (০.৭%)	লক্ষ্মীপুর	৩১৮ (১.৩%)	হবিগঞ্জ	১৬৭ (০.৭%)

মতামত: উত্তরদাতাদের ঢাকা জেলার সর্বাধিক। পরবর্তীতে রয়েছে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা।

৫। সংস্কারের মাধ্যমে কেমন পুলিশ দেখতে চান? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

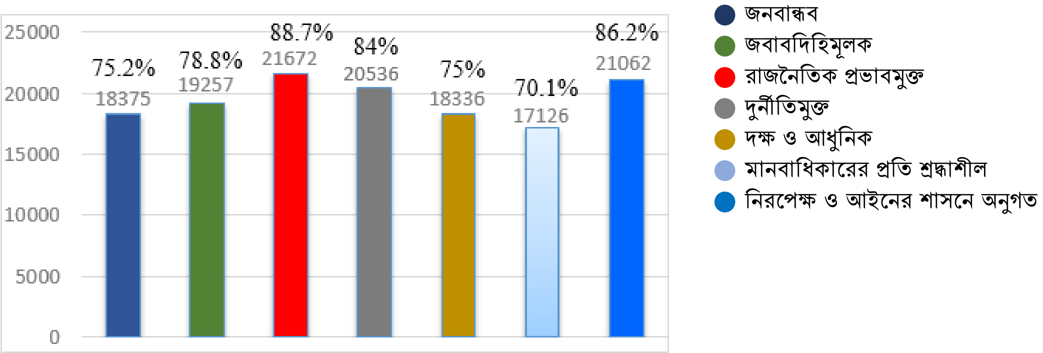

মতামত: সংস্কারের মাধ্যমে কেমন পুলিশ চান জানতে চাওয়া হলে সর্বাধিক মতামত পড়েছে দুটি ক্ষেত্রে: ১ম অবস্থানে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও ২য় অবস্থানে আইনের প্রতি অনুগত/নিরপেক্ষ পুলিশ, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ।

৬। কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার খুব জরুরি মনে করেন? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

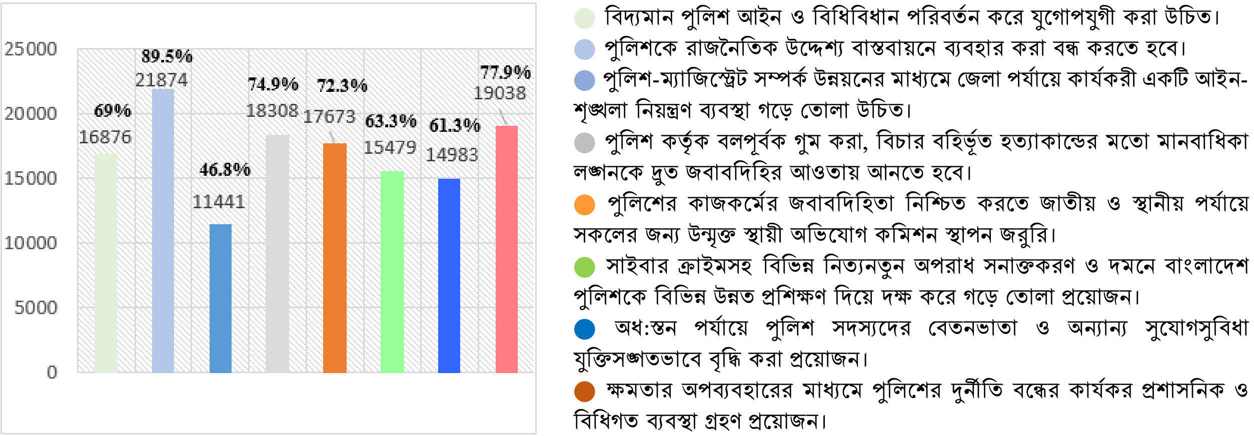

মতামত: পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অবসান চায় ৮৯.৫% উত্তরদাতা। ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুলিশের দুর্নীতি বন্ধ চায় ৭৭.৯% উত্তরদাতা। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বিবেচনায় অপরাধী পুলিশকে জবাবদিহি ও শাস্তির আওতায় আনার পক্ষে মত দিয়েছে ৭৪.৯% উত্তরদাতা।

৭। বিগত কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে পুলিশ কর্তৃক 'গায়েবি/ভুয়া মামলা' দিয়ে বিরোধী দলমত দমন করে আইনের অপব্যবহারের অপসংস্কৃতি চালু হয়েছে। আইনের অপব্যবহার রোধকল্পে আপনি কি মামলা রুজুর ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারাটির সংস্কার চান?

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

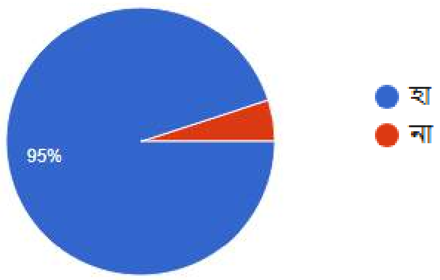

উত্তর	রেসপন্স (টোটাল রেসপন্স ২৪,৪৪২ জন)
হ্যাঁ	২৩২১৬ (৯৫.০%)
না	১২২৬ (৫.০%)

মতামত: ভুয়া বা গায়েবি মামলার অপসংস্কৃতির সংস্কার চান শতকরা ৯৫ ভাগ উত্তরদাতা।

এক্ষেত্রে কমিশন দ্বারা পরিচালিত আলোচনা সভাগুলো থেকে অজ্ঞাতনামা আসামিদের নামে মামলা দেওয়ার চর্চা যতদূর সম্ভব পরিহার করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো পুলিশ সদস্য যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাউকে এই মামলায় হয়রানি করা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮। উত্তর হ্যাঁ হলে কেমন সংস্কার চান? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

মোট রেসপন্স ২৩,০৭৭

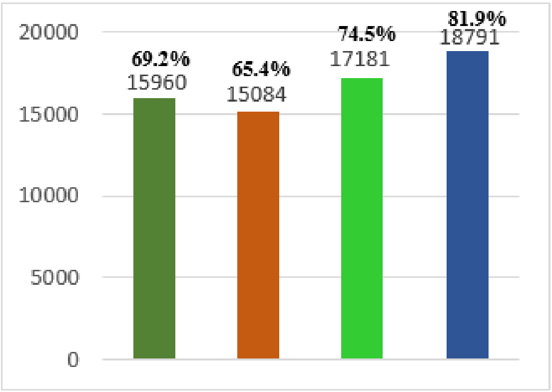

- একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি আসামির বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগে এফআইআর (FIR) রুজু করার পূর্বে থানার ওসি কর্তৃক তথ্য যাচাই পদ্ধতি রাখার বিষয়ে আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।
- এফআইআর বহির্ভূত কাউকে মামলাভুক্ত করতে আদালতে আবেদন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সিডি (CD) বা কেস ডায়রিসহ পেশ করতে হবে।
- মৃত ব্যক্তি, অনিবাসী ব্যক্তি বা নিরপরাধ ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র প্রদান প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে।
- এ ধরনের ভুঁয়া 'ফৌজদারি মামলা রুজুর ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক ভয়ভীতি দেখিয়ে আর্থিক লেনদেন বা অনুরূপ দেনদরবার প্রতিরোধে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা রাখা যায়।

মতামত: ভুয়া বা গায়েবি মামলার ভয়ভীতির মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা চায় ৮১.৯% উত্তরদাতা এক্ষেত্রে মৃতব্যক্তি, অনিবাসী বা নিরপরাধ ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়েরের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা চায় ৭৪.৫%। তবে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা সংস্কার করে থানার ওসির কাছে প্রাক-যাচাইয়ের আইনগত ক্ষমতা প্রদান সমর্থন করেছেন ৬৯.২%। তিনটি ক্ষেত্রেই সংস্কার হিসেবে প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করা যায়।

৯। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল মোকাবিলা ও বিরোধী দলমত দমনে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষায় আপনার পরামর্শ কী? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

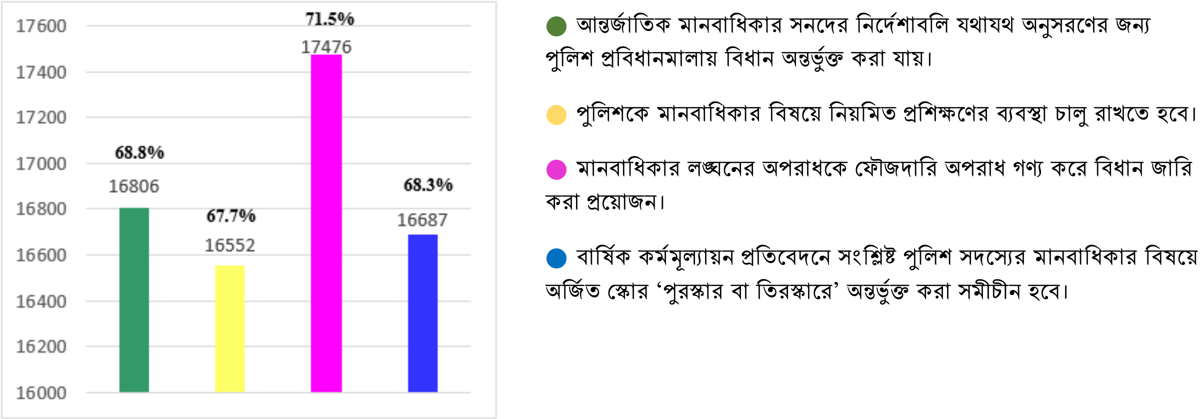

মতামত: বিক্ষোভ মিছিল মোকাবিলা ও বিরোধী দলমত দমনে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন ফৌজদারি অপরাধ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে ৭১.৫% (প্রায়) উত্তরদাতা শাস্তি চায়। অন্যদিকে ৬৮.৮% উত্তরদাতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিস্থাপিত প্রমিত পদ্ধতি (SOP) অনুসরণকে প্রবিধানভুক্ত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাছাড়া মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত পুলিশ সদস্যকে উৎসাহিত করতে বার্ষিক কর্মমূল্যায়নে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে ৬৮.২৭% সমর্থন করেছেন। **যেহেতু মানবাধিকার বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি স্পর্শকাতর ও সহানুভূতিপ্রবণ বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে, তাই মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধের শাস্তি সাধারণ নাগরিকের চেয়ে ইউনিফর্মধারী পুলিশ বাহিনীর জন্য দ্বিগুণ নির্ধারণ করে আইনভুক্ত করার জন্য জোর সুপারিশ করা যায়।**

১০। 'শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তাঘাট বা জনচলাচলে বিঘ্ন না ঘটিয়ে সভাসমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণে বর্তমানে যে বাধ্যবাধকতা চালু রয়েছে তা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে' আপনি কি এই প্রত্যয়ের সঙ্গে একমত? (যেকোন একটি)

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

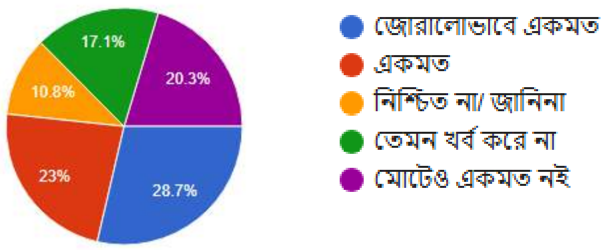

উত্তর	**রেসপন্স**
জোরালোভাবে একমত	৭০০৩ (২৮.৭%)
একমত	৫৬২৫ (২৩.১%)
নিশ্চিত না/ জানি না	২৬৫১ (১০.৮%)
তেমন খর্ব করে না	৪১৯০ (১৭.১%)
মোটেও একমত নই	৪৯৭৩ (২০.৩%)

১১। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিকাশে সভাসমাবেশ করার অধিকার সমুন্নত রাখতে আপনি কি বর্তমানে প্রচলিত ৬ নং প্রশ্নে উল্লিখিত বিধানটির সংস্কার চান?

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

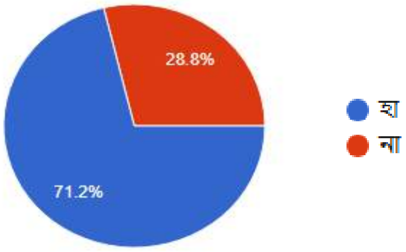

উত্তর	রেসপন্স
হ্যাঁ	১৭৪১১ (৭১.২%)
না	৭০৩১ (২৮.৮%)

মতামত: (১০ ও ১১নং ক্রমিক) সভাসমাবেশ আয়োজনে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণকে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি মনে করেন ৫১.৮% উত্তরদাতা। অন্যদিকে প্রত্যয়টির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন ৩৭.৪%। ১০.৮% উত্তরদাতা এ বিষয়ে অনিশ্চিত বা দ্বিধান্বিত। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সংবিধানের ৩৭নং অনুচ্ছেদে সভাসমাবেশ আয়োজন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন আইন ১৯৭৬ এর ২৯নং ধারা অনুযায়ী পুলিশ কমিশনারকে অনুরূপ সমাবেশ জনস্বার্থে সর্বোচ্চ ৩০ দিন স্থগিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আয়োজনে পূর্বানুমতি গ্রহণের বিষয়টি সেখানে উল্লেখ নেই। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিকাশে ৭১.২ ভাগ উত্তরদাতা বিধানটির পরিবর্তন চান। বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা যায়।

১২। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৫৪ ধারায় পুলিশকে প্রদত্ত বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের ক্ষমতাকে কি আপনি একটি সহজে অপব্যবহারযোগ্য আইনের বিধান মনে করেন?

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

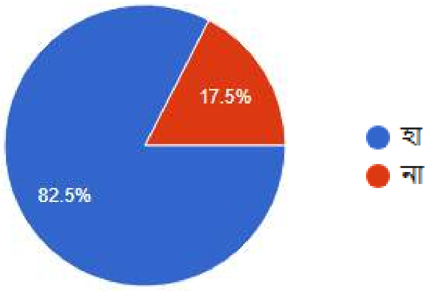

উত্তর	রেসপন্স
হ্যাঁ	২০১৬৯ (৮২.৫%)
না	৪২৭৩ (১৭.৫%)

১৩। উত্তর হ্যাঁ হলে আপনি আইনটির কেমন সংস্কার চান? (যেকোন একটি টিক (√) দিন)

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

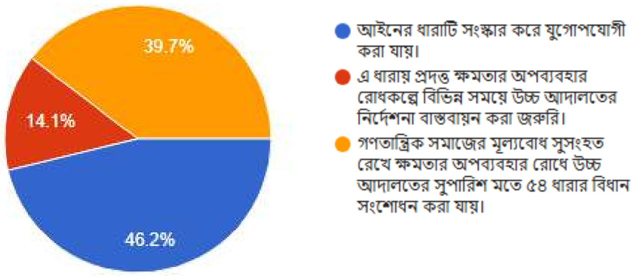

উত্তর	রেসপন্স
আইনের ধারাটি সংস্কার করে যুগোপযোগী করা যায়।	১০০০৩ (৪৬.২%)
এ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে বিভিন্ন সময়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা জরুরি	৩০৪৮ (১৪.১%)
গণতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ সুসংহত রেখে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে উচ্চ আদালতের সুপারিশমতে ৫৪ ধারার বিধান সংশোধন করা যায়।	৮৫৮৬ (৩৯.৭%)

মতামত: (১২ ও ১৩নং ক্রমিক) উত্তরদাতাদের শতকরা ৮২.৫% ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধরা বিধানকে সহজে অপব্যবহারযোগ্য আইনের বিধান মনে করেন। উত্তরদাতাদের ৪৬.২% ধারাটি যুগোপযুগী সংস্কার চান। ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত ৫৪ ধারায় বিধান যুগোপযুগী করার অর্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে বিজ্ঞানসম্মত জীবনমাত্রার সুফলযুক্ত ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে ৩৯.৭% উচ্চ আদালতের সুপারিশমতে ৫৪ ধারায় বিধান সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছেন। দুটি মতামতই প্রণিধানযোগ্য।

১৪। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ১৬৭ ধারায় পুলিশ হেফাজতে বা রিমান্ডে (Remand) আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো পুলিশ হেফাজতে আসামি বা সন্দেহভাজন আটক ব্যক্তিকে নির্যাতন ও হেফাজত মৃত্যু নিয়ে জনমনে ব্যাপক সমালোচনা ও ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। আপনি কি আইনের ধারাটি সংস্কার চান?

মোট রেসপন্স ২৪,৪৪২

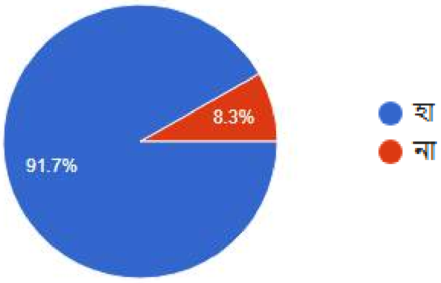

উত্তর	রেসপন্স
হ্যাঁ	২২৪২০ (৯১.৭%)
না	২০২২ (৮.৩%)

১৫। উত্তর হ্যাঁ হলে পুলিশ কর্তৃক রিমান্ডে আসামি বা আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে কী ব্যবস্থা গ্রহণ ফলপ্রসূ বলে মনে করেন? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

মোট রেসপন্স: ২২,৬৮১

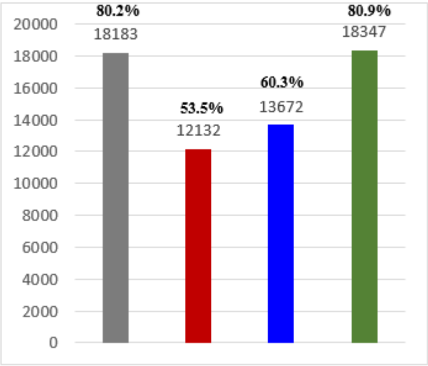

● আটক ব্যক্তি বা রিমান্ডে নেওয়া আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিটি থানায় স্বচ্ছ কাচের ঘোরাটোপ দেওয়া একটি আলাদা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ (Interrogation room) অবশ্যই থাকবে।

● রিমান্ড সংক্রান্তে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের জন্য মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিশ কার্যকরে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

● রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিয়ে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া যায়।

● নারী আসামিকে যথেষ্ট শালীনতার সঙ্গে নারী পুলিশের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

মতামত: (১৪ ও ১৫ ক্রমিক) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় পুলিশ হেফাজতে বা রিমান্ডে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের ধারাটি সংশোধন/সংস্কার চান ৯১.৭% উত্তরদাতা। তন্মধ্যে ৮০.৯% উত্তরদাতা নারী আসামিকে যথেষ্ঠ শালীনতার সঙ্গে নারী পুলিশের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদের পক্ষে মতামত দিয়েছে। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতি থানায় স্বচ্ছ কাচের ঘেরাটোপ ব্যবস্থাসংবলিত আলাদা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকার পক্ষে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৮০.২% মতামত এসেছে। রিমান্ড সংক্রান্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনায় (রিট মামলা নং ৩৮০৬, ১৯৯৮ সন) এ মতামতগুলো প্রদত্ত হয়েছে যা বাস্তবায়ন জরুরি।

১৬। ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে, রাতের বেলায় বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কখনো সাদা পোশাকে অথবা কখনো ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় গৃহ তল্লাশি করছে। তাদের কাছে প্রায়ই কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট বা তল্লাশি পরোয়ানা থাকে না। কখনো আটক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয় না। এগুলো বলপূর্বক গুম বা অন্তর্ধানের সহায়ক কার্যক্রম। এমন নাজুক পরিস্থিতি উত্তরণে আপনার পরামর্শ কি? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

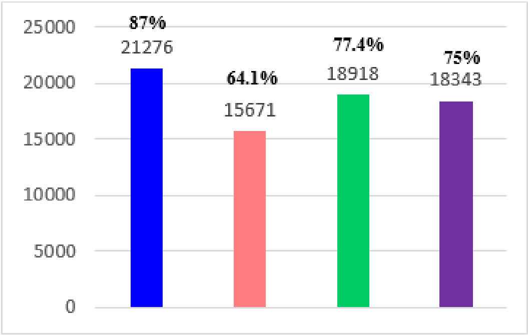

● তল্লাশির সময় পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয় দিতে অস্বীকার করলে অথবা সার্চ ওয়ারেন্ট না থাকলে জরুরি যোগাযোগের জন্য নাগরিক নিরাপত্তা বিধানে একটি জরুরি কল সার্ভিস চালু করা যায়।

● জব্দকৃত মালামালের যথাযথ তালিকা না হলে এবং তল্লাশি কার্যক্রমটি সন্দেহজনক মনে হলে তা তাৎক্ষণিক জানানোর জন্য মেট্রো এলাকায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার/জেলায় পুলিশ সুপারের বরাবরে জরুরি কল সার্ভিস চালু করা।

● অভিযান পরিচালনা করার সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কাছে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ও ভিডিও রেকর্ডিং ডিভাইসসহ (Body-worn-camera) ভেস্ট/পোশাক পরিধান করতে হবে।

● রাতের বেলায় (সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়) গৃহ তল্লাশি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

মতামত: তল্লাশির সময় পরিচয় দিতে অস্বীকার করলে বা বিনা সার্চ ওয়ারেন্টে তল্লাশি করতে চাইলে তার প্রতিকারে একটি কার্যকর কল সার্ভিস চালুর পক্ষে সর্বাধিক ৮৭% উত্তরদাতা মত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আরও দুটি বিষয়ে তারা ব্যবস্থা চান। (১) অভিযানের সময় জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ও ভিডিও রেকর্ডিং ডিভাইসসহ পোশাক পরিধানের ওপর জোর দিয়েছেন (৭৭.৪%) (২) রাতের বেলায় গৃহ তল্লাশি করার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য চায় ৭৫% উত্তরদাতা। জনমত জরিপে প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করে প্রবিধানমালা জারির ব্যবস্থা সুপারিশ করা যায়।

১৭। বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন ধরনের গণমুখী সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। নিচের তালিকা বর্ণিত কার্যক্রম বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কর্মসূচি নবায়ন ও মান উন্নয়নে সহায়তা করবে। সকল বক্স পূরণ করুন।

(I) ৯৯৯ জরুরি কল সার্ভিস

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

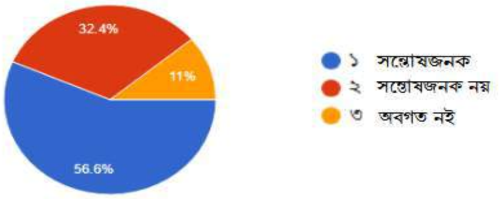

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	১৩৮২৩ (৫৬.৬%)
২. সন্তোষজনক নয়	৭৯২৮ (৩২.৪%)
৩. অবগত নই	২৬৯১ (১১.০%)

(II) অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

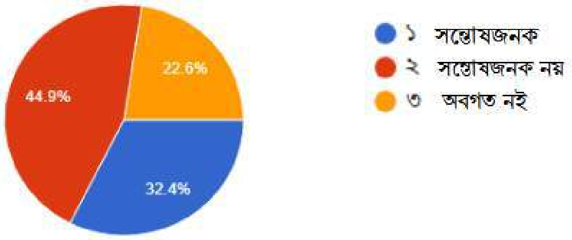

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৭৯২৬ (৩২.৪%)
২. সন্তোষজনক নয়	১০৯৮৫ (৪৪.৯%)
৩. অবগত নই	৫৫৩১ (২২.৬%)

(III) ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

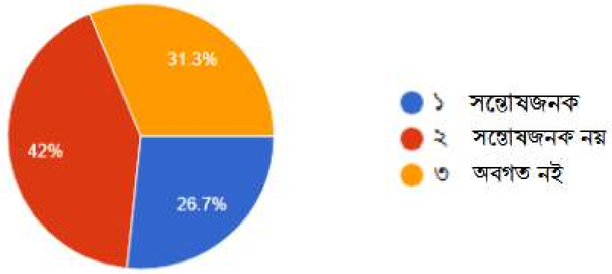

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৬৫১৯ (২৬.৭%)
২. সন্তোষজনক নয়	১০২৭২ (৪২.০%)
৩. অবগত নই	৭৬৫১ (৩১.৩%)

(IV) কমিউনিটি ও বিটপুলিশিং কার্যক্রম

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

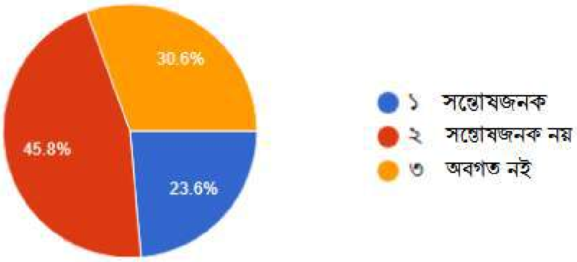

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৫৭৬৭ (২৩.৬%)
২. সন্তোষজনক নয়	১১২০৫ (৪৫.৮%)
৩. অবগত নই	৭৪৭০ (৩০.৬%)

(V) থানায় অনলাইন জিডি করার কার্যক্রম

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

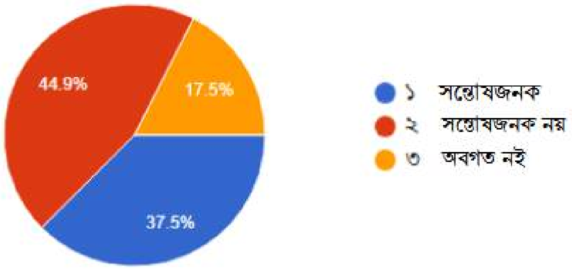

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৯১৭২ (৩৭.৫%)
২. সন্তোষজনক নয়	১০৯৮৬ (৪৪.৯%)
৩. অবগত নই	৪২৮৪ (১৭.৫%)

(VI) নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ডেস্ক

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

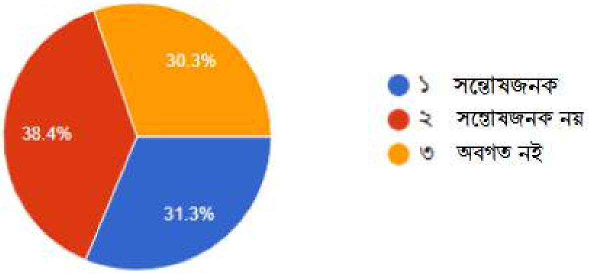

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৭৬৪৫ (৩১.৩%)
২. সন্তোষজনক নয়	৯৩৯৭ (৩৮.৪%)
৩. অবগত নই	৪০০ (৩০.৩%)

(VII) সাইবার ক্রাইম সংক্রান্তে মহিলা হেল্প লাইন

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

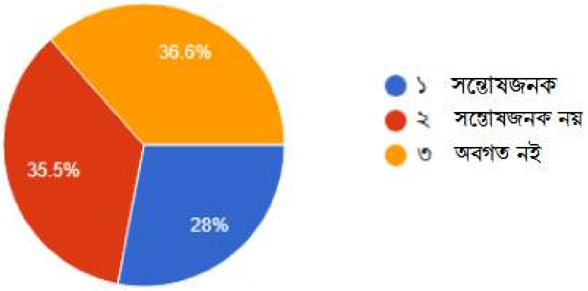

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৬৮৩৪ (২৮.০%)
২. সন্তোষজনক নয়	৮৬৭১ (৩৫.৫%)
৩. অবগত নই	৮৯৩৭ (৩৬.৬%)

(VIII) ই-ট্রাফিকিং প্রসিকিউশন

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

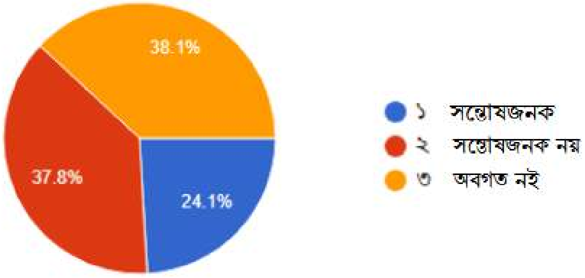

উত্তর	রেসপন্স
১. সন্তোষজনক	৫৮৮৫ (২৪.১%)
২. সন্তোষজনক নয়	৯২৪৭ (৩৭.৮%)
৩. অবগত নই	৯৩১০ (৩৮.১%)

মতামত: পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত কিছু জনবান্ধব সেবামূলক কর্মসূচি দীর্ঘদিন থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে। তন্মধ্যে ১৪নং প্রশ্নে ৮টি চলমান পরিচিত কর্মসূচি সম্পর্কে জনমত জানতে চাওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে সহজে

অনুমান করা যায় যে, হাতেগোনা ১/২ টি কর্মসূচি ছাড়া বাকিগুলোর কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় অথবা তাদের কাজকর্ম জনমতে তেমন ইতিবাচক কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৯৯৯ জরুরি কল সার্ভিসটি ৫৬% উত্তরদাতা সন্তোষজনক জানিয়েছে। এটি বহুল প্রচারিত একটি সেবা কার্যক্রম। অথচ ৪৩.৪% উত্তরদাতা সন্তোষজনক নয় বা অবগত নয় বলে জানিয়েছে।

অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স: এটি তেমন জনমনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেবাটির উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার: মাত্র ২৬.৭% উত্তরদাতা এ সবোটির কার্যক্রম সন্তোষজনক জানিয়েছে। উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

কমিউনিটি ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম: কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় ৪৫.৮% উত্তরদাতা জানিয়েছে। উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

অনলাইন জিডি কার্যক্রম: অতিপ্রয়োজনীয় একটি সেবা কার্যক্রম। এখানেও ৪৪.৯% উত্তরদাতা সন্তোষজনক নয় জানিয়েছে।

নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ডেস্ক: কার্যক্রমটির বিষয়ে অসন্তুষ্টি বেশি। অথচ খুবই প্রয়োজনীয় একটি ডেস্ক। তবে এটি মূলত পরিচালিত হয় শিশু ও মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যেখানে পুলিশ সম্পৃক্ত। সেবাকাজে উন্নতি খুবই কাঙ্ক্ষিত।

সাইবার ক্রাইম সংক্রান্তে মহিলা হেল্প লাইন: সাইবার বুলিং ও সাইবার ক্রাইম সংক্রান্তে ভুক্তভোগী মেয়েদের প্রতিকারের জন্য এটি অনলাইন ব্যবস্থা। তবে কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। ৭২.১% উত্তরদাতা সন্তোষজনক নয় বা অবগত নয় বলে জানিয়েছেন। অতি জরুরি একটি সেবা কার্যক্রমের উন্নতি প্রয়োজন।

ই-ট্রাফিকিং প্রসিকিউশন: এ সেবা কার্যক্রমটিও সন্তোষজনক নয়।

মোদ্দাকথা, পুলিশের সেবাধর্মী কার্যক্রমের যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন। আরও আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনবান্ধব পুলিশিং-এর জন্য জোর প্রচেষ্টা ও প্রচার প্রয়োজন। পুলিশকে সেবাধর্মী ও জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দ্রুত উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় পুলিশ সদর দপ্তরের কার্যকর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বহুল প্রচারসহ গতিসঞ্চার করা অপরিহার্য।

১৮। পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তদন্ত কীভাবে করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন? (যেকোন একটি টিক (√) দিন)

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

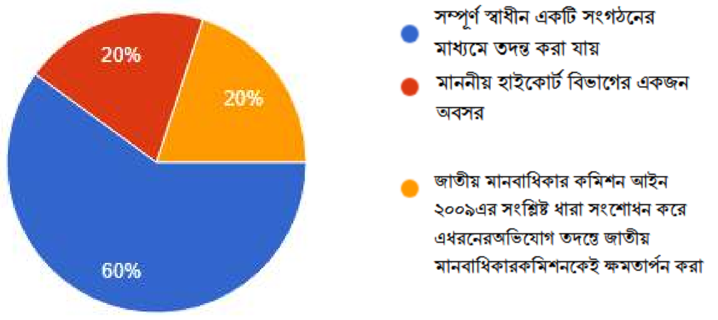

উত্তর	রেসপন্স
সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সংগঠনের মাধ্যমে তদন্ত করা যায়	১৪৬৬১ (৬০.০%)
মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত স্থায়ী তদন্তকমিশনের মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া যায়	৪৮৯৫ (২০.০%)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে এ ধরনের অভিযোগ তদন্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকেই ক্ষমতার্পণ করা যায়।	৪৮৮৬ (২০.০%)

মতামত: পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের জন্য ৬০% উত্তরদাতা একটি স্বাধীন সংগঠনের মাধ্যমে তদন্তের পক্ষে মতামত দিয়েছে। বর্তমানে পুলিশের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তদন্তে স্বাধীন কোনো সংগঠন নেই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৮ নং ধারায় পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তদন্তে কমিশনকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে। জরিপে বাদবাকি ৪০% উত্তরদাতা সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। এক অংশ মনে করেন, মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্থায়ী তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে পারেন। অপর অংশ মানবাধিকার কমিশনকেই আইন সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষমতার্পণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যেহেতু মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তাই এটিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা এখন সময়ের দাবি। কমিশন এক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ক্ষমতাপর্ণসহ একটি স্থায়ী তদন্ত কমিশন গঠনের পক্ষে সুপারিশ করেছে। তবে তদন্ত কমিশনের গঠন ও এখতিয়ার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার সুস্পষ্টভাবে আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করার পক্ষে মতামত প্রদান ও সুপারিশ করা যায়।

১৯। পুলিশকে জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে এবং বিভন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবমুক্ত রাখতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন? (যেকোন একটি টিক (√) দিন)

মোট রেসপন্স: ২৪,৪৪২

উত্তর	রেসপন্স
সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় একটি স্বাধীন 'পুলিশ ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠা করা যায়	১০০৪৪ (৪১.১%)
পুলিশের জন্য আলাদা একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা কমিশন গঠন করা যায়	১৪৩৯৮ (৫৮.৯%)

মতামত: পুলিশকে জবাবদিহি ও বিভিন্ন প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা কমিশনের পক্ষে ৫৮.৯% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন। অন্যদিকে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় পুলিশের জন্য স্বাধীন ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার পক্ষে ৪১.১% মতামত দিয়েছেন। এ বিষয়ে পুলিশ কমিশন বা পুলিশ ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা কোনটি যুগোপযোগী ও জনস্বার্থে অধিক ফলপ্রসূ ও কাম্য, তা বিবেচনার পূর্বে পুলিশ কমিশন গঠন, ক্ষমতা ও এখতিয়ার কী হবে এবং কীভাবে বাস্তবায়নযোগ্য তা বিবেচনা এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে অনুরূপ কমিশন গঠনের অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে এ কমিশন থেকে একটি মতামত প্রণয়ন করা যেতে পারে।

বিশেষ বিশ্লেষণ:

প্রশ্নমালার ৮, ১২, ৩১ ক্রমিকে ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের বিষয়গুলো পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়নি। যেহেতু অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর দেননি। তাছাড়া এত অধিকসংখ্যক উত্তরদাতার বিভিন্নমুখী বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার মতো ফরম্যাট পরিবর্তন করে তথ্যবদ্ধ করা সময়সাপেক্ষ। তবে বিষয়গুলো নিয়ে কমিশন সভায় দ্বৈবচয়ন করে আলোচনা করা যেতে পারে।

৫.৩ সিভিল সোসাইটির ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও মাঠ পরিদর্শন বিষয়াদি:

পুলিশ সংস্কারের মতো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়ায় সফলতা অর্জনের জন্য সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও মতামত জানা অপরিহার্য। এই গবেষণায় সিভিল সোসাইটি সংগঠন, সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে জড়িত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামত জানার জন্য “কেমন পুলিশ চাই” শিরোনামে এই কমিশন কর্তৃক একটি অনলাইন জনমত জরিপ পরিচালিত হয়েছে। জরিপের ফলাফল অনুচ্ছেদ ৫.২ এ উপস্থাপিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক এপর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসহ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলোচনা সভা/বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ সংস্কারের প্রতিটি দিককে বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট ও বহুমুখী একটি চিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন অংশীদারের মতামত, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করে পুলিশ সংস্কারের জন্য কার্যকরী সুপারিশমালা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভার একটি তালিকা পেশ করা হলো:

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন অংশীজন/স্টেকহোল্ডার/প্রতিষ্ঠানের মতবিনিময় সভার তালিকা:

নং	অংশীজন/স্টেকহোল্ডার/প্রতিষ্ঠানের নাম	তারিখ ও সময়	স্থান
০১	UNDP প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	০৬/১০/২০২৪, সকাল ১১.৩০ টা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২	পুলিশ সদর দপ্তরে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৫/১০/২০২৪, সকাল ১০.০০ টা	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
০৩	CID প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৭/১০/২০২৪, সকাল ১০.০০ টা	১২ তলা কনফারেন্স রুম, সিআইডি সদর দপ্তর
০৪	UNODC প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	২৪/১০/২০২৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫	UN প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	৩০/১০/২০২৪, বিকাল ০৩.০০ টা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং	অংশীজন/স্টেকহোল্ডার/প্রতিষ্ঠানের নাম	তারিখ ও সময়	স্থান
০৬	মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিভিন্ন কমিশনের মতবিনিময় সভা	১২/১১/২০২৪, সকাল ১১.০০ টা	প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭	মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৮/১১/২০২৪ বিকাল ০৩.০০ টা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮	কনস্টেবল/নায়ক/এএসআই সদস্যদের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৯/১১/২০২৪, সকাল ১০.০০ টা	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
০৯	এসআই/সার্জেন্ট/ট্রাফিক ইন্সপেক্টর/ইন্সপেক্টর সদস্যদের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৯/১১/২০২৪, সকাল ১১.৩০ টা	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
১০	US Department of the State's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL) ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৯/১১/২০২৪, বিকাল ০৩.০০ টা	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
১১	মাননীয় ভূমি উপদেষ্টার সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	২৬/১১/২০২৪, বিকাল ০৩.০০ টা	সম্মেলন কক্ষ, ভূমি মন্ত্রণালয়
১২	Resident Representative of UNDP ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধানের মতবিনিময় সভা	০৫/১২/২০২৪, সকাল ১১.০০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৩	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা এর সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	০৮/১২/২০২৪, সকাল ১০.৩০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৪	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এর সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	০৮/১২/২০২৪, সকাল ১১.৩০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫	নরসিংদী জেলখানা পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা	০৯/১২/২০২৪, বেলা ১১.৩০ টা	জেলা কারাগার, নরসিংদী
১৬	নরসিংদী জেলার আইন-শৃঙ্খলা কমিটির (জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ) সঙ্গে মতবিনিময় সভা	০৯/১২/২০২৪, বেলা ১২.৩০ টা	সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী
১৭	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে একটি বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ দলের মতবিনিময় সভা	১২/১২/২০২৪, সকাল ১০.৩০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৮	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) দলের সঙ্গে মতবিনিময় সভা	১২/১২/২০২৪, বিকাল ০৩.০০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৯	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বিগত ১৫ বছরে পুলিশি নির্যাতনে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের পরিবার (নির্যাতিত ও গুমের শিকার) এবং জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা	১৫/১২/২০২৪, সকাল ১০.৩০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২০	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা	১৭/১২/২০২৪, সকাল ১০.৩০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নং	অংশীজন/স্টেকহোল্ডার/প্রতিষ্ঠানের নাম	তারিখ ও সময়	স্থান
২১	মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	১৯/১২/২০২৪, সকাল ০৩.০০ টা	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের (বিপিডব্লিউএন) পুলিশ সংস্কার কমিশন এর মতবিনিময় সভা	২২/১২/২০২৪, সকাল ১০.০০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৩	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসেসিয়েশন এর মতবিনিময় সভা	২২/১২/২০২৪, সকাল ১২.৩০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৪	নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা	২৯/১২/২০২৪, সকাল ১০.০০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৫	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা	০৬/১/২০২৫, সকাল ৩.০০ টা	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

মাঠ পরিদর্শন: কমিশন ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সোমবার নরসিংদী সাব-জেল পরিদর্শন করে। কমিশন জেল কোড-এর বিধান অনুযায়ী জেল অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি। জেল কম্পাউন্ডের বহিরাগমনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ জেলার গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন। এবং দুপুরে জেলা প্রশাসক নরসিংদীর সম্মেলন কক্ষে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিগত ০৮/১২/২০২৪ তারিখে কমিশন কার্যালয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মনিটরিং জোরদার করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার বা ডাটাবেজ তৈরিকরণ

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। তবে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর বিধান মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, কাস্টমসের কর্মকর্তাগণ মাদক অপরাধ দমনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত উপরে বর্ণিত সংস্থাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সকল সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা, গ্রেপ্তারকৃত আসামি ও জব্দকৃত আলামতের তথ্যসহ সার্বিক তথ্য প্রাপ্তি ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে দ্রুত অবগতির জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরি করা প্রয়োজন। এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করা সম্ভব হলে এক ক্লিকেই সকল সংস্থার মামলা, আসামি ও আলামত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। এতে তথ্য প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সময় ও খরচ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি দেশের মাদক অপরাধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তা সমাধানকল্পে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা সহজ হবে। এ সফটওয়্যার তৈরি করা হলে আন্তঃসংস্থার গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহপূর্বক মাদককারবারিদের আইনের আওতায় আনা যাবে। বর্ণিতাবস্থায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত উল্লিখিত সংস্থাসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরি করার সুপারিশ করা হলো।

২। বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CDMS) সফটওয়্যারে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রবেশাধিকার প্রদান বা বিকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব (CDMS) তৈরি ও সময় সময় জনগণের প্রবেশাধিকার প্রদান।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। তবে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর বিধান মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, কাস্টমসের কর্মকর্তাগণ মাদক অপরাধ দমনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ সকল সংস্থা কর্তৃক বছরে লাখখানেক (২০২১ সালে ৯৩১৯০ টি, ২০২২ সালে ১০০৩২১ টি ২০২৩ সালে ৯৭২৪১ টি ও ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৬২৪৮৪ টি) মাদক মামলা দায়ের করা হয়। সম্প্রতি মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে বিজ্ঞ আদালতে মাদক মামলার চার্জশিট প্রদানের ক্ষেত্রে CDMS-এ এন্ট্রি দিতে হয়। কিন্তু অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের CDMS এ প্রবেশাধিকার না থাকায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির হতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রেপ্তারকৃত আসামির তথ্য CDMS-এ এন্ট্রি দেওয়া হয়। তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রেপ্তারকৃত আসামীর তথ্য CDMS-এ এন্ট্রি দিলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বাদীর নাম ও পদবি এন্ট্রি দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ CDMS-এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী এন্ট্রি দেওয়ার কোনো অপশন নেই। আবার অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে চার্জশিটের সফট কপি CDMS-এ আপলোড করলে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে অধিদপ্তরের তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জের নামে চার্জশিট এন্ট্রি হয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় CDMS-এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নামে আইডি ও পাসওয়ার্ড না থাকায় এ সমস্যা তৈরি হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিজ্ঞ আদালতের সঙ্গে CDMS-এর সংযোগ থাকায় অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বাদী ও তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম-পদবি এন্ট্রি না হওয়ায় বিজ্ঞ আদালতে আসামি সোপর্দকরণ এবং চার্জশিট দাখিলে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া, CDMS-এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্তণ অধিদপ্তরের এক্সেস না থাকায় গ্রেপ্তারকৃত আসামির পিসি/পিআর তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করে মামলার এজাহারের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় না। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ পুলিশের CDMS সফটওয়্যারে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হলে এ জটিলতার নিরসন হবে এবং মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রম আরও বেগবান হবে। বর্ণিতাবস্থায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, জেলা কার্যালয়/মেট্রো কার্যালয়/বিশেষ জোন/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের অনুকূলে একটি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান তথা বাংলাদেশ পুলিশের CDMS সফটওয়্যারে প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

সুপারিশ:

১। মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার বা ডাটাবেজ তৈরীকরণের সুপারিশ করা হলো।

২। বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CDMS) সফটওয়্যারে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রবেশাধিকার প্রদান বা বিকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব (CDMS) তৈরি ও সময় সময় জনগণের প্রবেশাধিকার প্রদানের সুপারিশ করা হলো।

৬। কমিশন কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়াদি:

৬.১ । আইনি ও প্রবিধানিক: পুলিশ আইন, ১৮৬১সহ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮, পিআরবি, ১৯৪৩ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ প্রস্তাব:

(বিস্তারিত প্রস্তাব সংলগ্নী ০২):

ব্রিটিশ আমলে প্রণীত কিছু কিছু আইন ও প্রবিধান যুগের প্রয়োজনে সংস্কার/হালনাগাদ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কমিশনে নিম্নলিখিত আইনগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা যুগোপযোগী করার জন্য সুপারিশ করছে।

১। পুলিশ আইন, ১৮৬১; পুলিশকে জনবান্ধব ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক বাহিনী/প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন অথবা নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; বলপ্রয়োগ ও মানবাধিকার সুরক্ষায় এ আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো।

৩। পি আর বি, ১৯৪৩; জনবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী গঠনে এ প্রবিধানমালায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তন/পরিমার্জন অথবা নতুন প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৬.২। পুলিশ সদস্যদের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন সরলীকরণ, ঝুঁকি ভাতা/আর্থিক প্রণোদনা: (বিস্তারিত তথ্যাদি প্রস্তাবনাসহ সংলগ্নী -০৩ দ্রষ্টব্য):

পুলিশ সদস্যদের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন সরলীকরণ, ঝুঁকি ভাতা/আর্থিক প্রণোদনা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা

পুলিশ সদস্যরা সমাজের নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন, যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য চ্যালেঞ্জিং এবং প্রতি পদে পদে আছে ঝুঁকি। তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের জন্য শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য, আবাসন, পর্যাপ্ত ছুটি, পেনশন সহজীকরণ এবং আর্থিক প্রণোদনা নিশ্চিত করা অপিরহার্য। পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা প্রতিদিন বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তাদের স্বাস্থ্যহীনতা তাদের কর্মক্ষমতা এবং জনগণের সুরক্ষায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। উপযুক্ত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক পরিবেশে বসবাস করতে পারেন। এটি তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। উপযুক্ত ছুটি ও বিশ্রামের সুযোগ পুলিশ সদস্যদের পুনরুজ্জীবিত হতে সাহায্য করে, যা তাদের কাজের প্রতি মনোযোগ এবং নিষ্ঠা বাড়ায়। ঝুঁকিভাতা, আর্থিক প্রণোদনা পুলিশ সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে, যা তাদের আইনানুগ দায়িত্ব পালনের একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করে। সুতরাং এইসব বিষয় নিশ্চিত করা হলে পুলিশ বাহিনী আরও কার্যকর ও সক্ষম হয়ে উঠবে, যা সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা উন্নয়নের সহায়তা করবে।

সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ সুপারিশ করা হলো

১। পুলিশ সদস্যদের স্বাস্থ্য:

- নিয়মিত ব্যবধানে পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পুলিশের সকল বড় বড় ইউনিটে প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের জন্য কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করতে হবে।
- প্রস্তাবিত পুলিশ মেডিকেল সার্ভিসের আওতায় সকল পুলিশ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- **পুলিশ সদস্যদের ডোপ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নিশ্চিতকরণ:**
  পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত ডোপ টেস্ট এবং সাইকোলজিকাল টেস্টের আওতায় আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করা তাদের পেশাগত দক্ষতা এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য শর্ত। মাদকাসক্তি একজন পুলিশ সদস্যের বিচার-বিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে, যা জনগণের নিরাপত্তা ও আইনের সুশাসনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একইভাবে, মানসিক চাপ বা অস্থিরতা তাদের পেশাগত পারফরম্যান্সে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং কখনো কখনো এটি হিংসাত্মক বা অনৈতিক আচরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকাসক্তি শনাক্ত করা গেলে প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। সাইকোলজিকাল টেস্ট একজন সদস্যের মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করে কর্মক্ষেত্রে চাপ মোকাবিলা এবং দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত কিনা তা নিশ্চিত করবে। এ ধরনের নিয়মিত পরীক্ষা শুধুমাত্র সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন উন্নত করবে না, বরং পুলিশ বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

সুপারিশ: পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত ডোপ টেস্টের ও সাইকোলজিকাল টেস্টের আওতায় আনতে হবে।

২। কর্মপরিবেশের উন্নতি:

- পুলিশ লাইনস, থানা পুলিশ ক্যাম্প, ব্যারাকে সর্বত্র স্বাস্থ্যসম্মত ও মানবিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- অতিরিক্ত কাজের চাপ কমানোর জন্য তাদের কর্মঘণ্টা সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে।
- স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে পুলিশ সদস্যদের তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে।
- মাঝেমধ্যে বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও সতেজতা তৈরি করতে হবে।
- প্রতিটি থানায় আগত মহিলা (ভিকটিম/আটক) এবং কর্মরত মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য চেঞ্জিং/ড্রেসিং/ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- কনস্টেবল থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত সকল পুলিশ সদস্যের জন্য সর্বজনীনভাবে ফ্রেশমানির ব্যবস্থা করা।

৩। অবকাঠামো উন্নয়ন:

- পুলিশ লাইন্স, থানা, ক্যাম্প ইত্যাদি অবস্থানে কনস্টেবল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের জন্য শতভাগ/পর্যাপ্ত সংখ্যক ডরমিটরি/কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ডরমিটরিতে নারী, পুরুষের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন সুবিধা (নারী, পুরুষের আলাদা বিশ্রামাগার, শৌচাগার, পৃথক ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা) নিশ্চিত করতে হবে।
- আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশের জন্য বিশেষত মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। প্রশিক্ষণ:

- পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের মানবাধিকার বিষয়াদির ওপরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে।
- তাদের মানবিক মূল্যবোধে উজ্জিবীত করার জন্য এবং ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা দিতে পৃথক প্রশিক্ষণ মডিউল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বলপ্রয়োগে অনুমোদিত Standard Operating Procedure (SOP) অনুসরণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- বৈধ এবং অবৈধ আদেশ প্রতিপালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণে সম্যক ধারণা দিতে হবে।
- প্রতিটি পুলিশ সদস্য জনগণের সেবক এবং বন্ধু এই মনোভাব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

৫। ছুটি:

- কনস্টেবল এবং সমমানের পুলিশ সদস্যদের কাজের ব্যাপকতা, পরিধি ও সময়কাল বিবেচনা করে তাদের জন্য একটি পৃথক ছুটি গ্রহণ এবং ভোগের অনুশাসন/নীতিমালা সরকার বিবেচনা করতে পারেন।
- পুলিশ ব্যারাকে অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকা পুলিশ সদস্যদের মানসিক চাপ হ্রাস করার জন্য তাদের বছরে ০১ বার ভাতাসহ নির্দিষ্ট মেয়াদের ছুটিভোগ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৬। পুলিশের পুরস্কার কাঠামোর স্বচ্ছতা ও পুনর্মূল্যায়ন:

পুলিশের পুরস্কার প্রদান কাঠামো পুনর্মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ বর্তমান কাঠামো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে গঠিত নয় এবং বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। ফলস্বরূপ, এ কাঠামোকে কেন্দ্র করে অপব্যবহারের অভিযোগ প্রায়ই উঠে আসে। গুম সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারির তদন্তে উঠে এসেছে যে, অনেক অসৎ কর্মকর্তা পুরস্কার (যেমন, মেডেল, ভাতা, বিপিএম/পিপিএম বা এককালীন অর্থ) পাওয়ার জন্য মিথ্যা মামলা, সাজানো অভিযান এবং নির্যাতনের মাধ্যমে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন।

এ ধরনের অনির্দিষ্ট ও প্রভাবিত পুরস্কার কাঠামো শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের অনৈতিক আচরণকে উসকে দেয় না, বরং নিরপরাধ ও দরিদ্র মানুষদেরও এর শিকার বানায়। এর ফলে অনেকের জীবনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে—তাদের জীবন, সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বিগত স্বৈরশাসনের সময় এই কাঠামো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন এবং ভিন্নমত দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাজানো মামলা এবং মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি নেতিবাচক বার্তা প্রেরণ করেছে।

তাই, পুরস্কার কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে এমন একটি সিস্টেম নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যা সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে পুরস্কার ব্যবস্থা প্রকৃত কর্মদক্ষতা এবং নৈতিকতার স্বীকৃতিতে পরিণত হয়।

সুপারিশ: পুলিশের বর্তমান পুরস্কার কাঠামোকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থামতে তাদের বিভিন্ন কাজে প্রণোদনা ও উৎসাহ দিতে বিভিন্ন পুরস্কার (মেডেল ও ভাতা/বিপিএম/পিপিএম অন্যান্য) দেওয়া হয়। বর্তমান কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট কোনো মানদন্ড নেই এবং পুরো প্রক্রিয়াটি প্রভাবমুক্ত নয়। এই সুযোগের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এতদ্‌সংক্রান্ত নিয়মকানুন ও বিধিমালা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

৭। পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস গঠন: **বিস্তারিত সংলগ্নি ০৪ দ্রষ্টব্য**

পুলিশের জন্য একটি পরিপূর্ণ মেডিকেল সার্ভিসের প্রস্তাব করা হচ্ছে এতে নিযুক্ত চিকিৎসক এবং কর্মচারীগণের জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালসহ সারা দেশে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট হাসাপাতাল, জেলা হাসপাতাল, বিভাগীয় হাসপাতালসমূহকে গণনায় নিয়ে একটি পরিপূর্ণ সার্ভিস ক্যারিয়ার গড়ে তোলা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন: ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশে পুলিশের জন্য আলাদা মেডিকেল সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালটি জনবল ও কার্যক্রমে কিছুটা উন্নত থাকলেও অন্যান্য হাসপাতালগুলো তেমন প্রণিধানযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই।

পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস গঠিত হলে প্রশিক্ষিত পেশাদারি পুলিশ সদস্যদের ব্যবহার করে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মাঠ পর্যায়ে **'ফিল্ড মেডিকেল ক্যাম্প'** স্থাপনও সম্ভবপর হবে। **সার্ভিসভুক্ত প্রত্যেক সদস্যকে পুলিশের পোশাকসহ র‍্যাংক ও ব্যাচ প্রদান করতে হবে।**

৬.৩। মানবধিকার ও আইনের শাসন:

পুলিশ রাষ্ট্রের অপরাধ বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে। এ কাজে কখনও কখনও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় বটে, তবে সেটা আইনসিদ্ধ সীমার মধ্যে রাখা জরুরি। এই দ্বন্দ্বটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশ পুলিশের নাগরিক সনদ অনুযায়ী তাদের লক্ষ্য হলো- সকল নাগরিককে নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা এবং বসবাস ও কর্মোপযোগী নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।[2] তাদের প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

- আইনের শাসন সমুন্নত রাখা;
- সকল নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

নাগরিকদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- জনগণের অংশীদারীত্বের (Community Partnership) ভিত্তিতে সামাজিক শান্তি রক্ষা;
- জনগণকে সুরক্ষা, সাহায্য ও সেবা প্রদান এবং আশ্বস্তকরণ;
- সমব্যথী, বিনম্র এবং ধৈর্যশীল হওয়া।[3]

বাংলাদেশ পুলিশকে জনগণের জন্য এমন একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে যেখানে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারসহ আইনের শাসন সুরক্ষিত থাকবে। এই লক্ষ্যে

[2] https://www.police.gov.bd/en/citizen_charter
[3] Ibid.

পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা ও ইতিবাচক ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা এবং সার্বজনীন মানবাধিকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।[4]

মানবাধিকার হলো এমন ধরনের মৌলিক অধিকারসমূহ, যা একজন মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণের কারণেই লাভের অধিকারী হয়। এই অধিকার সার্বজনীন এবং সবার জন্য সমান। মানবাধিকার প্রাকৃতিক বা আইনগত অধিকার হতে পারে, অথবা স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[5]

আজকের দিনে পুলিশের জবাবদিহিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নত বলপ্রয়োগের ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম থাকার কারণে তাদের আরও কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান জবাবদিহিতার ব্যবস্থাটি কেবল অকার্যকরই হয় নাই, বরং এটি জনগণের আস্থাও হারিয়েছে।[6]

বর্তমানে এমন অনেক আইন, নিয়ম ও নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে পুলিশের ক্ষমতার সীমা ও তাদের জবাবদিহিতার জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছে। একইসঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার জন্য তাদের ওপর কঠোর নির্দেশনাও জারি করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ প্রায়শই নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে। এর ফলে পুলিশের ওপর জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা কমে গেছে, এবং জনগণের বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে পুলিশ এখন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। জানমাল রক্ষা এবং জনসেবা পুলিশের মূলনীতি হলেও, সেটি অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন জনগণই তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে এবং ভয় পায়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানসহ বিদ্যমান অন্যান্য আইনে স্পষ্টভাবেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং বেআইনি গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে:

২৭। **আইনের দৃষ্টিতে সমতা**- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

৩১। **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার**- আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২। **জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ**।- আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৩। **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ**।- (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে)

---

[4] https://www.police.gov.bd/en/human_rights
[5] https://www.police.gov.bd/en/human_rights
[6] https://www.thedailystar.net/opinion/views/straight-line/news/the-necessity-substantive-police-reform-3688751

হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

৩৫। **বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ**।- (৪) কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) মেনে চলতে বাধ্য, যার অনুচ্ছেদ ৫-এ বলা হয়েছে যে, "কোনও ব্যক্তিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির সম্মুখীন করা যাবে না"। বাংলাদেশ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এরও সদস্য-রাষ্ট্র, যার অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লেখ রয়েছে যে, "কোনও ব্যক্তিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির সম্মুখীন করা যাবে না"। এছাড়াও বাংলাদেশ ICCPR, UNCAT এবং ICPPED এর সদস্য রাষ্ট্র (পরবর্তীতে আলোচিত)।

জাতীয় মানবধিকার কমিশন

২০০৭ সালে "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭" এর অধীনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণীত হলে বর্তমানে উক্ত আইনের অধীনে কমিশন পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমিশনের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের জনগণের সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত অধিকারসমূহ রক্ষা, উন্নীতকরণ এবং নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এখনো ক্যাটাগরি বি তালিকাভুক্ত রয়েছে, যা এর কার্যক্রম এবং কমিশন প্রতিষ্ঠাকারী আইনের কিছু দুর্বলতা এবং ঘাটতির কারণে হয়েছে। প্রথম থেকে এর কাঠামো এবং আর্থিক কার্যাবলি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়ে গেছে। কমিশনের বেশিরভাগ কমিশনার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন, যেখানে বাইরের পরামর্শ বা নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা থাকে না।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উহার আইনের অধীনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও উহার সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সরাসরি তদন্ত করতে পারে না, যদিও এসব সংস্থার বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, যেমন বিচার বহির্ভূত হত্যা, গুম, ইত্যাদি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, সংবিধান এবং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী অত্যাচার এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তি নিষিদ্ধ। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা প্রায়ই এ ধরনের কার্যকলাপে যুক্ত হয়। আইনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে, যা 'রিমান্ড' নামে পরিচিত, প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগ রয়েছে যে, রিমান্ড চলাকালীন সময়ে বহু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ১৮ ধারা অনুযায়ী শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি নিম্নরূপ:

"১৮। **শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি**।- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শৃঙ্খলা বাহিনীর বা ইহার সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশন নিজ উদ্যোগে বা কোনো দরখাস্তের ভিত্তিতে সরকারের নিকট হইতে প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন চাওয়া হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন,

(ক) সন্তুষ্ট হইলে, এই বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না;

(খ) প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীন কমিশনের নিকট হইতে কোনো সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে উক্তরূপ সুপারিশপ্রাপ্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে সরকার ইহার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিতভাবে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অভিযোগকারী বা ক্ষেত্রমত, তাহার প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করিবে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশ সম্পর্কে চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট প্রসারিত করার এবং রাষ্ট্রের সামরিক ও নিরাপত্তা সংস্থাসমূহের দ্বারা সংঘটিত অভিযোগসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য কমিশন অনেক ক্ষেত্রেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

সুপারিশ:
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সরাসরি সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পাশাপাশি, যদি কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বা তাদের প্ররোচনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান নিজেই যাতে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, সেইলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়েও একটি মানবাধিকার সেল রাখার প্রস্তাব করা হলো।

ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন

বর্তমানে ভিকটিম ও সাক্ষীদের অপরাধীদের ভয়ভীতি বা প্রভাব থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কার্যকর আইনি কাঠামোর অভাব রয়েছে। ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষার জন্য একটি আইন প্রণয়ন জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। এই আইন ভিকটিম ও সাক্ষীদের আইনি সুরক্ষা ও গোপনীয়তার অধিকার নিশ্চিত করবে। এতে অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা সহজ হবে, যা অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এই আইনের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব আরও সুস্পষ্ট এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হবে। পুলিশ ভিকটিম ও সাক্ষীদের সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে। এটি পুলিশের সঙ্গে জনগণের ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষায় আইন জনবান্ধব পুলিশিংয়ের একটি মডেল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।

সুপারিশ: ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা উচিত, যা জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গঠনে র‍্যাবের প্রয়োজনীয়তার পুনর্মূল্যায়ন:

গত ১৫ বছরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর সংশ্লিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং বেআইনি গ্রেপ্তারের মতো গুরুতর অভিযোগের কারণে র‍্যাব দেশীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিতর্কিত হয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০০৩ সালে যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে র‍্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ২০২৫ সালে এসে নতুন করে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাস্তবতায় র‍্যাবের কার্যক্রমের পরিধি, এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং এর সার্বিক প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে না, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সুসংহত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ: পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, র‍্যাবের অতীত কার্যক্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি।

গণঅভ্যুত্থানের ঘটনায় পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতাকে হত্যা ও আহত করার ঘটনায় দোষী পুলিশ সদস্য এবং তাদের নির্দেশদাতাদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এটি কেবল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং পুলিশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠনের জন্য অপরিহার্য। গণঅভ্যুত্থানের সময় ঘটে যাওয়া সহিংসতা জনগণের মনে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস তৈরি করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে পুলিশ-জনসম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে এটি ক্ষমতার অপব্যবহারের বৈধতা দেওয়ার সমান হবে, যা ভবিষ্যতে আরও দমনমূলক আচরণের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সঠিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি প্রদান করলে এটি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি করবে। একইসঙ্গে, এই পদক্ষেপ জনগণের কাছে একটি বার্তা দেবে যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি পুলিশকে সত্যিকার অর্থে জনবান্ধব হয়ে উঠতে সহায়তা করবে।

সুপারিশ: জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতাকে হত্যা ও আহত করার জন্য দোষী পুলিশ সদস্য ও তাদের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বন্দিদের পরিবহন ও হাজতের পরিবেশ উন্নয়ন

বন্দিদের জেলহাজত, কোর্ট হাজত এবং কোর্টে আনা-নেওয়ার সময় ব্যবহৃত যানবাহনের আধুনিকায়ন ও পরিচ্ছন্নতার মান উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত যানবাহনগুলো অনেক সময় অপ্রতুল, অস্বাস্থ্যকর এবং প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাবে বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এ লক্ষ্যে, বন্দিদের পরিবহনের জন্য আধুনিক ও নিরাপদ, মানবিক সেবার সুবিধা যুক্ত যানবাহন সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যেখানে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রযুক্তি সংযোজিত থাকবে। পাশাপাশি, যানবাহনগুলোর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং বন্দিদের জন্য সুস্থ ও মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। একই সঙ্গে, জেলহাজতের পরিবেশকে আরও উন্নত, পরিচ্ছন্ন এবং মানবিক করা অত্যন্ত জরুরি, যা বন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের

ফৌজদারি বিচারিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বাড়াবে এবং বন্দিদের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করবে।

সুপারিশ: পুলিশের তত্ত্বাবধানে থানাহাজত ও কোর্ট হাজতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বন্দিদের কোর্ট থেকে আনা-নেওয়ার সময় ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোতে মানবিক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো।

৬.৪। বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, নির্যাতন এবং বেআইনি গ্রেপ্তার:

জোরপূর্বক গুম করা মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন, যা বিগত সরকারের আমলে দেশে মানবাধিকারের একটি প্রধান সমস্যা ছিল। International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) জোরপূর্বক গুম করার ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে বিবেচনা করেছে। ICPPED হলো জোরপূর্বক গুমের বিষয়ে প্রথম আইনগত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, যার বিধানানুযায়ী এর সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ অপরাধটিকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করতে, তদন্ত করতে এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে বাধ্য। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সম্প্রতি ICPPED এর সদস্য হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট, কনভেনশন, ইত্যাদি কার্যকর করতে সদস্য-রাষ্টের আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান ছাড়াও নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কিত আইনগত বিধি-বিধান বিদ্যমান অনেক আইনেই রয়েছে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় বিবেচ্য অপরাধসমূহে দণ্ডারোপের বিধান রয়েছে। এর মধ্যে ধারা ৩২৩, ৩২৪, ৩৪০, ৩৫২ ও ৫০৬ প্রণিধানযোগ্য।

পুলিশ আইন, ১৮৬১ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী কোনো পুলিশ কর্মকর্তা যদি কোনো ব্যক্তিকে তার হেফাজতে রেখে অবৈধভাবে শারীরিক নির্যাতন করে, তবে সে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে, তাকে জরিমানা হিসেবে সর্বোচ্চ তিন মাসের বেতন অথবা সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য কায়িক শ্রমসহ অথবা কায়িক শ্রম ব্যতীত কারাদণ্ড, অথবা উভয় প্রকার দণ্ড প্রদান করা যাবে। পিআরবি'র ৩২ নম্বর প্রবিধিতে বিধান রয়েছে যে, পুলিশ কর্মকর্তাদের স্থানীয় সরকারের সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তাদের সহায়তা যাচনা করতে হবে।

পিআরবি'র ৩৩ নম্বর প্রবিধিতে পুলিশকে জনসাধারণের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে নিম্নরূপ বিধান রাখা হয়েছে:

(ক) পুলিশ বাহিনী সফলভাবে কাজ করতে পারবেনা, যদি না তারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করে এবং তাদের সহযোগিতা লাভ করে। কাজেই সকল পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যকে দৃঢ়ভাবে কর্তব্য পালনের সময় সকল শ্রেণির মানুষের প্রতি সহনশীলতা, সভ্যতা এবং সৌজন্যতা প্রদর্শন করতে হবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা শুধু নিজেরাই এরূপ নির্দেশনা মেনে চলবেন না, বরং সবসময় অধীনস্তদের এই মর্মে প্রভাবিত করবেন যে, কর্তব্য পালনের সময় যেন তারা যতটা সম্ভব কম বিরোধে জড়িয়ে পড়েন।

(খ) অমার্জিত ব্যবহার, কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ; এবং এইরূপ কোনো অপরাধী নজরে এলে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) এমন কোনো কর্মকর্তাকে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা উচিত হবে না, যিনি স্বভাবজাতভাবে ওপরে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ উপেক্ষা করেন।

বাংলাদেশে Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) এর সদস্য রাষ্ট্র। সে কারণে উক্ত Convention কার্যকারিতা প্রদানে আইনি বিধান করার লক্ষ্যে "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫০ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে সরাসরি নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু সম্পর্কিত বিচারবহির্ভূত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিধান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, যন্ত্রণাদায়ক কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড প্রদানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫(৫) এ সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

২০১৩ সনের ৫০ নং আইনের ২ ধারায়, অন্যান্যের মধ্যে, "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা", "নির্যাতন" ও "হেফাজতে মৃত্যু"-কে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"২(৪) "**আইন প্রয়োগকারী সংস্থা**" অর্থ পুলিশ, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারি কোন সংস্থা।

২(৬) "**নির্যাতন**" অর্থ কষ্ট হয় এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন; এতদ্ব্যতীত—

(ক) কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য অথবা স্বীকারোক্তি আদায়ে;
(খ) সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে;
(গ) কোনো ব্যক্তি অথবা তাহার মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানো;
(ঘ) বৈষম্যের ভিত্তিতে কারও প্ররোচনা বা উস্কানি, কারও সম্মতিক্রমে অথবা নিজ ক্ষমতাবলে কোনো সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকারি ক্ষমতাবলে—

এইরূপ কর্মসাধনও নির্যাতন হিসেবে গণ্য হইবে।

২(৭) "**হেফাজতে মৃত্যু**" অর্থ সরকারি কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু; এ ছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে; কোনো মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত হইবে।"।

"আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" এর সংজ্ঞায় এমন কিছু সংস্থার নাম অনুপস্থিত, যাদের বিরুদ্ধেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। কাজেই সংজ্ঞাটিকে প্রসারিত করে উহাতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, কারা কর্তৃপক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ অথবা শাস্তির সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি যাতে কোনো অজুহাতেই দায়মুক্তি না পায় সেই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১৩ সনের ৫০ নং আইন এর ১২ ধারায় নিম্নরূপ একটি বিশেষ বিধানও রাখা হয়েছে:

"১২। **যুদ্ধ অথবা অন্য ধরনের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য**।- এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধ যুদ্ধাবস্থা, যুদ্ধের হুমকি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা জরুরি অবস্থায়; অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের আদেশে করা হইয়াছে এরূপ অজুহাত অগ্রহণযোগ্য হইবে।"।

৬.৫। বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং রিমান্ড:

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৫৪ ধারার ক্ষমতাবলে পুলিশ যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং ১৬৭ ধারার ক্ষমতাবলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে আটক রাখতে পারে। এই দু'টি ধারার অপব্যবহার মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ। জনগণের দৃষ্টিতে এখন রিমান্ড মানেই শারীরিক নির্যাতন। ধারণা করা হয় যে, জোরপূর্বক অপরাধ স্বীকার করানোর জন্যই রিমান্ডে এধরনের নির্যাতন করা হয়ে থাকে।[7] বিভিন্ন লেখক এবং মানবাধিকার কর্মীরা এটাও বলছেন যে, বাংলাদেশ পুলিশ তাদের "ঘুষ চেইন" বজায় রাখার জন্যও এ ধরনের নির্যাতন করে ঘুষ আদায় করে থাকে এবং এই চেইনটি কনস্টেবল থেকে শুরু করে কমান্ড চেইনের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।[8] উল্লেখ্য, এ ধরনের নির্যাতন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫(৫) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। রিমান্ডে নির্যাতনের মাত্রা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, এতে আসামির মৃত্যু পর্যন্তও ঘটে থাকে। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত তথ্য হতে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ডকুমেন্টেশন ইউনিট ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে কারাগারে ৫৯ জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে।.[9]

বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিষ্ঠুর ও অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের বিষয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তবে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ১৬ বছরের শাসনামলে পুলিশ কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির উক্ত ধারা দুটির অপব্যবহারের মাত্রা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছিল। রাজনৈতিক কারণে কেবল হয়রানির উদ্দেশ্যে পুলিশ উক্ত সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরোয়ানা ছাড়াই হাজার হাজার বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রেপ্তারকৃতদের সরকারের আজ্ঞাবহ নিম্ন আদালতের মাধ্যমে যুক্তিহীন ও অসংখ্য দিনের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে। অধিকতর তদন্তের জন্য রিমান্ডের কথা বলা হলেও রিমান্ডে নিয়ে মূলত আসামিদেরকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এরূপ নির্যাতনে বহু মানুষকে পঙ্গুত্ববরণ, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী এলাকা থেকে পুলিশ বেসরকারি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে এবং পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। একই সময়ে পুলিশ হেফাজতে আরও কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পুলিশ হেফাজতে রুবেলের মৃত্যুর পর বিভিন্ন মহলের দাবির প্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করলে উক্ত কমিটির প্রতিবেদনে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের পক্ষে ১১ দফা সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)সহ অন্যরা হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন করে (Writ Petition No. 3806 of 1998)।

চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল বিচারপতি মো. হামিদুল হক এবং বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ উক্ত রিট মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ছয় মাসের মধ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের জন্য সাত দফা সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ ১৫ দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[10]:

"1) No police officer shall arrest a person under section 54 of the Code for the purpose of detaining him under section 3 of the Special Power Act, 1974.

2) A police officer shall disclose his identity and if demanded shall show his identity card to the person arrested and to the persons present at the time of arrest.

---

[7] See Siddiqui, Muhammad Sazzad Hossain and Hosen, Gazi Delwar (2013). Torture During Police remand: Laws and Practices in Human Rights and Governance Bangladesh; Islam Md Shariful (Editor); pp.173-188; Asian Legal Resource Centre, Hongkong.

[8] Ibid at p.176.

[9] https://www.askbd.org/ask/2024/11/13/deaths-in-jail-custody-jan-oct-2024/

[10] 55 DLR (HCD) (2003) 363.

3) He shall record the reasons for the arrest and other particulars as mentioned in recommendation A (3)(b) in separate for the arrest and other particulars as mentioned in recommendation A (3)(b) in a separate register till a special diary is prescribed.

4) If he finds any marks of injury on the person arrested, he shall record the reasons for such injury and shall take the person to the nearest hospital or Government doctor for treatment and shall obtain a certificate from the attending doctor.

5) He shall furnish the reason for arrest to the person arrested within three hours of bringing him in the police station.

6) If the person is not arrested from his residence or place of business he shall inform the arrested relation of the person over phone, if any, or through a messenger within one hour of bringing him in the police station.

7) He shall allow the person arrested to consult a lawyer of his choice if he so desires or to meet any of his nearest relation.

8) When such person is produced before the nearest Magistrate under section 61, the police officer shall state in his forwarding letter under section 167 (1) of the Code as to why the investigation could not be completed within twenty four hours why he considers that the accusation or the information against that person is well-founded. He shall also transmit copy of the relevant entries in the case diary B.P. Form 38 to the same Magistrate.

9) If the Magistrate is satisfied on consideration of the reasons stated in the forwarding letter as to whether the accusation or the information is well-funded (sic) and that there are materials in the case diary for detaining the person in custody, the Magistrate shall pass an order for further detention in jail. Otherwise, he shall release the person forthwith.

10) If the Magistrate releases a person on the ground that the accusation or the information against the person produced before him is not well-founded and there are no materials in the case diary against that person, he shall and there are no materials in the case diary against that person, he shall proceed under section 190(1)(c) of the Code against that police officer who arrested the person without warrant for committing offence under section 220 of the Penal Code.

11) If the Magistrate passes an order for further detention in jail, the Investigating officer shall interrogate the accused if necessary for the purpose of investigation in a room in the jail till the room as mentioned in recommendation B(2)(b)11 is constructed.

12) In the application for taking the accused in police custody for interrogation, the investigating officer shall state reasons as mentioned in recommendation B(2)(c).

13) If the Magistrate authorizes detention in police custody he shall follow the recommendation contained in recommendation B(2)(c)(d) and B(3)(b)(c)(d).

14) The police officer of the police station who arrests a person under section 54 or the Investigating officer who takes a person in police custody or the jailor of the jail as the case may be shall at once inform the nearest Magistrate as recommended in recommendation B(3)(e) of the death of any person who dies in custody.

[11] Ibid.

15) A Magistrate shall inquire into the death of a person in police custody or in jail as recommended and recommendation C(1) immediately after receiving information of such death.”।

তৎকালীন সরকার ২০০৪ সালে হাইকোর্টের উপরোল্লিখিত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে (Civil Appeal No. 53 of 2004)। দীর্ঘদিন পর শুনানি শেষে আপিল বিভাগ ২০১৬ সালের ২৪ মে উক্ত আপিল মামলার রায় ঘোষণা করে। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ আপিলটি খারিজ করে হাইকোর্ট বিভাগের রায়টি কিছু পরিবর্তনসহ বহাল রাখেন।

আপিল বিভাগের রায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য ৭ দফা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে উক্ত বাহিনীর জন্য ১০ দফা এবং ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক ও ট্রাইব্যুনালের জন্য ৯ দফা নির্দেশনা প্রদান করে।[12]

“**Responsibilities of Law Enforcing Agencies:**

(I) Law enforcement agencies shall at all times fulfill the duty imposed upon them by law, by serving the community and by protecting all persons against illegal acts, consistent with the high degree of responsibility required by their profession.

(II) In the performance of their duty, law enforcement agencies shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons.

(III) Law enforcement agencies may use force only when strictly necessary and to the extent required for the performance of their duty.

(IV) No law enforcement agencies shall inflict, instigate or tolerate any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, nor shall any law enforcement agencies invoke superior orders or exceptional circumstances such as a state of war or a threat of war, a threat to national security, internal political instability or any other public emergency as a justification of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

(V) The law enforcing agencies must not only respect but also protect the rights guaranteed to each citizen by the constitution.

(VI) Human life being the most precious resource, the law enforcing agencies will place its highest priority on the protection of human life and dignity.

(VII) The Primary mission of the law enforcing agencies being the prevention of crime, it is better to prevent a crime than to the resources into motion after a crime has been committed.

Guide lines for the Law Enforcement Agencies:

(i) A member law enforcement officer making the arrest of any person shall prepare a memorandum of arrest immediately after the arrest and such officer shall obtain the signature of the arrestee with the date and time of arrest in the said memorandum.

(ii) A member law enforcement officer who arrests a person must intimate to a nearest relative of the arrestee and in the absence of his relative, to a friend to be suggested

[12] 8 SCOB [2016] AD

by the arrestee, as soon as practicable but not later than 12(twelve) hours of such arrest notifying the time and place of arrest and the place in custody.

(iii) An entry must be made in the diary as to the ground of arrest and name of the person who informed the law enforcing officer to arrest the person or made the complaint along with his address and shall also disclose the names and particulars of the relative or the friend, as the case may be, to whom information is given about the arrest and the particulars of the law enforcing officer in whose custody the arrestee is staying.

(iv) Registration of a case against the arrested person is sine-qua-non for seeking the detention of the arrestee either to the law enforcing officer’s custody or in the judicial custody under section 167(2) of the Code. (v) No law enforcing officer shall arrest a person under section 54 of the Code for the purpose of detaining him under section 3 of the Special Powers Act, 1974.

(vi) A law enforcing officer shall disclose his identity and if demanded, shall show his identity card to the person arrested and to the persons present at the time of arrest.

(vii) If the law enforcing officer find, any marks of injury on the person arrested, he shall record the reasons for such injury and shall take the person to the nearest hospital for treatment and shall obtain a certificate from the attending doctor.

(viii) If the person is not arrested from his residence or place of business, the law enforcing officer shall inform the nearest relation of the person in writing within 12 (twelve) hours of bringing the arrestee in the police station.

(ix) The law enforcing officer shall allow the person arrested to consult a lawyer of his choice if he so desires or to meet any of his nearest relation.

(x) When any person is produced before the nearest Magistrate under section 61 of the Code, the law enforcing officer shall state in his forwarding letter under section 167(1) of the Code as to why the investigation cannot be completed within twenty four hours, why he considers that the accusation or the information against that person is well founded. He shall also transmit copy of the relevant entries in the case diary B.P.Form 38 to the Magistrate.

Guidelines to the Magistrates, Judges and Tribunals having power to take cognizance of an offence:

(a) If a person is produced by the law enforcing agency with a prayer for his detention in any custody, without producing a copy of the entries in the diary as per section 167(2) of the Code, the Magistrate or the Court, Tribunal, as the case may be, shall release him in accordance with section 169 of the Code on taking a bond from him.

(b) If a law enforcing officer seeks an arrested person to be shown arrested in a particular case, who is already in custody, such Magistrate or Judge or Tribunal shall not allow such prayer unless the accused/arrestee is produced before him with a copy of the entries in the diary relating to such case and if that the prayer for shown arrested is not well founded and baseless, he shall reject the prayer.

(c) On the fulfillment of the above conditions, if the investigation of the case cannot be concluded within 15 days of the detention of the arrested person as required under section 167(2) and if the case is exclusively triable by a court of Sessions or

Tribunal, the Magistrate may send such accused person on remand under section 344 of the Code for a term not exceeding 15 days at a time.

(d) If the Magistrate is satisfied on consideration of the reasons stated in the forwarding letter and the case diary that the accusation or the information is well founded and that there are materials in the case diary for detaining the person in custody, the Magistrate shall pass an order for further detention in such custody as he deems fit and proper, until legislative measure is taken as mentioned above.

(e) The Magistrate shall not make an order of detention of a person in the judicial custody if the police forwarding report disclose that the arrest has been made for the purpose of putting the arrestee in the preventive detention.

(f) It shall be the duty of the Magistrate/Tribunal, before whom the accused person is produced, to satisfy that these requirements have been complied with before making any order relating to such accused person under section 167 of the Code.

(g) If the Magistrate has reason to believe that any member of law enforcing agency or any officer who has legal authority to commit a person in confinement has acted contrary to law the Magistrate shall proceed against such officer under section 220 of the Penal Code.

(h) Whenever a law enforcing officer takes an accused person in his custody on remand, it is his responsibility to produce such accused person in court upon expiry of the period of remand and if it is found from the police report or otherwise that the arrested person is dead, the Magistrate shall direct for the examination of the victim by a medical board, and in the event of burial of the victim, he shall direct exhumation of the dead body for fresh medical examination by a medical board, and if the report of the board reveals that the death is homicidal in nature, he shall take cognizance of the offence punishable under section 15 of Hefajate Mrittu (Nibaran) Ain, 2013 against such officer and the officer in-charge of the respective police station or commanding officer of such officer in whose custody the death of the accused person took place.

(i) If there are materials or information to a Magistrate that a person has been subjected to 'Nirjatan' or died in custody within the meaning of section 2 of the Nirjatan and Hefajate Mrittu (Nibaran) Ain, 2013, shall refer the victim to the nearest doctor in case of 'Nirjatan' and to a medical board in case of death for ascertaining the injury or the cause of death, as the case may be, and if the medical evidence reveals that the person detained has been tortured or died due to torture, the Magistrate shall take cognizance of the offence suo-moto under section 190(1)(c) of the Code without awaiting the filing of a case under sections 4 and 5 and proceed in accordance with law."।

রাষ্ট্রপক্ষ পরবর্তীতে Civil Appeal No. 53 of 2004-তে আপিল বিভাগ প্রদত্ত রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করে (Civil Review Petition No. 41 of 2007), যা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অপব্যবহার রোধে করা রিট মামলায় (Writ Petition No. 3806 of 1998) হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়া রায় আপিল বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক ও ট্রাইব্যুনালের জন্য উপরোল্লিখিত দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো জবাবদিহিতার আওতায় আসবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির উক্ত ধারা দুটির অপব্যবহারও হ্রাস পাবে। তাই রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে উহার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে। যদিও

সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা রয়েছে তথাপি, সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিধিবব্ধ করার জন্য আপিল বিভাগের রায়ের আলোকে, প্রয়োজনে, ফৌজদারি কার্যবিধিসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-প্রবিধান সংশোধন করা যেতে পারে।

৬.৬। মিডিয়া ট্রায়াল:

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো প্রায়শই গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গণমাধ্যমের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করে থাকে বা তাদের ছবি ও পরিচয় প্রচার করে থাকে এবং তথাকথিত জব্দকৃত জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখে এমনভাবে উপস্থাপন করে থাকে ও বর্ণনা তুলে ধরে, যাতে বিচারের আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজের চোখে দোষী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে নানারকম আপত্তিকর বিশেষণও ব্যবহার হয়। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়না। এতে যে সম্মানহানি ঘটে তা আর কোনো কিছুর দ্বারা পূরণ হয় না। এমনকি, পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত হলেও তা পুনরুদ্ধার হয় না। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে পরবর্তীতে নানারকম অসম্মান ও অপমানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। নারীদের জন্য এটা হয় আরও বিব্রতকর ও অপমানজনক। বিষয়টি কেবল মানহানিকরই নয়, মানবাধিকারেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের কর্মকান্ড বন্ধে বিভিন্ন সময়ে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এগুলো এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদেরকে যে সকল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৩২ অনুচ্ছেদে আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত না করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে জীবনের অধিকার অর্থ সম্মানজনক জীবনকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু গ্রেপ্তারপরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে উপস্থাপনের সময় অভিযুক্তকে যেভাবে অসম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা উক্ত বিধানের পরিপন্থি। ৩৫ অনুচ্ছেদে- কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা না দেয়, কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড না দেওয়া কিংবা কারও সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রেপ্তার পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে উপস্থাপনের সময় অভিযুক্তকে যেভাবে অসম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে তার মানবিক মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। ৩৫(৪) অনুচ্ছেদে- অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় গ্রেপ্তারপরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে গণমাধ্যমে উপস্থাপন করে কৃত অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে বাধ্য করা হয়, যা উক্ত বিধানের পরিপন্থি।

বিচার করার এখতিয়ার কেবল আদালতের। যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত আদালত কর্তৃক একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে বলা যায় না যে, তিনি প্রকৃত অপরাধী বা তার দ্বারাই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। তাই অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পরে বিচারের আগেই যদি পুলিশ মিডিয়ায় ঘোষণা দিয়ে বলে যে, তিনি অপরাধ করেছেন, তাহলে বিচারের প্রয়োজনীয়তা অর্থহীন হয়ে যায়। কাজেই মৌলিক অধিকার লংঘন করে গণমাধ্যমের সামনে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে উপস্থাপনের সংস্কৃতি থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে।

সুপারিশ:

বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মিডিয়ার সামনে কাউকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

৬.৭। বল প্রয়োগ (use of force):

৬.৭.১ বলপ্রয়োগ (use of force)

বলপ্রয়োগ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের একটি গুরত্বপূর্ণ কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নিজেদের ও জনগণের জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার্থে আইনের বিধান মেনে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় শক্তি প্রয়োগের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু এই শক্তি প্রয়োগের ধাপসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে অনেক সময়ই আইনের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

বলপ্রয়োগ বলতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নিজেদের ও জনগণের জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার্থে আইনের বিধান মেনে প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি ব্যবহার করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে জনগণকে প্রয়োজনীয় সতর্কবাণী প্রদানের পরও জনসাধারণকে বেআইনি সমাবেশ সরিয়ে নিতে সম্মত করাতে ব্যর্থ হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

“Police use physical force to the extent necessary to secure observance of the law or to restore order only when the exercise of persuasion, advice and warning is found to be insufficient.” Sir Robert Peel, `Principles of Law Enforcement’

৬.৭.২. গ্র্যাজুয়েশন ইউজ অব ফোর্স (Graduation Use of Force):

৬.৭.২.১ উদ্দেশ্য:

বল প্রয়োগের উদ্দেশ্য বিবেচনার ক্ষেত্রে জরুরি পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ও অবৈধ জনতার অনুপাত, উপযুক্ত উপায় ইত্যাদি গুরুত্ব পাবে। উপস্থিত দলবদ্ধ জনতার ক্ষোভ প্রশমিত করা এবং নিবারক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আক্রমণের মাত্রা হ্রাস করা বা প্রতিহত করা বলপ্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের নামে কোনো অবস্থায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য বলপ্রয়োগ করা যাবে না। এভাবে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে জড়ো হওয়া অবৈধ জনতাকে সফল হতে না দেওয়া ও তাদের যেকোনো ধরনের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধনে বিরত রাখা এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় নিরাপদ দূরত্বে রাখা হচ্ছে বলপ্রয়োগের মূল লক্ষ্য।

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দাঙ্গা বা বিক্ষোভ দমনে আইনসিদ্ধ মৌলিক নির্দেশনা:

জনসমাবেশ, বিক্ষোভ, দাঙ্গা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রচেষ্টা রোধ ও জননিরাপত্তা সুরক্ষায় নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ বা অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর জন্য করণীয় নিয়ে মৌলিক নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ:-

(ক) জনসমাবেশ যদি নিরস্ত্র থাকে বা কোনো অপরাধজনক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না থাকে তবে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী **পিআরবি-এর ১৪৭ঘ প্রবিধির** প্রতিপালন করে অনুমোদিত বেতের লাঠি বহন করবে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে উক্ত **প্রবিধানমালার ৮৯ প্রবিধিমতে** অনুমোদিত আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে।

(খ) **ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৭ ধারার** আলোকে যেকোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো বেআইনি সমাবেশ সরিয়ে নিতে আদেশ দিতে পারেন। যদি জনতার সমাবেশ ছত্রভঙ্গ না হয় বা না করার দৃঢ়তা দেখায় তবে শুধুমাত্র নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যায় **(পিআরবি’র ১৫৩ প্রবিধি) (পুলিশ আইন ১৮৬১ ধারা৩০-৩০এ)**

(১) উশৃঙ্খল ও বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য **(ফৌজদারি কার্যবিধি’র ১২৭-১২৮ ধারা)**

(২) আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য **(দন্ডবিধির ৯৬-৯৭ ধারা)**

(৩) কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার কার্যকর করার জন্য **(ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ ধারা)**

(গ) ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি

(১) পিআরবি'র প্রবিধি ১৫১: ম্যাজিস্ট্রেট যখন উপস্থিত থাকবেন তিনি হবেন মুখ্য নির্দেশদাতা । কখন বলপ্রয়োগ করতে হবে এবং গুলিবর্ষণ আদেশ দিতে হবে সেজন্য তিনিই দায়ী থাকবেন।

(২) **পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৩গ (২)** মতে গুলিবর্ষণের পূর্বে **'সতর্কবাণী'** প্রদান করবেন।

(৩) গুলিচালনা শুরু ও গুলিচালনা বন্ধের নির্দেশ তিনিই দিবেন। **(পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৫)**

(৪) বলপ্রয়োগের মাত্রা এমন হতে হবে যাতে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা নিশ্চিত হয় **(পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৩-১৫৪)**

(৫) তবে পুলিশ বাহিনীর অবস্থান, বলপ্রয়োগের কার্যকর কৌশল নির্ধারণে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(ঘ) মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধস্তন কর্মকর্তা বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেবেন। **(ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৯ ধারা)**

(ঙ) মেট্রোপলিটন এলাকায় দাঙ্গা দমনে নিয়োজিত সামরিক বাহিনী পুলিশ কমিশনার বা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনায় বলপ্রয়োগ করবে। **(ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৯ ধারা)**

(চ) দাঙ্গা ও গোলযোগ দমনে এবং শান্তিশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পুলিশ সুপারের আলোচনা করা সমুচিত হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী (Special Armed Force) বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত হলে সেক্ষেত্রে ঐ বাহিনীর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। **(পিআরবি'র প্রবিধি ১৪৬)**

৬.৭.২.২. বলপ্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত ৫টি ধাপ:

১৮৯৮ সনের ফৌজদারি আইন, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৯৪৩ সনের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন্স (পিআরবি)'র যথাযথ অনুসরণ করে এবং সেসঙ্গে সময়ের বিস্তর ব্যবধানে আধুনিক বিশ্বে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যে সকল প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার করা হয় তা বিবেচনায় নিয়ে বাাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) ধাপে বল প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ সংস্কার কমিশনে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি ধর্তব্যে নিয়ে কমিশনের প্রণীত ধাপগুলোকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক বল প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য UNITED NATIONS COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS (UNCHR), UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) সহ আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুসরণের জন্য আইনগত বৈধতা দিয়ে প্রতিপালনের জন্য কমিশন মধ্যমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে সুপারিশ করছে। এতে ন্যূনতম ক্ষতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, এমনকি কোনো প্রাণহানির ঝুঁকিও এড়িয়ে চলা সম্ভপর হবে ।

স্তর-১ শারীরিক সংস্পর্শ ব্যতীত অবৈধ জনতাকে বাধা প্রদান (পিআরবি ও জাতিসংঘ মানদন্ড):

সংঘবদ্ধ জনতা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হতে থাকলে সাধারণ ইউনিফর্মে পুলিশ সদস্যদের এমনভাবে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে উপস্থিত জনসাধারণ নিরাপদ বোধ করেন। সংঘবদ্ধ জনতা মিছিল, সমাবেশ বা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করার প্রবণতা দেখালে পুলিশ সদস্যরা নিরাপদে দৃশ্যমানভাবে নিয়োজিত হবেন, যাতে মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণকারী জনতাকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানালে, তারা যেন সহজতম পথে সেই স্থান ত্যাগ করতে পারেন। এই স্তরে পুলিশের উপস্থিতিতে মিছিল-সমাবেশ করা জনতা ও চতুর্পার্শ্বের সাধারণ জনগণ

নিরাপদ বোধ করেন এবং অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনে জড়ো হওয়া জনতার ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মিছিল, সমাবেশে অংশগ্রহণকারী জনতার কোনো শারীরিক সংস্পর্শ হয় না এবং কোন বিশেষ Crowd Control Techniques জনতার ওপর প্রয়োগ করতে হয় না। পুলিশ কর্তৃক সংঘবদ্ধ জনতাকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে তারা যদি ছত্রভঙ্গ না হয়ে অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে তবে পুলিশ সদস্যরা Crowd Control Gear যথা: Steel Helmet, Bullet Proof Jacket, Leg Guard, Arms Guard, Thigh Guard, Gas Musk ইত্যাদি পরিধান করবেন এবং জনতার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন।

স্তর-২ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা (পিআরবি ও জাতিসংঘ মানদন্ড):

এই পর্যায়ে জড়ো হওয়া জনতাকে পুলিশ কর্তৃক বেআইনি ঘোষণা করা হলেও তারা ছত্রভঙ্গ না হওয়ার প্রবণতা দেখায়। অবৈধ জনতা পুলিশ সদস্যদের ক্লোজ কন্টাক্টে আসে বা আসার চেষ্টা করে। সংঘবদ্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যরা Road Block, Clearing Wave, Offensive Jump কৌশল প্রয়োগ করার মাধ্যমে জনতার সঙ্গে নিজেদের নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করে (পিআরবি ১৫২(২) শারীরিক ইনজুরির পরিমাণ কমিয়ে আনেন ও নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা অবৈধ জনতার দখলমুক্ত করে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসেন (পুলিশ আইন, ১৮৬১ এর ধারা ৩০, ৩০এ; ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১২৭, ১২৮; দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ১৪৪; পিআরবি'র ১৯৪৩ প্রবিধি ১৪৩, ১৪৪, ১৫২(২))।

স্তর-৩ বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে অবৈধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা (পিআরবি ও জাতিসংঘ মানদন্ড):

বারংবার সমঝোতার চেষ্টা ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরও বেআইনি সমাবেশের জনতা সংঘবদ্ধ থাকলে এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা না দেখিয়ে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্নোক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে:

ক) সমাবেশ ও মিছিলের স্থান বা চলাচলের পথ আইনসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরও যদি অনুমোদনহীন এলাকা সমাবেশ বা মিছিল করে অতিক্রম করে, যার ফলে সাধারণ মানুষের জানমাল ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;

খ) বেআইনি ঘোষিত সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানানোর পরও স্থান ত্যাগ না করলে;

গ) কোনো এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রোড ব্লক, চেক পয়েন্ট বা নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করা হলে জনতা যদি অবৈধভাবে সেখানে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করে;

ঘ) কোনো গ্রেপ্তারকৃত বা আটক অপরাধীদের পলায়ন প্রতিরোধ বা তাদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উচ্ছৃঙ্খল জনতা আক্রমণ, ইত্যাদি করলে Cordon, Clearing Wave, Baton Charge ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে এবং গ্যাস স্প্রে, সাউন্ড হ্যান্ড গ্রেনেড, জলকামান, গ্যাস/স্মোক ক্যানিস্টার ও লঞ্চার, হ্যান্ড স্টান ক্যানিস্টার, সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল লঞ্চার, পেপার স্প্রে, শটগান, ইলেকট্রিক পিস্তল (TASER Gun) প্রভৃতি ব্যবহার করে অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ বা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই পর্যায়ে অবৈধ জনতাকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে চাপের সম্মুখীন হতে হয়। প্রয়োজনে পরিস্থিতি বিবেচনায় Front, Lateral ও Ambush Arrest Technique অনুসরণ করে দলনেতা ও অন্যান্য গোলযোগে উস্কানিদাতা অবৈধ জনতাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

স্তর-৪ প্রাণঘাতী বা ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার (পিআরবি ও জাতিসংঘ মানদন্ড):

বিভিন্ন কৌশলে শক্তি প্রয়োগ করেও অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গ না হলে বরং আরও সংঘটিত হওয়ার প্রবণতা দেখিয়ে মারমুখী আচরণ করলে ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা ঘটালে এবং পুলিশ ও সাধারণ জনগণকে আঘাত করে আহত করলে কমান্ডার তাঁর সদস্যদেরসহ আড় (Cover) নেবেন। Water Cannon, APC ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে Specific Skills প্রয়োগ করে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে Shot Gun, Sound Grenade, Individual Fire Arms নির্দিষ্ট টার্গেটে ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবেন। এই পর্যায়ে অবৈধ উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণের কারণে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, শারীরিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় এবং কমান্ডার ও পুলিশ সদস্যদের এই পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। কেউ আহত হলে কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সকল কৌশল বন্ধ রেখে অ্যাম্বুলেন্সে আহত সদস্যদের Casualty Evacuation এর ব্যবস্থা করবেন।

এই স্তরে আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। জনতার ওপর গুলিবর্ষণের নির্দেশকে একটি চরম ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং কেবলমাত্র পুলিশ সদস্যদের বা ব্যক্তির আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রযোজ্য হবে (পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৩(ক), (খ), (গ))। তবে যে পরিস্থিতি ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে বাধ্য করেছে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারীর ওপর বর্তায় (সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১০৫; পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৩(খ))।

স্তর- ৫ দলগত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার (পিআরবি ও জাতিসংঘ মানদণ্ড):

বেআইনি সমাবেশের দলনেতা ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সমঝোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে এবং বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বরং অবৈধ ঘোষিত জনতা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে নিম্নোক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে:

৫(ক). যাতে দেহের বা সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ন হয় (১৮৬০ সালের পেনাল কোডের ১০০, ১০৩ ধারা)। যথা:

১) এরূপ আক্রমণ যা এমন যুক্তিসঙ্গাত আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে প্রকারান্তরে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতই হবে অনুরূপ আক্রমণের পরিণতি;

২) সাধারণ মানুষ বা পুলিশ সদস্যদের অপহরণ বা আটকের অভিপ্রায়ে আক্রমণ;

৩) গুরুতর প্রকৃতির অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করার জন্য যার ফলশ্রুতিতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে;

৪) বাসগৃহ বা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমন ইমারত, ভবনে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন করলে;

৫) ব্যাপক জ্বালাও-পোড়াও করে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে সাধারণ মানুষ ও পুলিশ সদস্যদের হতাহত করলে ও জানমালের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করলে ইত্যাদি।

৫ (খ). বেআইনি জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে ক্রাউড কন্ট্রোল টেকনিকের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ হলে যখন জানমাল ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখন চরম ব্যবস্থা হিসেবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে দক্ষ শ্যুটার দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে Collective Fire Arms ব্যবহার করিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্য গুরুতর আঘাত এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যেতে পারে। দেহ বা সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার যুক্তিযুক্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ আতঙ্ক অব্যাহত থাকে ততক্ষণ বলবৎ থাকে। তবে কখনোই এই সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরোপ করা যাবে না এবং অবৈধ জনতা ও আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখালেই শক্তি প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। এই পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে প্যারা মিলিটারি ও অন্যান্য ফোর্সের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

৬.৭.৩. শক্তি প্রয়োগের মূলনীতিসমূহ (Basic Principles of the Use of Force)

৬.৭.৩.১. সমানুপাতিকতা/সামঞ্জস্য বিধান (Proportionality):

- শক্তি প্রয়োগের মাত্রা আইনসম্মত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঝুঁকি বা বিপদের আশঙ্কার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- জরুরি প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে এবং সর্বনিম্ন ক্ষতি করা যাবে।

৬.৭.৩.২. বৈধতা (Legality):

- কেবল আইনসম্মত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- বেআইনি শক্তি প্রয়োগের জন্য কোনো ব্যতিক্রম বা ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬.৭.৩.৩. জবাবদিহিতা (Accountability):

- শক্তি প্রয়োগের সকল ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর রিপোর্ট করতে হবে এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই ও অনুসন্ধান করতে হবে।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে তাকে দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।
- উর্ধ্বতনের অবৈধ আদেশকে শক্তি প্রয়োগের আইনসম্মত বৈধতা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬.৭.৩.৪. প্রয়োজনীয়তা (Necessity):

- প্রথমে অহিংস বা অনাক্রমণাত্মক বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যথা: Cordon, Clearing, Wave, Baton and Soft Empty Hand Control-Arrest and Control Tactics, Handcuffs Restraints etc.
- কেবল জরুরি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে।
- প্রত্যেক ধাপেই সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে হবে।
- শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরোপ করা যাবে না এবং অবৈধ জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখালেই শক্তি প্রয়োগের মাত্রা যুক্তিসঙ্গতভাবে কমিয়ে আনতে হবে।

৬.৭.৪. শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

৬.৭.৪.১. নেগোশিয়েশন (Negotiation):

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বেআইনি সমাবেশের দলনেতাদের সঙ্গে কমান্ডার প্রতিটি পর্যায়েই সমঝোতামূলক আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

৬.৭.৪.২. ইন্টেলিজেন্স কালেকশন (Intelligence Collection):

সংঘবদ্ধ অবৈধ জনতার ওপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পূর্বে কমান্ডার ছদ্মবেশে তাঁর নিজের কিছু লোককে জনতার সঙ্গে মিশিয়ে বা সাধারণ এলাকাবাসীকে অবৈধ জনতার সঙ্গে মিশিয়ে মিছিলকারীদের অভিপ্রায়, প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করবেন। অন্যান্য গোয়েন্দা ও সাহায্যকারী সংস্থার সঙ্গে সময়ে সময়ে যোগাযোগ রক্ষা করেও কমান্ডার তথ্য সংগ্রহ করবেন।

৬.৭.৪.৩. ওয়ার্নিং (Warnings) / সতর্কবাণী / হুঁশিয়ারি উচ্চারণ [(পিআরবি'র প্রবিধি-১৫১(৪), ১৫৩ (গ)(২), ১৫৪(ক), ২৫২)]:

শক্তি প্রয়োগের পূর্বে প্রতিটি ধাপেই কমান্ডার সংঘবদ্ধ জনতার উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করবেন এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দেবেন। ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য ওয়ার্নিং অবশ্যই পরিষ্কার কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাষায় দিতে হবে। এ ধরনের সতর্কবাণী এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কারখানার মালিক, অধ্যক্ষ, অফিস প্রধান অন্যান্য ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদান করা উত্তম এবং এটি বারংবার উচ্চারণ করতে হবে।

ফায়ার আর্মস দ্বারা ওয়ার্নিং শট পরিস্থিতি শান্ত না করে অনেক সময়ই জটিল করে তোলে বিধায় তা পরিহার করা শ্রেয় [(পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৫(খ))]। বিশেষ প্রয়োজনে কমান্ডারের নির্দেশনা সাপেক্ষে সাউন্ড হ্যান্ড গ্রেনেড বা অন্য কোনো উপায়ে ওয়ার্নিং দেওয়া যেতে পারে।

৬.৭.৪.৪. বল প্রয়োগের দর্শন:

পুলিশ অফিসার অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সর্বাবস্থায় বুদ্ধি বিবেচনাপ্রসূত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করবেন [(পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৩, ১৫৪(গ) (ঘ), ১৫৫(গ) (ঘ)]।

৬.৭.৪.৫. Escalation (এসক্যালেশন) এবং De-escalation (ডি-এসক্যালেশন) of Force:

- অবৈধ জনতার আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাবনতিশীল হলে পুলিশ সদস্যরাও বল প্রয়োগের মাত্রা যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি করবেন।
- অবৈধ জনতা আক্রমণের মাত্রা হ্রাস করলে বা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা দেখালে দলনেতা পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব হবে তাঁর টিমের সদস্যদেরসহ বল প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করা। [(পিআরবি'র প্রবিধি-১৫৫(ঘ)]।
- প্রয়োজন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বল প্রয়োগের মাত্রা হ্রাস বা বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের ওপর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দায়িত্ব বর্তাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বল প্রয়োগ কেবলমাত্র তখনই করা যেতে পারে যখন যুক্তিযুক্তভাবে আইনসঙ্গত ক্ষেত্র তৈরি হয় (পরিস্থিতি অবহিতকরণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে) এবং কখনই প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি আরোপ করা যাবে না [(ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা-১৩০(২); পিআরবি'র প্রবিধি-১৫৫(গ)]। ক্রাউড কন্ট্রোলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের পূর্ব হতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক। অবিরাম শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল থেকে অবৈধ জনতার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কিছুতেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যাবে না।

৬.৭.৪.৬. শক্তি প্রয়োগ:

সংঘবদ্ধ অবৈধ জনতাকে উপলব্ধি করাতে হবে যে ইউনিট হতে সামগ্রিকভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, কেউ ব্যক্তিগতভাবে করছে না। মনে রাখতে হবে, 'শক্তি ব্যবহার করার চেয়ে প্রদর্শন করা সব সময়ই প্রশংসনীয়।'

৬.৭.৫. শক্তি প্রয়োগকালে দৈহিক আঘাতের স্থানসমূহ / (Strike Body Zones on the Use of Force):

শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে আইনের বিধানসাপেক্ষে অবাধ্য অপরাধীদের দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যাটন বা অন্য কোনো উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সর্বনিম্ন আঘাত করা যাবে।

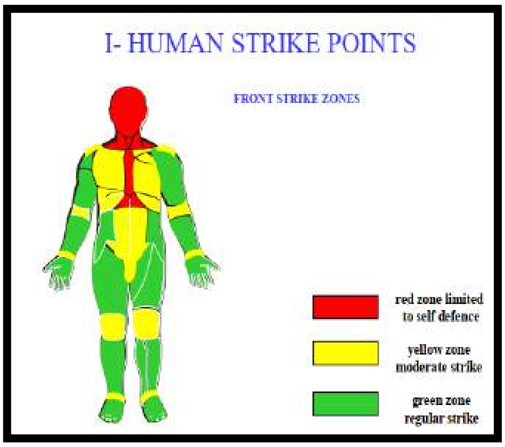

- লাল অংশ: মাথা, গলা ও গলা হতে শ্বাসনালির মধ্যচ্ছদা পর্যন্ত, ঘাড়, মেরুদণ্ড এবং কুঁচকি ও নাভির অব্যবহিত নিচের প্রাইভেট পার্টস অংশে আঘাত পুরোপুরি নিষিদ্ধ।
- হলুদ অংশ: গলার নিচ থেকে কোমর পর্যন্ত অংশে সামনে পেছনে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে। দুই হাতের কবজি ও কনুই এবং দুই পায়ের হাঁটু ও গোড়ালি অংশে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে।

- সবুজ অংশ: স্কন্ধ, হাত (কবজি ও কনুই ব্যতীত), কোমরের পশ্চাৎভাগ ও কুঁচকির নিচে পায়ের অংশে (হাঁটু ও গোড়ালি অংশ ব্যতীত) প্রয়োজনমতো আঘাত করা যাবে।

৬.৭.৬. শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা:

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটে না। শক্তি প্রয়োগের ফলে অবৈধ জনতাসহ সাধারণের অনেকেই শারীরিকভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে। পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৬ মতে, জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার পর পরই তার দলের জন্য ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত অস্ত্র গোলাবারুদের সংখ্যা মিলিয়ে নেবেন। সম্ভবপর দ্রুততম সময়ে তিনি ঘটনা সংক্রান্তে প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া আইনে উল্লিখিত অপরাপর দায়িত্বও তাকে সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে হবে।

৬.৭.৬.১. শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনগত বিধিবিধান:

ক) পিআরবি'র প্রবিধান ১৫৬:

পুলিশ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পর যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

কোনো বেআইনি জনতার বিরুদ্ধে বা একটি ক্ষুদ্র দলের অথবা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে পুলিশ যখন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে তখন নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যথা:

(ক) অধিনায়ক পুলিশ অফিসার যত শীঘ্র সম্ভব মৃতদেহগুলো (যদি থাকে) মর্গে এবং আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ করবেন।

(খ) তিনি গুলির খোসাগুলো সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবেন ও ইস্যুকৃত রাউন্ডের সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন।

(গ) অনুচ্ছেদ ক) এর অধীনে কার্যক্রম গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তবে তিনি এবং অধিনায়ক পুলিশ অফিসার প্রথমে—

(১) ঘটনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত প্রতিবেদন এবং তারপর,

(২) ব্যবহৃত ও ইস্যুকৃত গুলির সংখ্যাসহ ঘটনার সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটি নিখুঁত ও বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করবেন।

(ঘ) সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিবরণ দ্রুত পাঠাতে হবে:

(১) যদি একজন ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন, তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, পুলিশ সুপারকে, বিভাগীয় কমিশনারকে এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে অনুরূপ প্রতিবেদন পাঠাবেন এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি পুলিশ কমিশনার, আইজিপি ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে প্রেরণ করতে হবে।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অধিনায়ক পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৬.৭.৬.২. পুলিশ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে নির্বাহী তদন্ত (পিআরবি'র প্রবিধি ১৫৭):

(ক) যখনই পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে থাকে, তখনই গুলিবর্ষণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না এবং এ প্রবিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী তদন্ত করতে হবে।

(১) যদি একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন পুলিশ সুপার, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গুলিবর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তবে কমিশনার কর্তৃক তদন্ত হবে।

(২) যদি একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী পুলিশ সুপার গুলিবর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত হবে।

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত একজন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করবেন।

(খ) যদি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন বা রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল বা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার ইচ্ছা করেন তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসারের থেকে উর্ধ্বতন পদমর্যাদার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদের নিচে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসার উক্ত তদন্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। এরূপ অফিসার সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণের বা পরীক্ষা করার অধিকারী হবেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তার মতামত ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারের প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত হবে।

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেও উল্লিখিত নির্বাহী তদন্ত হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু তদন্তে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচ্য তদন্তে ব্যবহার করা যাবে।

(ঘ) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট ও অধিনায়ক পুলিশ অফসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি অনুসন্ধানকারী অফিসারের কাছে পেশ করতে হবে।

(ঙ) তদন্তের সময় কোনো পক্ষের আইনজীবী কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব অনুমোদিত হবে না। তবে কোনো পুলিশ অফিসারের আচরণ যদি বিচার্য বিষয় হয় তবে সে পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করা ও সাক্ষীদের জেরা করা এবং মৌখিক বা লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদানের অনুমতি দেওয়া যাবে।

(চ) অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর অনুসন্ধানকারী অফিসার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলের কাছে পেশ করার জন্য প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পুলিশ সুপার বা রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করবেন।

বিঃ দ্রঃ মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন প্রযোজ্য।

তথ্যসূত্র:

- ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬, ৫০, ১২৭-১৩২
- দণ্ডবিধির ধারা ৯৬-১০৬, ১৪৪, ১৪৫
- পিআরবি'র প্রবিধি ১৩৩-১৫৮
- পুলিশ আইনের ধারা ৩০, ৩০এ, ৩১
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
- মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনসমূহ
- Sir Robert Peel, `Principles of Law Enforcement`
- Directives on Detention, Searches and Use of Force for Mambers of Formed Police Units on Assignment With UNAC, 13 January 2016, DPKO
- DPKO Police on Graduation Use of Force of Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- DPKO Policy (revised) on Function and Organization of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations Ref 2016.10;
- Guidelines on Police Command in Units in United Nations Peacekeeping Operations and Special Political Missions, Ref 2015.14;
- United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 7 September 2016
- "Use of Force" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1st Edition, November 2009

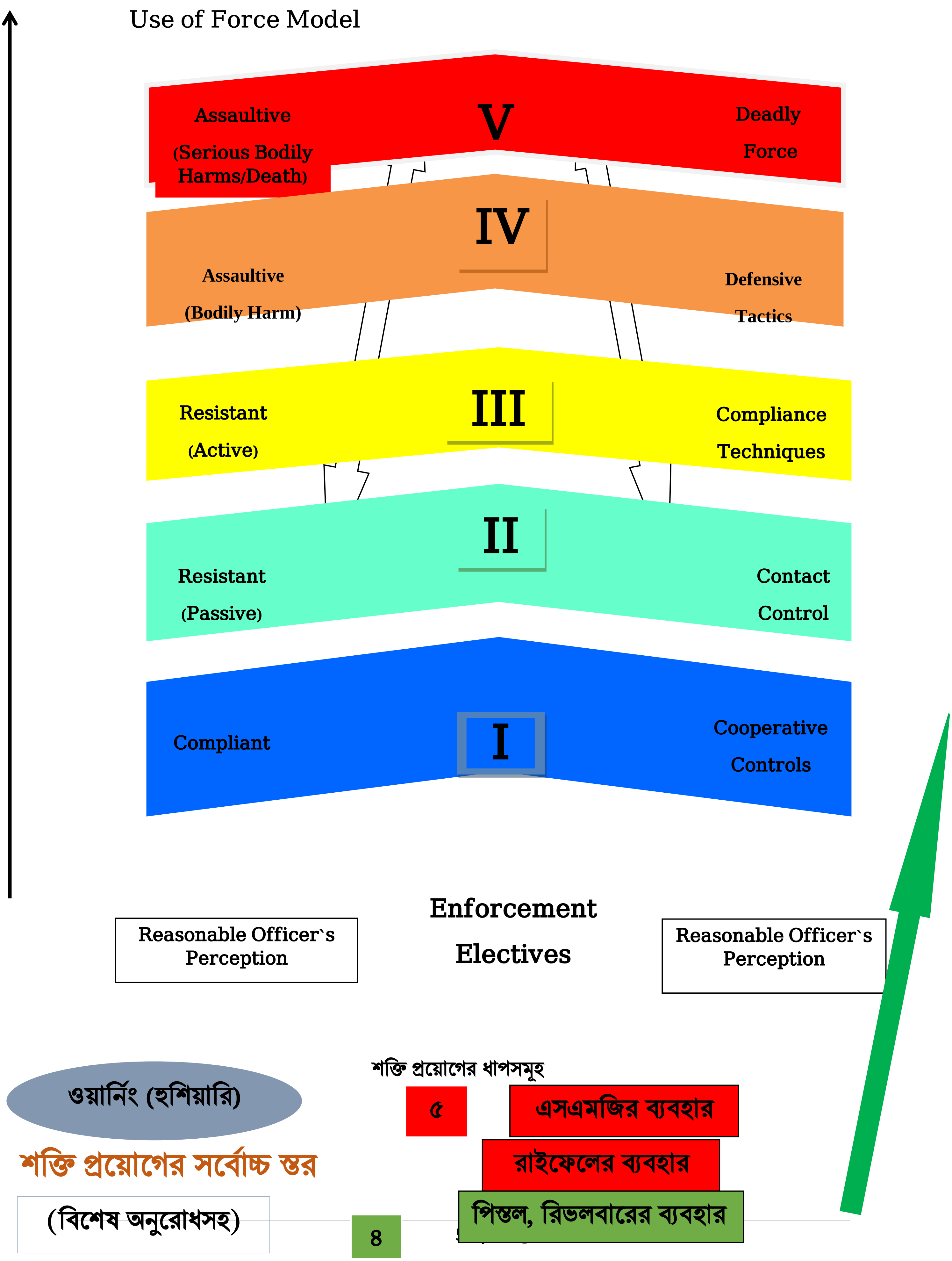
Use of Force Model
Assaultive
(Serious Bodily Harms/Death)
V
Deadly
Force
IV
Assaultive
(Bodily Harm)
Defensive
Tactics
Resistant
(Active)
III
Compliance
Techniques
II
Resistant
(Passive)
Contact
Control
Compliant
I
Cooperative
Controls
Enforcement
Electives
Reasonable Officer`s Perception
Reasonable Officer`s Perception
শক্তি প্রয়োগের ধাপসমূহ
ওয়ার্নিং (হুশিয়ারি)
৫
এসএমজির ব্যবহার
শক্তি প্রয়োগের সর্বোচ্চ স্তর
রাইফেলের ব্যবহার
(বিশেষ অনুরোধসহ)
৪
পিস্তল, রিভলবারের ব্যবহার

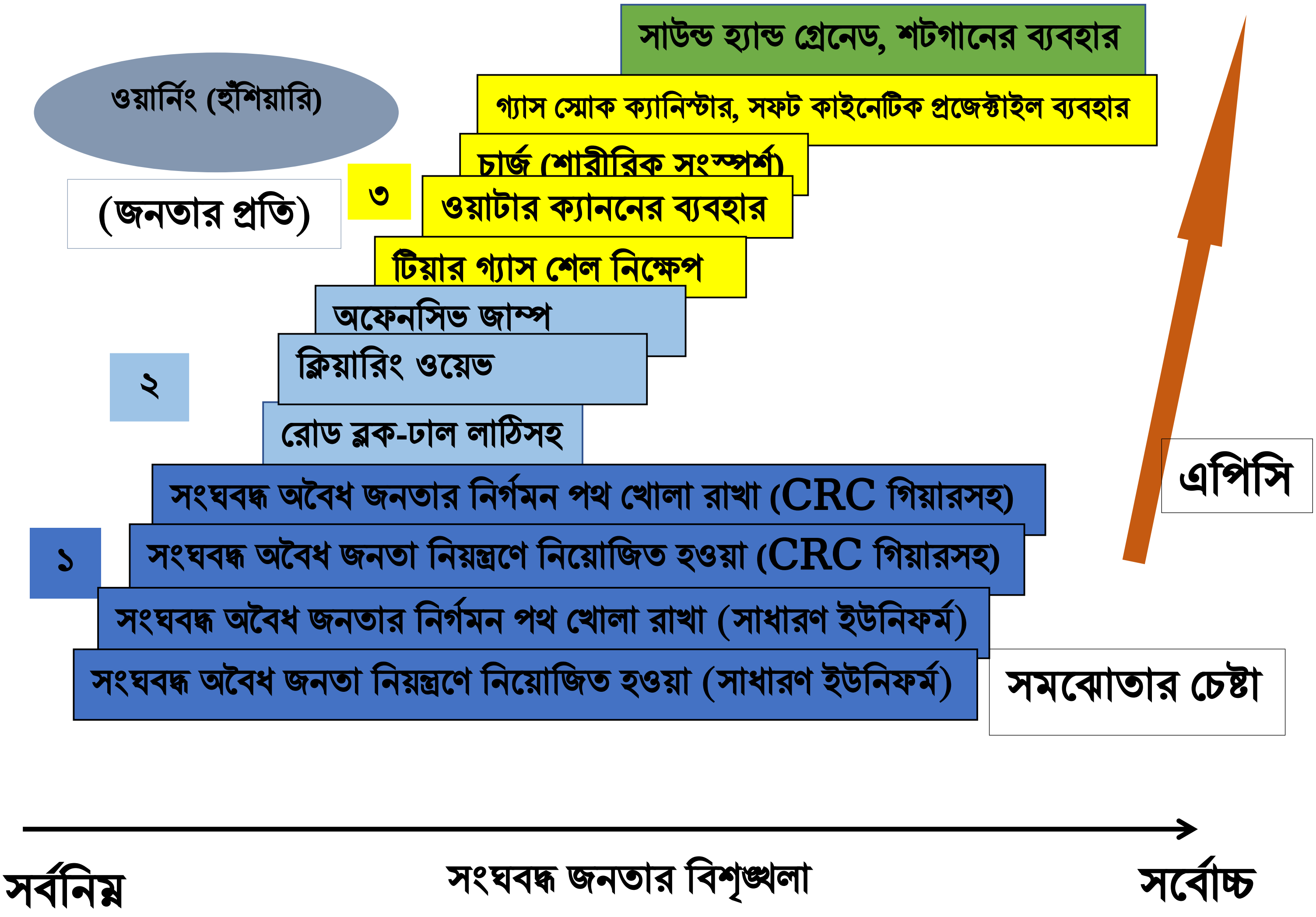

সাউন্ড হ্যান্ড গ্রেনেড, শটগানের ব্যবহার
গ্যাস স্মোক ক্যানিস্টার, সফট কাইনেটিক প্রজেক্টাইল ব্যবহার
ওয়ার্নিং (হুঁশিয়ারি)
চার্জ (শারীরিক সংস্পর্শ)
৩
ওয়াটার ক্যাননের ব্যবহার
(জনতার প্রতি)
টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ
অফেনসিভ জাম্প
ক্লিয়ারিং ওয়েভ
২
রোড ব্লক-ঢাল লাঠিসহ
এপিসি
সংঘবদ্ধ অবৈধ জনতার নির্গমন পথ খোলা রাখা (CRC গিয়ারসহ)
১
সংঘবদ্ধ অবৈধ জনতা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত হওয়া (CRC গিয়ারসহ)
সংঘবদ্ধ অবৈধ জনতার নির্গমন পথ খোলা রাখা (সাধারণ ইউনিফর্ম)
সংঘবদ্ধ অবৈধ জনতা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত হওয়া (সাধারণ ইউনিফর্ম)
সমঝোতার চেষ্টা
সর্বনিম্ন
সংঘবদ্ধ জনতার বিশৃঙ্খলা
সর্বোচ্চ

৬.৮। পুলিশে সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বিভাগীয় মামলা ব্যবস্থাপনা :

বাংলাদেশ পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড (ডিঅ্যান্ডপিএস) এর ভূমিকা

পুলিশ কেবল একটি ফোর্স নয়, বরং একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কার্যকর জবাবদিহিতার আওতায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে পুলিশের নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও ওভারসাইট মেকানিজম থাকা জরুরি, যা জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী জনসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুলিশকে তার অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সক্ষমতা দিয়ে থাকে।

একটি পেশাদার, মানবিক, কার্যকর ও দক্ষ পুলিশিং ব্যবস্থা যে কোনো স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক পুলিশি সেবা নিশ্চিতকল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে পরিগণিত। এরূপ কার্যকরী ও স্বতন্ত্র নজরদারি পদ্ধতি বা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দায়িত্বে অবহেলাসহ অন্যান্য অভিযোগ সঠিকভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি করতে পারে। এটি শুধু অভিযোগকারী ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য সুফল বয়ে আনে। একজন পুলিশ সদস্য আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে তা শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন। কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পুলিশকে জবাবদিহিতার আওতায় রাখার মাধ্যমে জনসন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যে কোনো কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হচ্ছে-

- জনসাধারণের প্রতি পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- পুলিশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার, বিশেষ করে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ রোধ করা
- অভিযোগকারীদের উদ্বেগ, অভিযোগ প্রকাশের সুযোগ দিয়ে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
- পুলিশী কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা
- অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান ও তদন্তের গুণগত মান উন্নত করা
- পুলিশ সদস্যদের এই মর্মে আশ্বস্ত করা যে, শাস্তি প্রযোজ্য তাই প্রয়োগ করা হচ্ছে অর্থাৎ শাস্তিমূলক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যকার যোগাযোগ উন্নত করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুসংহত করা
- পুলিশের দলীয়করণ ও রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল ব্যবস্থা হতে হবে এমন যা সবার জন্য উন্মুক্ত, সহজলভ্য এবং ভুক্তভোগীদের জন্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করে। বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশ সার্ভিসের ব্যাপকতা যেমন বেড়েছে, তেমনি পুলিশি সেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রত্যাশাও বেড়েছে।

পুলিশের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপের তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, পেশাদার ও জনবান্ধব পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ আগস্ট, ১৯৭৭ তারিখে 'সিকিউরিটি সেল' গঠন করা হয়। ২০১২ সালে সিকিউরিটি সেলকে 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড' নামকরণ করা হয়। এই সামগ্রিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধার্থে ০৭ মে ২০২৪ তারিখে ডিঅ্যান্ডপিএস-১ ও ডিঅ্যান্ডপিএস-২ নামে দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয় এবং তাদের পরিচালনার জন্য যথাক্রমে একজন ডিআইজি ও একজন এআইজিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিভিন্ন সূত্র থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রাপ্তির পর তা প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে মর্মে প্রতীয়মান হলে তা প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য (একক

অথবা যৌথ) বিভিন্ন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। অনুসন্ধান শেষে প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশে নথিভুক্ত করা হয় এবং প্রমাণিত হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কনস্টেবল হতে এসআই/সার্জেন্ট ও নন-পুলিশ সদস্যদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিট, ইন্সপেক্টরদের ক্ষেত্রে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-২ শাখায় (ডিএমপি'র ইন্সপেক্টর হলে ডিএমপি'তে) এবং এএসপি থেকে তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার ক্ষেত্রে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-১ তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে নিয়মানুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। জানুয়ারি/২০২৩ খ্রিঃ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত গৃহীত ৩৯৭০টি প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনের মধ্যে ৮৫৩টির ক্ষেত্রে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট বা শাখায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়, ২৪৮২টি অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় নথিভুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট ৬৩৫টি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। পুনরায় অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত এরূপ অনুরোধের শতকরা হার ছিল ১৫.৫০%। অন্যদিকে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের হার হচ্ছে ২১.৫০%।

বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত শেষে সুপারিশসহ ফলাফল (Findings) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করলে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম সম্পাদন শেষে শাস্তির চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়। তবে গেজেটেড অফিসারের ক্ষেত্রে চাকরি থেকে অপসারণ বা পদাবনতির মতো গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়ার পূর্বে পিএসসি'র পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল করতে পারেন। ইন্সপেক্টর হতে তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণের আপিল শুনানি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্য প্রয়োজনে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এটি মামলা ও মহামান্য হাইকোর্টে রিট দায়ের করতে পারেন। এটি মামলা ও রিট পিটিশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের লিগ্যাল সেল পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গ সংক্রান্ত অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রমে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮, পুলিশ রেগুলেশন্স বেঙ্গল (পিআরবি) ১৯৪৩, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (অধস্তন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০০৬, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিধিমালা ১৯৯১, Armed Police Battalions Ordinance 1979, Police Officers (Special Provisions) Ordinance 1976, Junior Police Service Rules 1969, র‍্যাব (কোর্ট পদ্ধতি ও বিভাগীয় কার্যধারা) বিধিমালা ২০০৫ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) বিধিমালা ১৯৭৯।

বিভাগীয় মামলায় পুলিশ সদস্যদের শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত এই সমস্ত বিধি-বিধানে উল্লেখিত দণ্ডের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ইন্সপেক্টর থেকে তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ইনক্রিমেন্ট স্থগিতকরণ একটি লঘুদণ্ড হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (অধস্তন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৬ মোতাবেক কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার সদস্যদের ক্ষেত্রে ইনক্রিমেন্ট স্থগিতকরণ একটি গুরুদণ্ড।

Armed Police Battalions Ordinance, 1979 অনুযায়ী কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার ক্ষেত্রে এক মাসের বেতনের অনধিক যে কোনো অর্থদণ্ড একটি গুরুদণ্ড। পক্ষান্তরে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (অধস্তন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৬ মোতাবেক কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার ক্ষেত্রে অনধিক এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা লঘুদণ্ড হিসেবে পরিগণিত। এর ফলে একই অপরাধে জড়িত ভিন্ন ইউনিটের দুজন পুলিশ সদস্য ভিন্ন ভিন্ন বিধিমালায় ভিন্ন ধরনের শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা তাদের পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

পুলিশ ও নন-পুলিশ (মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ) সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি একই ধরনের অভিযোগে বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড প্রদান করার মতো বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের

আলোকে অভিযোগের প্রকৃতি, মাত্রা (Gravity of offences) ও গুরুত্ব বিবেচনায় প্রমাণিত একই ধরনের অভিযোগে বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত বৈষম্য দূরীকরণসহ ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Equality of Treatment তথা দণ্ডারোপে সমতা নিশ্চিত করতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে Discretionary Guidelines প্রণয়নকরত ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সকল ইউনিটে প্রেরণপূর্বক শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

পুলিশের সদস্যদের শৃঙ্খলা ও প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ডিঅ্যান্ডপিএস শাখাকে নিম্নরূপ কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

পুলিশ সদস্যরা বিভিন্ন সময় হয়রানিমূলক মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে হেনস্তার শিকার হয়ে থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। অথচ দেখা যায়, তদন্তকালীন অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য বিভিন্ন রকম পদোন্নতি, পদায়নসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা (জাতিসংঘ মিশনে পদায়ন, উচ্চতর/সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি) বিষয় বিবেচনা হতে বঞ্চিত থাকে। অন্যদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা তাদের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হয়ে থাকে।

জটিল ও সময়সাপেক্ষ শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ার কারণে কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হওয়া দীর্ঘ মুলতবি থাকা প্রাথমিক অনুসন্ধান ও বিভাগীয় মামলা পুলিশ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টিসহ তাদের পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, মিশনে গমনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে থাকে। শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ায় এ সমস্ত জটিলতা নিরসনকল্পে ডিঅ্যান্ডপিএস শাখা সাম্প্রতিককালে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করছে।

পুলিশ বাহিনীর সকল পদমর্যাদার সদস্যদের বিরুদ্ধে ২০০৯ সাল থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৪৫,১৭১টি লঘুদণ্ড ও ২৩,৫৫০টি গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে ২২৬২৩টি (১৯৬৮৮ লঘুদণ্ড, ২৯৩৫ গুরুদণ্ড), ২০২১ সালে ২২১৮৬টি (১৯৫২৬ লঘুদণ্ড, ২৬৬০ গুরুদণ্ড), ২০২২ সালে ২৬১০৫টি (২২৯০৪ লঘুদণ্ড, ৩২০১ গুরুদণ্ড) এবং ২০২৩ সালে ২৪৫৩৪টি (২২০৭৩ লঘুদণ্ড, ২৪৬১ গুরুদণ্ড) শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান বছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ১৪৭৫১টি (১৩০৭৩ লঘুদণ্ড, ১৬৭৮ গুরুদণ্ড) শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

ডিঅ্যান্ডপিএস বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের আচরণ ও নৈতিক মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণ তথা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রেখে একটি সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে পুলিশকে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। প্রচলিত ধারণা মোতাবেক শৃঙ্খলা শব্দটি শাস্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বাহিনীর সাধারণ সদস্যের কাছে 'শৃঙ্খলা' বলতে কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম ও বিধিকে বোঝায়। অধিকাংশ পুলিশ সদস্যের ধারণা শাস্তির উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভবিষ্যৎ খারাপ আচরণকে নিরুৎসাহিত করা এবং অন্যদের একই ধরনের বার্তা দেওয়া। কিন্তু প্রমাণিত অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্তদের ওপর আরোপিত শাস্তির দ্বারা আচরণগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিকল্প কোনো পন্থা অবলম্বনের সুযোগ থাকাও প্রয়োজন। অসদাচরণের জন্য শাস্তি অবশ্যই প্রযোজ্য। এটি আচরণগত পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে, কিন্তু এটি ক্ষোভও তৈরি করে। অনেক সময় সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে অন্যায়ের যে অনুভূতি থাকে, তা ক্রোধ বা ক্ষোভে পরিণত হয়। একজন ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা কোনো সংস্থার জন্যই কাম্য হতে পারে না। কাজেই এসব বিষয় অনুধাবন করত সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি পরিচালনায় সৎ, দক্ষ ও সুশৃঙ্খল ফোর্স গঠনে প্রয়োজনীয় নৈতিকতা, সদাচরণ, মানবিকতা, মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান contradictions resolve করে তা আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

- সদস্যদের আচরণগত শৃঙ্খলার পরিবর্তন আনতে মানবাধিকারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রাখা;
- পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা বা মীমাংসার ব্যবস্থা থাকা;
- আইজিপি'স কমপ্লেইন মনিটরিং সেলের ন্যায় রেঞ্জ, মেট্রোপলিটন, পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং অন্যান্য সকল ইউনিটে কমপ্লেইন সেল গঠন করা এবং বছরের দুবার সেলের কার্যক্রমের প্রতিবেদন অনলাইন প্রকাশ করতে হবে;

- শৃঙ্খলার প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে বাহিনীর সদস্য ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ভুল ধারণা বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য নিয়মিত ফলাফল অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা;
- অভিযোগের তদন্তে স্বচ্ছতা এবং ন্যায়ের নিশ্চয়তা বিধান করা, যাতে বাহিনীর সদস্য এবং জনসাধারণ উভয়ই সন্তুষ্ট থাকেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাসের একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য অভিযোগকারীর পক্ষে একজনকে তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা যায়;
- নতুন আইন, বিধি ও নিয়মাবলির পরিবর্তন সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- পুলিশ সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বা অভ্যাসগত অপরাধকারীদের আইনানুযায়ী অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাহিনীর সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিক স্বাস্থ্য ইউনিট গঠন;
- বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে কাজ করার সময় যাতে তাদের সংস্কৃতি, আচরণ ও মূল্যবোধের পার্থক্য অনুধাবন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় সেই লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভিযোগের প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং বিভাগীয় মামলা তদন্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয়টি বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা;
- মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনানুযায়ী পুলিশ বিভাগে একটি Harrasement Disposal Committee থাকতে হবে।
- পিআইএমএস ডাটাবেজের সঙ্গে Dedicated Link তৈরি করে পুলিশ সদস্য ও মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফদের Service Records সহ পুরস্কার, শাস্তি এবং ফৌজদারি মামলার তথ্যাদি আপলোড এবং আপডেট করা। উল্লেখ্য, এ লক্ষ্যে Next Generation Personal Information Management System (NGPIMS) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একটি নিয়মিত বিরতিতে এ তথ্যগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ব্যক্তির অপরাধের দায় ডিপার্টমেন্ট বহন করবে না- এই প্রত্যয়ে একটি দক্ষ, মানবিক ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ সার্ভিস গঠনে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন করা;
- কোনো পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা কঠোরভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬.৯। বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তাবিত সংস্কার ও পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে Key Performance Indicators (KPIs)-এর ভূমিকা:

বাংলাদেশ পুলিশের পেশাগত উৎকর্ষতা এবং সেবার মান উন্নয়নে কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটরস (KPIs)-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। KPIs-এর মাধ্যমে পুলিশের কর্মক্ষমতা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা যায় এবং এর ফলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন দেশে যেমন যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত পুলিশ বাহিনীতে KPIs ব্যবহারের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পুলিশ সংস্কারে একটি কার্যকরী মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

<u>KPIs-এর মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা:</u>

KPIs-এর মাধ্যমে পুলিশের অপরাধ দমন, তদন্ত দক্ষতা, জনসেবা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা যায়। এটি পুলিশের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি বাহিনীর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। KPIs-এর সঠিক প্রয়োগ বাহিনীর ভেতরে পেশাদারিত্ব এবং জনসেবার মান আরও উন্নত করবে। এছাড়া, KPIs-এর মাধ্যমে বাহিনীর অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব বাড়ানো সম্ভব।

<u>KPIs-এর আন্তর্জাতিক উদাহরণ:-</u>

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনী KPIs ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ দমন, সেবা মান উন্নয়ন এবং জনসেবায় সাফল্য অর্জন করেছে। নিচে কয়েকটি দেশের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

১. যুক্তরাজ্য: পারফরম্যান্স মূল্যায়ন এবং আস্থা বৃদ্ধি:

যুক্তরাজ্যে পুলিশের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য "Best Value Performance Indicators" (BVPIs) এবং "Police Performance Assessment Framework" (PPAF) ব্যবহৃত হয়। এই মডেলগুলোর মাধ্যমে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কাজের গুণগত মান নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া, যুক্তরাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে "CompStat" পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যা অপরাধ পরিসংখ্যান এবং কৌশলগত ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে পুলিশের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে। এই মডেলগুলোর মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস এবং পুলিশের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা হয়, যা বাংলাদেশে প্রয়োগ করা হলে অপরাধ দমন এবং সেবার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

২. কানাডা: জনসেবার মান উন্নয়ন এবং জরুরি সেবা প্রতিক্রিয়া:

কানাডার ক্যালগারি পুলিশ কমিশন KPIs ব্যবহার করে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে পুলিশের সেবার গুণগত মান এবং কার্যক্ষমতা পরিমাপ করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যালগারি পুলিশ ২০২৩ সালে তাদের জরুরি সেবার প্রতিক্রিয়া সময় ৮ মিনিটের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া, জনগণের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থা ও নিরাপত্তা বোধ বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৪ সালের মধ্যে ৯০% নাগরিকের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থা অর্জনের জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশে এ ধরনের সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হলে, জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং পুলিশের প্রতি জনসমর্থন আরও বাড়বে।

৩. অস্ট্রেলিয়া: প্রো-অ্যাকটিভ পুলিশিং এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

অস্ট্রেলিয়ার পুলিশিং মডেলে "Proactive Policing" বা সক্রিয় অপরাধ প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হয়। KPIs-এর মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধ সমাধানের দক্ষতা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের প্রো-অ্যাকটিভ পদক্ষেপের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস এবং সমাজে নিরাপত্তা বোধ বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা হয়। এছাড়া, পুলিশ সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চালু করা গুরুত্বপূর্ণ।

<u>KPIs-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাগত উৎকর্ষতার লক্ষ্য</u>:

KPIs ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের কর্মক্ষমতা এবং পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য কিছু মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে:

১. অপরাধ দমন এবং প্রতিরোধ নিশ্চিত করা:

KPIs-এর মাধ্যমে পুলিশের অপরাধ দমন এবং প্রতিরোধের দক্ষতা বাড়ানো হবে। অপরাধের গুরুত্ব সূচক এবং অপরাধ সমাধানের হার নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা এবং কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে।

২. জনসেবার মান উন্নয়ন এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি:

KPIs-এর মাধ্যমে জনগণের কাছে পুলিশের সেবার মান উন্নত করা হবে। জরুরি সেবার প্রতিক্রিয়া সময় হ্রাস করা এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা হবে। এ ক্ষেত্রে, জরুরি কলের প্রতিক্রিয়া সময়, জনমতের ভিত্তিতে পুলিশের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩. পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

KPIs ব্যবহার করে পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকগুলো পর্যালোচনা করা হবে। সদস্যদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা এবং তাদের মানসিক চাপ কমানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৪. প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা:

KPIs ব্যবহারের মাধ্যমে পুলিশের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে, বাজেট পরিকল্পনা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

KPIs বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:

KPIs বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মোকাবিলা করা প্রয়োজন:

১. তথ্য বিকৃতির ঝুঁকি

KPIs বাস্তবায়নের সময় অপরাধ সংখ্যা হ্রাসের জন্য তথ্য বিকৃতির ঝুঁকি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে, তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

২. অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির প্রভাব

KPIs বাস্তবায়নের সময় পুলিশ সদস্যদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে, যা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনার প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি জোর দিতে হবে।

৩. নিয়মিত পর্যালোচনা এবং আপডেট

KPIs ব্যবহারে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলো হলো নিয়মিতভাবে মাপকাঠির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে সেগুলো আপডেট করা। বাহিনীর কর্মক্ষমতা এবং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার জন্য নিয়মিত এই মাপকাঠিগুলো আপডেট করতে হবে।

KPIs ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাগত উৎকর্ষতা এবং সেবা মান উন্নয়ন সম্ভব। আন্তর্জাতিক উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রাসঙ্গিক মাপকাঠি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ এবং আধুনিক পুলিশ বাহিনী গঠন করা সম্ভব হবে। KPIs ব্যবহারে পুলিশের কার্যক্রমের গুণগত মান এবং জনসেবার প্রতি আস্থা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে কার্যকর হবে।

৬.১০। বাংলাদেশ পুলিশের দুর্নীতি: বিস্তার, প্রকার ও প্রতিকার:

বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি বহুমুখী, সর্বব্যাপী গভীর সমস্যা। রাষ্ট্রের অন্যান্য অংশের ন্যায় পুলিশেও দুর্নীতিতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। যার আদর্শিক মর্মবাণী কালের পরিক্রমায় তা আজ দুঃখজনকভাবে বিপ্রতীপ অবস্থান গ্রহণ করেছে। সমাজে ন্যায়বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথে পুলিশের দুর্নীতি এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) এর বিগত এক দশকের রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন হিসেবে পুলিশ তার প্রথম অবস্থান অব্যাহতভাবে আঁকড়ে রেখেছে। সংস্থাটির ২০২২ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে ৭৪.৪ শতাংশ নাগরিক দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। সংস্থাটির মতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় গ্রেপ্তার সংক্রান্তে (৯২.৮%), ট্রাফিক সংক্রান্ত (৯০.৬%), পাসপোর্ট/পুলিশ ভেরিফিকেশন (৮৪.৪%), এফআইআর/মামলা সংক্রান্ত (৮০%), জিডি বা সাধারণ ডায়েরি (৫৮.৭%), তদন্ত সংক্রান্ত (৫৫.৮%)। উল্লিখিত খাতগুলো পুলিশের দৈনন্দিন নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডভুক্ত। কিন্তু পুলিশের সরাসরি আওতাভুক্ত নয় এমন ক্ষেত্রেও তাদের দুর্নীতির ব্যাপকতা

উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত “কেমন পুলিশ চাই” জনমত জরিপে ৮৪% উত্তরদাতা দুর্নীতিমুক্ত পুলিশের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

পুলিশের দুর্নীতির প্রকারভেদ:

বাংলাদেশের পুলিশের দুর্নীতিকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। প্রধান কয়েকটি ক্ষেত্র নিচে চিহ্নিত করা হলো:

ক. নিজস্ব প্রতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডভুক্ত:

- **ঘুষ গ্রহণ ও আর্থিক দুর্নীতি:** এটি পুলিশের সবচেয়ে প্রচলিত ও দৃশ্যমান দুর্নীতির ধরন। সাধারণত থানায় জিডি গ্রহণ থেকে শুরু করে এফ আই আর রুজ্জু, গ্রেপ্তার বানিজ্য, অভিযোগপত্র দায়ের, মামলায় হাজিরা থেকে শুরু করে নিম্ন আদালতে বিচারিক মামলায় হাজিরাসহ মামলা নিষ্পত্তির বিভিন্ন পর্যায়ে পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়।

- **রিমান্ডে আসামি নির্যাতন:** অভিযুক্ত আসামি বা আটককৃত ব্যক্তিকে রিমান্ডে এনে নির্যাতনের ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় পুলিশের জন্য এক অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়শই শোনা যায়, আটককৃত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় লাখ টাকার কয়েকগুণ অর্থ জোরপূর্বক আদায় করা হয়। থানা পর্যায়ে এটা নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য।

- **নিয়োগ ও বদলী বাণিজ্য:** পুলিশ পুলিশের কাছ থেকে ঘুষ নেয় এটা জানতে হলে পুলিশের নিয়োগ ও বদলি নিয়ে রমরমা বাণিজ্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বিগত দুই দশক ধরে পুলিশে নিয়োগ নিয়ে যে টাকা-পয়সার বাণিজ্য চলেছে তার কোনো রাখঢাক ছিল না। কনস্টেবল নিয়োগে ১০ লাখ টাকা বা ততোধিক ঘুষ নেওয়ার কথা শোনা যায়। সাধারণত: পুলিশে বড় নিয়োগ হয় কনস্টেবল ও এসআই নিয়োগের ক্ষেত্রে। বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে পুলিশের নিয়োগ বাণিজ্য লাগামহীন হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে এক্ষেত্রে উত্তোলিত অর্থ থানার ওসি থেকে বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ পর্যন্ত ভাগবাটোয়ারা হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন সুবিধাজনক পদ পদায়নে বদলি বাণিজ্যে দুর্নীতির লেলিহান শিখায় ঘি ঢালা হয়। ঘুষ দিয়ে নিয়োগ পদায়ন ও বদলি হয়ে ওই টাকা আবার ঘুষ গ্রহণ করেই পুষিয়ে নেন পদায়নকৃত কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ। এভাবেই দুর্নীতির চাকা প্রবহমান থাকে। এজন্য দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ দিয়ে অন্যায় অনাচার যেমন মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বন্ধ করা যাচ্ছে না। (অনলাইন ভোরের কাগজ, “পুলিশের দুর্নীতি ও আত্মোপলব্ধি” ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৮)

- **ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে:** ভুঁয়া/গায়েবি মামলায় গ্রেপ্তার বা ফাঁসানোর ভয়ভীতি দেখিয়ে সম্প্রতি ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে পুলিশ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ আদায়ে বেপোরোয়া হয়ে উঠে পুলিশ সদস্যরা। পুলিশ কমিশন কর্তৃক পরিচালিত “(কেমন পুলিশ চাই)” জনমত জরিপে এ বিষয়ে ৯৫% উত্তরদাতা এ অপসংস্কৃতির অবসান চেয়েছে।

- **ট্রাফিক পুলিশের দুর্নীতি:** রাস্তা, সড়ক, মহাসড়কে প্রায়শই ট্রাফিক আইনের ব্যত্যয় ঘটানোর কারণে রিকশা, বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক, ড্রাইভারের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের বচসা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বে এ খাতে পুলিশের দুর্নীতি হয় ৯০.৬% মর্মে ২০২২ সালের টিআইবি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। গরিব রিকশাওয়ালারা সবচেয়ে বেশি আর্থিক ও শারীরিক নির্যাতিত হন এই ট্রাফিক পুলিশের হাতে।

(খ) নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত দুর্নীতি:

বলা হয়ে থাকে, ‘আকাশে যত তারা, পুলিশের তত ধারা’। অর্থাৎ পুলিশ এতই ক্ষমতাবান যে কাউকে ফাঁসাতে চাইলে বা বাগে আনতে চাইলে তার হাতে কৌশল বা অস্ত্রের অভাব নেই। অধিকাংশ আইনে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাই বৈধ বা অবৈধ যেকোনোভাবে অর্থ আদায়ে যে পারঙ্গম। নিচে এ ধরনের কিছু দুর্নীতির প্রকার তুলে ধরা হলো:

- **চাঁদাবাজি:** সড়কে মহাসড়কে পুলিশের চাঁদাবাজি একটি দৃশ্যমান দুর্নীতি। পরিবহনখাতে এই চাঁদাবাজি রীতিমতো ছাপানো স্লিপ বা কাগজ দিয়ে উঠানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হতে 'মান্থলি' বা মাসিক চাঁদা আদায়, বৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে অর্থ আদায় অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।
- **ফুটপাথ ব্যবসা বা ইনফরমাল সেক্টর:** বিশেষত ঢাকা-চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় ফুটপাত দখল করে অবৈধ অস্থায়ী দোকানপাট বসিয়ে ব্যবসা করা একটি অতিপরিচিত অর্থনৈতিক খাত। ক্ষুদ্র প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা স্বল্পপুঁজিতে কোনোরূপ লাইসেন্স ছাড়া আর্থিক নিয়মনীতি প্রতিপালন না করেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। পুলিশ এখানে দৈনিক ঝুপড়ি/দোকান প্রতি ভাড়া আদায় করে থাকে। শোনা যায় দৈনিক প্রায় কয়েক কোটি টাকা আদায় হয়। বাংলাদেশ হকার্স ফেডারেশনের মতে, বছরে এই চাঁদার পরিমাণ প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা, যা দৈনিক ৮ কোটি টাকা দাঁড়ায়। চাঁদার পরিমাণ এলাকা, ব্যবসার ধরনের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণত দৈনিক টঙ/ঝুপড়ি/দোকান প্রতি ৮০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত আদায় হয়। এ চাঁদাবাজিতে পুলিশের সঙ্গে সহযোগী থাকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় লোকজন ও সিটি করপোরেশনের কর্মচারীরা।
- **অপরাধীদের সঙ্গে দুষ্ট আঁতাতের মাধ্যমে অর্থ আদায়:** অভিযোগ রয়েছে পুলিশ সদস্যদের একাংশ অপরাধীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের কার্যক্রমে সাহায্য করে থাকে। বিনিময়ে পুলিশ তাদের কাছ থেকে বড় অংকের অর্থ নিয়ে থাকে। অবৈধ মাদক ব্যবসা, মানব পাচার এমনকি অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে পুলিশের কিছু অংশের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রায়শই উঠে থাকে।
- **অবৈধ আদায় ও মুক্তিপণ আদায়:** সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে কাউকে টার্গেট করে আটক করা হয় এবং তাকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ক্রসফায়ার এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলপূর্বক গুমের ঘটনা বৃদ্ধির সঙ্গে এ ধরনের অর্থ আদায় জনসপক্ষে পরিচিত হয়ে ওঠে। অবৈধ গৃহতল্লাশীতে পুলিশের লোক পরিচয়ে যায় এবং আটক ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন পর মুক্তিপণ আদায় করে দূরবর্তী স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রকাশ করলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীরা তাই ফিরে এলেও এ নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না। অভিযোগ রয়েছে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে পুলিশবাহিনী ছাড়াও অন্যান্য গোয়েন্দা বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে।

দুর্নীতির প্রতিকার: পুলিশের ঘুষ গ্রহণের অপবাদ বহু পুরোনো হলেও বিগত কয়েক দশকে তা এতই নিয়ন্ত্রণহীন আর ভয়াবহ চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে তাকে প্রতিরোধ করা নিদেনপক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের মতে পুলিশের দুর্নীতির অপ্রতিরোধ্য গতির অন্যতম কারণ পুলিশের জবাবদিহিতার অভাব। পুলিশ কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের দেশে পুলিশকে হাতে রেখে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চায় তাই পুলিশের দুর্নীতিরোধে তারা অপারগ। অন্যদিকে যেহেতু পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও নিজেরাই দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে মর্মে অভিযোগ রয়েছে, তাই পুলিশ হয়ে উঠেছে "দুর্বিনীত"। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মূলত পুলিশ কারও নিয়ন্ত্রণে নেই।

সুপারিশ: সার্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিম্নোক্ত দুটি সুপারিশ পেশ করা হলো:

১। "সর্বদলীয় কমিটি" গঠন:
পুলিশের কাজকর্মে ইচ্ছাকৃত ব্যত্যয় বা পেশাদারি দুর্নীতি রোধে স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে 'ওয়াচডগ বা ওভারসাইট বডি' গঠন করা যায়। প্রতিটি থানা/উপজেলায় একটি 'সর্বদলীয় কমিটি' গড়ে তোলা যায়, যারা স্থানীয় পর্যায়ে 'ওভারসাইট বডি' হিসেবে কাজ করবে এবং দুর্নীতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন
পুলিশের দুর্নীতি হঠাৎ উঠে যাবে না। একে ধীরে ধীরে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। এজন্য চাই প্রবল নাগরিক আকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। প্রভেদযোগ্য আইনি কাঠামোর জন্য একই অপরাধে একজন কনস্টেবলকে যত সহজে চাকরিচ্যুত করা যাচ্ছে, সেভাবে একজন কর্মকর্তাকে গুরুদন্ড দেওয়া যাচ্ছে না। দুর্নীতি একটি সামাজিক

ব্যাধি। অন্যান্য সংস্থার দুর্নীতির প্রভাব সমাজের জন্য যত ক্ষতিকর তার চেয়ে পুলিশের দুর্নীতি দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ দুর্যোগ নিয়ে আসে। পুলিশের দুর্নীতির কারণে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেইসঙ্গে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই পুলিশের দুর্নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা সুপারিশ করা যায়।

উপরোল্লিখিত সুপারিশ চলমান অবস্থায় একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে এবং উক্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যাবতীয় বিষয় ধর্তব্যে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এই টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা যায়।

বাংলাদেশ পুলিশে অনিয়ম-দুর্নীতির সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থার সুপারিশ প্রণয়ন:

ক) নিয়োগ: বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে সরাসরি নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ পাওয়া যায়।

করণীয়:

- নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সততা ও নৈতিকতার উচ্চমান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।
- প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ইত্যাদি উচ্চ পর্যায়ের একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- যে কোনো ধরনের অনিয়ম/ব্যত্যয় তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় আনতে হবে।

খ) পদায়ন/বদলি/পদোন্নতি: পদায়ন/বদলির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতিসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও রোধকল্পে নিম্নলিখিত করণীয় অনুসরণ করা যেতে পারে।

করণীয়:

- পদায়ন/বদলির একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ণ করা জরুরি।
- পদায়ন/বদলির ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে।
- পুলিশ হেডকোয়ার্টার, রেঞ্জ কার্যালয়, জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মেট্রোপলিটন এলাকা এবং অন্যান্য ইউনিটে বদলির ক্ষেত্রে দক্ষতার এবং সততার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।
- পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ্বে পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে আইজিপির সুপারিশ বিবেচনা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- কনস্টেবল থেকে পুলিশ পরিদর্শক পর্যন্ত বিভাগীয় পদোন্নতি কেন্দ্রীয়ভাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে একটি পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি (ডিপিসি)-তে আইজিপির প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) সভায় পুলিশের এজেন্ডা থাকলে উক্ত সভায় আইজিপিকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

গ) গ্রেপ্তার: পুলিশের গ্রেপ্তার বা অবৈধ আটক নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্নীতির খোলামেলা অভিযোগ পাওয়া যায়। বিশেষত ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা ও সাম্প্রতিক অপসংস্কৃতি হিসেবে চালু হওয়া ভুয়া/গায়েবি মামলা আটক ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের দুর্নীতি হয়ে থাকে যা গ্রেপ্তার বাণিজ্য হিসেবে নিন্দিত।

করণীয়:

- থানায় মামলা রুজু তথা এফআইআর গ্রহণ ও তদন্ত কঠোরভাবে সার্কেল অফিসার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক নিয়মিত তদারকি জারি রাখতে হবে।

- কেইস ডায়েরি আদালতে দাখিল করে আদালতের আদেশ ব্যতীত কোনোক্রমে এফআইআর বর্হিভূত আসামি গ্রেপ্তার করা যাবে না।
- ভুয়া/গায়েবি মামলায় অনিবাসী/মৃত/নিরাপরাধ নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য করতে হবে।
- থানার কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কাউকে আটক করে ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায়ের অপবাদ/অভিযোগ পুলিশ সুপার কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে তদন্তের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত: বাংলাদেশ পুলিশের যেকোন ধরনের ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়সমুহ, ক্ষেত্রমত, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, মেট্রোপলিটন কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপারসহ স্ব-স্ব ইউনিট প্রধানগণ সরকারি আইন ও নীতিমালার (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮) আলোকে সম্পন্ন করে থাকেন। এরূপ ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি/অনিয়মের সুযোগ রয়েছে।

করণীয়:

- প্রতিটি থানায় বিবিধ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন যেমন: লাশ পরিবহন, সাক্ষী আনা-নেওয়া, বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি।
- পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অডিট ও ইন্সপেকশন শাখার মাধ্যমে অধীনস্থ ইউনিটসমূহের ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়াদির পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ রুটিনভিত্তিতে সম্পন্ন করা।
- একই সঙ্গে দৈবচয়ন/ আকস্মিক পরিদর্শন বা অডিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ) ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা

করণীয়:

- মামলা প্রদানের ক্ষেত্রে বডিওর্ন (body-worn) ক্যামেরাসহ উন্নত প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা যেতে পারে।
- মামলা দায়ের, রেকার বিল চার্জ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ।
- রাস্তায় যানবাহনে নিয়মিত চেকিং বা চেকপোস্টের মাধ্যমে চেকিংয়ের ক্ষেত্রে বডিওর্ন (body-worn) ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার সন্নিবেশন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

চ) থানাকেন্দ্রিক অনিয়মের ক্ষেত্রসমূহ: থানায় সাধারণত মামলা রুজু, মামলা তদন্ত, পুলিশ রিপোর্ট দাখিল, জিডি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রদান, ওয়ারেন্ট তামিলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়নের ক্ষেত্র রয়েছে। উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে পুলিশ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলে সেবা প্রত্যাশীগণ আশানুরূপ সেবা পাবেন। ফলশ্রুতিতে পুলিশের ভাবমূর্তি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

করণীয়:

- থানায় জিডি গ্রহণ বাধ্যতামূলক, কোনোক্রমেই জিডি গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না;
- মামলার এফআইআর গ্রহণে কোনোরূপ অনীহা/বিলম্ব/অপারগতা প্রকাশ করা যাবে না;
- থানায় কাঁচের ঘেরাটোপ দেওয়া আদালা স্বচ্ছ জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ (ইন্টারোগেশন সেল) দ্রুত চালু করা যেতে পারে।
- মহিলা আসামি/ভিক্টিমকে শালীনতার সঙ্গে মহিলা পুলিশের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।
- থানায় বাদী/বিবাদীদের নিয়ে কোন ধরণের মধ্যস্থাতা, Arbitration বা Alternate Dispute Resolution (ADR) এর জন্য বৈঠক বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।
- মামলার তদন্ত ব্যয় বৃদ্ধিসহ জিডি, ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য প্রতি থানায় বিশেষ বরাদ্দ ও ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- থানায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ ও মেরামতের নিয়মিত ব্যাবস্থা করা উচিত। এজন্য প্রতি থানায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে।
- পুলিশের টহল ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য টিওএন্ডইভুক্ত প্রয়োজনীয় গাড়ি এবং জ্বালানি সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ফৌজদারি মামলার তদন্তের জন্য একটি বিশেষায়িত দল গঠন করতে হবে যারা তদন্ত সংক্রান্ত ইউনিট ও থানা ব্যতিত অন্যত্র বদলি করা যাবে না। ভবিষ্যতে মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের অধীনে পরিচালিত হবে এবং তারা ফৌজদারি মামলা প্রসিকিউশনভুক্ত একটি বিশেষ তদন্ত দল হবে।

৬.১১ সাইবার ক্রাইম, ইকোনমিক ক্রাইম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম

বর্তমানে অধিকাংশ অপরাধের সঙ্গে অবৈধ আর্থিক লেনদেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধীদের অবৈধ অর্থ-সম্পদ আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ‘মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’ একটি সন্তোষজনক ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা নয়। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে মাদক, জঙ্গিবাদ, চাঁদাবাজ, সাইবার ক্রাইম, ক্রিপ্টোকারেন্সি, অনলাইন গ্যাম্বলিং, হুন্ডি-হাওলা, ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং সংগঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট সংস্কারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হলো:

১। বিশেষায়িত ইউনিট হিসেবে সিআইডির অধীনে শক্তিশালী এন্টিমানিলন্ডারিং ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।

২। বিভিন্ন সংস্থা হতে আর্থিক বা গোয়েন্দা প্রতিবেদন এবং চাহিত তথ্যাদি (যেমন: ব্যাংক স্টেটমেন্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/বিআরটিএ/এসইসি/আরজেএসসি/এনবিআর/সাব-রেজিস্ট্রার ইত্যাদি অফিস) প্রাপ্তির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৩। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ সম্পদ সনাক্তকরণ ও দেশে ফেরত আনার লক্ষ্যে যেসব দেশে (যেমন: সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দুবাই, ইউকে, ইউএসএ, কানাডা, থাইল্যান্ড, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, সুইজারল্যান্ড, ইত্যাদি) অর্থপাচারের ঘটনা বেশি ঘটছে সেসব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে, সেসব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তে অভিজ্ঞ সিআইডি কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা যেতে পারে।

৪। মানিলন্ডারিং অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থায় (যেমন: বিএফআইইউ, এনবিআর, কাস্টমস, দুদক, বিএসইসি ইত্যাদি) বাংলাদেশ পুলিশ থেকে একাধিক কর্মকর্তাকে তদন্তে প্রেরণ করা যেতে পারে।

৫। মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিজ্ঞ আদালতে মামলা পরিচালনার নিমিত্ত প্রতিযোগিতামূলক বাচাইয়ের মাধ্যমে মনোনীত অভিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সম্পৃক্ত অপরাধ হিসেবে ‘অনলাইন জুয়া’ এবং ‘ভার্চুয়াল কারেন্সি সংক্রান্ত অপরাধ’ সমূহকে অন্তর্ভূক্ত করতঃ সিআইডিকে অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে।

৭। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও মানিলন্ডারিং বিধিমালা, ২০১৯ এ অনুসন্ধান ও তদন্তকালে পত্র প্রেরণ, অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিদের হাজির করণ, জব্দকরণ, ক্রোক ও বাজেয়াপ্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ যে সকল ধারা সমূহে বর্ণিত হয়েছে সেসব ধারাসমূহে তদন্ত-এর স্থলে ‘অনুসন্ধান ও তদন্ত’ শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা।

৬.১২। সাইবার ক্রাইম, ইকোনমিক ক্রাইম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম মোকাবিলায় দক্ষ প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি এবং আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক

সাইবার ক্রাইম মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার প্রস্তাবনা

১। সাইবার ক্রাইম মোকাবিলায় ইন্টারপোল ও ISO এর স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা।

২। বিভাগীয় শহরে সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা।

৩। অনলাইন জুয়া ও ডিজিটাল হুন্ডি নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৪। Dark Web, Deep Web, Crypto Currency, Block Chain ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫। অত্যধিক তাপ, চাপ বা Electro Magnetic Field এর প্রভাবে অনেক সময় সাইবার আলামত ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আলামত সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ মালখানা স্থাপন করা।

৬। বিভিন্ন মামলা বা অনুসন্ধানের ডিজিটাল আলামতসমূহ দেশে সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

৭। দেশব্যাপী তদন্ত, অনুসন্ধান ও আলামত দ্রুততম সময়ের মধ্যে জব্দ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত ও স্বীকৃত (সনদধারী) জনবল, যানবাহন ও অর্থ বরাদ্দ রাখা যায়।

ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার প্রস্তাবনা

১। বর্তমানে হাইটেক এবং গ্লোবালাইজেশনের যুগে অপরাধের ধরন পাল্টানোয় অনলাইনকেন্দ্রিক এবং মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম তদন্তে দরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও স্বীকৃত জনবল এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট।

২। ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইমসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট দেশে কেবল সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের কর্মকর্তাদের গমনাগমন ও সরাসরি যোগাযোগের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারি আদেশ ও বাজেট বরাদ্দের ব্যাবস্থা করা প্রয়োজন।

৩। বিএফআইইউ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত ১০টি দেশের (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইউএই, ইউকে, ইউএসএ, কানাডা, থাইল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, হংকং ও সুইজারল্যান্ড) সঙ্গে দ্রুততম সময়ে চুক্তি স্বাক্ষর করে তথ্য আদান-প্রদান করা প্রয়োজন।

এছাড়া, ফিনানশিয়াল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম মোকাবিলায় উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংস্কারের সুপারিশ করা হলো

১। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত ও স্বীকৃত জনবল নিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা।

২। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কাজের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষকদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। যেসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নাই সেসকল প্রতিষ্ঠানে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার পদ সৃজন করা।

৬.১৩। চাকরিপ্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন

বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিপ্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়ে থাকে। পুলিশ ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে চাকরিপ্রার্থীগণ অহেতুক বিড়ম্বনার স্বীকার হন। এছাড়া স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অনেক চাকরিপ্রার্থী চাকরির উপযুক্ততা প্রমাণে জটিলতার সম্মুখীন হয়। এছাড়া পুলিশ কর্তৃক চাকরিপ্রার্থী অধ্যায়নকৃত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করাও দীর্ঘসূত্রিতার একটি অন্যতম কারণ এবং পুলিশের জন্য সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। চাকরিপ্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আরও সহজতর করার লক্ষে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা বিবেচনা করা যেতে পারে-

১। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ধারী চাকরিপ্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানা অনুসন্ধানের বাধ্যবাধকতা রহিত করা যেতে পারে।

২। চাকরি প্রার্থির বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা/শিক্ষা সনদপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করার দায়-দায়িত্ব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। এগুলো পুলিশ ভেরিফিকেশনের অংশ হবে না।

৩। পুলিশ ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ যাচাই-বাচাই এর প্রয়োজনীয়তা রহিত করাসহ এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংস্কার করা যেতে পারে। তবে চাকরিপ্রার্থী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা, তা ভেরিফিকেশন রিপোর্টে প্রতিফলিত হবে।

৪। চাকরির জন্য সকল পুলিশ ভেরিফিকেশন সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে এবং অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬.১৪। প্রতিষ্ঠানিক বিষয়াদি: লোকবল, সাজ-সরঞ্জাম, অবকাঠামো, যানবাহন, অস্ত্র-গোলাবারুদ

বাংলাদেশ পুলিশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে গৌরবোজ্জল অতীত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক হানাদারদের নির্মম হামলার শিকার হয়েছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স। দেশের যে কোনো সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশ কখনও অর্পিত দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠাবোধ করেনি। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকালীন ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের সহিংসতায় প্রায় ২০০০ নিহত এবং ২০০০০ আহত হয়েছে মর্মে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিবেদনে জানা যায়। অন্যদিকে সংঘর্ষে পুলিশেরও অনেক সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে পুলিশের প্রতি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের পরবর্তীতে দেশের সার্বিক অবস্থার অবনতি এবং পুলিশের মধ্যে এক ধরনের বঞ্চণা ও হতাশার সৃষ্টি হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশকে জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ পুলিশ সদস্যদের মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে পুলিশের আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর আন্তরিক অভিব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/দেশ, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের সভ্যবৃন্দের আলোচনায় পুলিশ সংস্কারের বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

পুলিশ সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে পুলিশের ইতিহাস, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আইনি ভিত্তি, সামগ্রিক কার্যক্রম, জনবল, বিভিন্ন ইউনিটের পরিচিতি ও সাংগঠনিক সক্ষমতা, টিওএন্ডই, যানবাহন ও সরঞ্জামাদি, অস্ত্র-গোলাবারুদ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত একটি তথ্যচিত্র এই প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো। বিস্তারিত তথ্যাদি সংলগ্নী ০৫ দ্রষ্টব্য।

৬.১৫। ক্ষমতাকেন্দ্রিক পুলিশিং থেকে জনকেন্দ্রিক পুলিশিং

প্রেক্ষাপট

কর্মক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পুলিশের প্রাত্যহিক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমই জনকেন্দ্রিক পুলিশিং ব্যবস্থা। এটি একটি প্রক্রিয়া, যা জনসম্পৃক্ততা, জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস এবং সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। তবে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে নাগরিক ও পুলিশের সম্পর্ক অবিশ্বাস ও ভয়ের দ্বারা প্রভাবিত। এর মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার, যখন পুলিশ শাসকের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আজও দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সীমিত জনসম্পৃক্ততার মতো সমস্যাগুলো টিকিয়ে রেখেছে, যা নাগরিক ও পুলিশের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকালে পুলিশের জনবিরোধী ভূমিকা পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এর পেছনে পুলিশের নেতৃত্বস্থানীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতামুখী হওয়ার প্রবণতা এবং জনবিমুখতার বড় ভূমিকা রয়েছে।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে পুলিশের সংস্কারের ক্ষেত্রে জনকেন্দ্রিক পুলিশিং ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পুলিশের জন্য প্রয়োজন তার আওতাভুক্ত এলাকার কমিউনিটির সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ ব্যবস্থায় পুলিশ জনগণের বিপক্ষে নয়, বরং জনতার কাতারে এসে মানবিকতার সঙ্গে তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং জনগণের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবে। ফলে, ভবিষ্যতে যদি জুলাই-আগস্টের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে কমিউনিটি থেকেই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। অর্থাৎ জনকেন্দ্রিক পুলিশিং ব্যবস্থা একটি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে, যা পুলিশের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং পুলিশের কাজে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।

জনকেন্দ্রিক পুলিশিং ব্যবস্থার ভিত্তি

বাংলাদেশ পুলিশ ও জনতার সম্পর্ক একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এ সম্পর্ক সহনীয় ও সম্মানজনক স্থানে আনার জন্য একটি আদর্শ ভিত্তি বিবেচনা করা হয়ে থাকে, তা হলো—

১। বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা
২। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা
৩। বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা ধারণ ও লালন

জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য নীতি ও কৌশল

- নীতিগত ভিত্তি
- জনগণের সেবক
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- সমতা, সমানতা ও ন্যায্যতা
- মানবাধিকার ও সুনাগরিক সুরক্ষা নৈর্ব্যক্তিক আচরণ
- দুর্নীতি দমন নীতি

৪। **কৌশল**

✓ এলাকাভিত্তিক নিয়মিত ডায়ালগ
✓ পুলিশের কমিউনিটি সেবা পদ্ধতি ব্যবহার (পরিশিষ্ট ১)
✓ শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করা ও সচেতনতা সৃষ্টি
✓ পুলিশের আচরণ দক্ষতা বৃদ্ধি
✓ জনগণের আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি

- ✓ প্রযুক্তির ব্যবহার
- ✓ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো
- ✓ সুসম্পর্কের ফলাফল

জনকেন্দ্রিক পুলিশের কার্যপরিধি

বাংলাদেশে পুলিশ জনতার সম্পর্কের ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গগুলো সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্ক নির্ধারণ করে কীভাবে পুলিশ এবং জনতা একসঙ্গে কাজ করবে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত হবে। পুলিশ ও জনতার সম্পর্কের কিছু ক্ষেত্র তুলে ধরা হলো—

- ➢ সচেতনতা বৃদ্ধি
- ➢ এলাকার পুলিশি কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা
- ➢ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা
- ➢ অপরাধ প্রতিরোধ ও তদন্ত
- ➢ জরুরি সেবা প্রদান
- ➢ জন ও যান চলাচল নির্বিঘ্ন করা
- ➢ মানবাধিকার ও সুনাগরিক সুরক্ষা
- ➢ মাদক, সন্ত্রাস ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ প্রতিরোধ
- ➢ সামাজিক ও ব্যক্তি এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধান
- ➢ থানাগুলো সেবাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং দ্রুত সাড়াদানে তৎপরতা প্রদর্শন
- ➢ পুলিশিং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি
- ➢ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা
- ➢ সামাজিক ও সংস্কৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- ➢ গৃহীত নীতি ও কৌশল এর পর্যালোচনা সংস্কার এবং কর্মসূচির উন্নতি
- ➢ ক্রাইম সিন সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি
- ➢ বিজ্ঞানভিত্তিক ও ফরেনসিক তদন্ত ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন

পুলিশ সংস্কারে নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থার চলমান সংস্কারে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের কাঠামো ও প্রক্রিয়ার সংস্কার প্রয়োজন হলেও, এর পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতনতা, আচরণ এবং সম্পৃক্ততায়ও পরিবর্তন আনা জরুরি। জনগণকেন্দ্রিক পুলিশ বাহিনী কেবল তখনই সফল হতে পারে, যখন নাগরিকরা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সংস্কার প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য সুপারিশমালা

অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ (০-১ বছর)

১/ নিয়মিত টাউন হল সভার আয়োজন

বাংলাদেশের জনগণ ও পুলিশের মধ্যে আস্থা পুনর্গঠনের জন্য স্থানীয় থানার উদ্যোগে নাগরিক-পুলিশ সংলাপ একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অবিশ্বাস এবং দূরত্ব ঘোচাতে এই সংলাপের উদ্দেশ্য হলো উভয় পক্ষের মধ্যে খোলামেলা যোগাযোগ তৈরি করা, সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমাধানের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত সংলাপ (টাউনহল সভা) আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষার্থী পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই সভাগুলোর মাধ্যমে—

স্থানীয় সমস্যাগুলো শোনা এবং সমাধানের পরিকল্পনা করা: নাগরিকরা তাদের এলাকার অপরাধ, নিরাপত্তা, যানজট বা অন্য কোনো সমস্যা সরাসরি পুলিশকে জানাতে পারবে।

জনগণের উদ্বেগ এবং অভিযোগ মোকাবিলা করা: পুলিশ তাদের পদক্ষেপ এবং সীমাবদ্ধতাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে, যা নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সহায়ক।

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা: পুলিশ জনগণের আইনি অধিকার, অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি এবং আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে পারে।

আস্থা বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করা: নিয়মিত মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস গড়ে উঠবে।

২। নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি

ইতিমধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে গত ১০ আগস্ট আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনর্বহালের জন্য প্রতিটি থানা এলাকায় নাগরিক এলাকায় নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি গঠনে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (স্মারক নং- ৪৪.০১.০০০০.১২০.৫২.০৫৫.২০২৪.২১৯৩) । নির্দেশনাটি পুনর্মূল্যায়ন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই নিরাপত্তা কমিটি গঠনের ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মধ্যম সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ (১-৩ বছর)

১. শিক্ষাক্রমে পুলিশ বিষয়ক মৌলিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা

নাগরিক সচেতনতা তৈরির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুলিশ এবং নাগরিকদের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

- **নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব শেখানো:**
  পাঠ্যক্রমে এমন মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেখানে নাগরিক অধিকার, দায়িত্ব এবং পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সচেতনতা তৈরি করবে।

- **শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করা:**
  শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট (যেমন: কমিকস, অ্যানিমেশন, ইন্টারেকটিভ গেমস) এবং রোল-প্লে অনুশীলন তৈরি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, **'একদিন পুলিশ হয়ে দেখুন'** ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পুলিশের কাজ সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণা পেতে পারে।

২। নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগে শর্ট সার্টিফিকেট কোর্সের প্রস্তাব

নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে এবং জনগণকে দক্ষ ও সক্ষম করে তুলতে শর্ট সার্টিফিকেট কোর্স একটি কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে। এই কোর্সগুলো নাগরিকদের আইনি অধিকার, দায়িত্ব এবং পুলিশের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরির কৌশল শেখাবে। অনেক দেশে নাগরিকদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশেও অনুকরণ করা যেতে পারে।

শর্ট সার্টিফিকেট কোর্সের প্রস্তাবনা

কোর্সের বিষয়বস্তু:

- ব্যক্তিগত অধিকার, পুলিশি কার্যক্রমের সীমা, এবং অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি।
- পুলিশের সঙ্গে নিরাপদ এবং গঠনমূলক যোগাযোগের কৌশল।
- দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব এবং এটি প্রতিরোধে নাগরিকদের ভূমিকা।
- জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশের সাহায্য নেওয়া, নিরাপদ থাকা এবং সমন্বয়ের পদ্ধতি।

কোর্স কাঠামো:

- **মেয়াদ:** ১-৪ ঘণ্টা
- **ফরম্যাট:** অনলাইন, অফলাইন বা মিশ্র (হাইব্রিড)।

লক্ষ্যগোষ্ঠী:

- তরুণ প্রজন্ম (বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী)।
- পেশাজীবী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতারা।
- সাধারণ নাগরিক যারা পুলিশি সংস্কার এবং সুশাসনে আগ্রহী।

কোর্স বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ:

- **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP):** সরকার, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, সিএসও এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে।
- **অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার:** কোর্সটি মুক্তপাঠ বা স্থানীয় প্ল্যাটফর্মে আপলোড করা যেতে পারে।
- **সার্টিফিকেশন:** কোর্স সম্পন্নকারীদের সরকার থেকে স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

এই কোর্সটির মাধ্যমে নাগরিকরা পুলিশি কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, জনসাধারণ এবং পুলিশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পাবে, একটি সচেতন ও জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভিত্তি তৈরি হবে। এই ধরনের কোর্স চালু করা কেবল নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করবে না, বরং এটি পুলিশি সংস্কারকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতেও সহায়ক হবে।

৩। জনমুখী পুলিশের জন্য কার্যকর পিআর স্ট্র্যাটেজি

পুলিশের একটি আলাদা ও সুসংগঠিত পাবলিক রিলেশন (পিআর) স্ট্র্যাটেজি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পুলিশের সেবাগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক উন্নত করতে সহায়তা করবে। বর্তমান সময়ে অনেক নাগরিক, বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, পুলিশের সেবাসমূহ সম্পর্কে অবগত নয়, যা জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের সঠিক সহায়তা পেতে বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশের হটলাইন নম্বর বা বিশেষায়িত নারী সেবা ডেস্কের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচার প্রচারণা চালানো হলে, নারী নির্যাতন বা হয়রানির শিকার ব্যক্তিরা সহজেই সহায়তা চাইতে উৎসাহিত হবে। মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পুলিশের সেবা ও কার্যক্রম প্রচার করা হলে জনগণের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে, এই স্ট্র্যাটেজি পুলিশ-জনগণ যোগাযোগকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সহায়তা করবে। একটি শক্তিশালী পিআর স্ট্র্যাটেজি পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নত করার পাশাপাশি নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়া আরও জনমুখী করতে ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ: পুলিশের আলাদা পিআর (পাবলিক রিলেশন) স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে— যাতে পুলিশের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ আরও জোরদার হয়। যেমন- পুলিশের বিভিন্ন হটলাইনের ব্যাপারে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রমোশন করা যেতে পারে। বিশেষ করে নারীদের জন্য পুলিশের যে সেবাগুলো আছে তা আরও প্রচার-প্রচারণার দরকার আছে।

তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি:

বিক্ষোভ বা মব নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্ত্র বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের খরচের বিস্তারিত বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এটি জনগণের সামনে পুলিশের খরচের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সহায়তা করবে। অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জনগণের করের টাকা ব্যবহৃত হয়, তাই এই খরচের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা নাগরিকদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একইভাবে, প্রতিটি থানায় মামলা ও কোর্ট ওয়ারেন্টের পেন্ডিং স্ট্যাটাস, সমাধান হওয়া মামলার সংখ্যা, এবং বিভিন্ন ধরনের মামলার তথ্য একটি পাবলিক ডেটাবেসে শেয়ার করা হলে পুলিশের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে এবং এটি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখবে। এই তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারবে পুলিশের কার্যক্রমের অগ্রগতি, মামলার নিষ্পত্তির অবস্থা এবং পুলিশের ওপর আস্থা বাড়বে। পুলিশ বাহিনীর কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য জনগণের কাছে নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক তথ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সামাজিক ন্যায়বিচারের পাশাপাশি পুলিশের প্রতি জনমনে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে।

সুপারিশ : পুলিশের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে থানাভিত্তিক মামলা কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত।

জনবান্ধব পুলিশ গঠনে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ:

পুলিশ সার্ভিসকে জনবান্ধব হিসেবে গড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এর জন্য পুলিশে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষত যারা সমাজের মূলধারার বাইরে রয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্তির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে এবং সিয়েরা লিওনের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। এসব দেশে পুলিশ বিভাগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। **বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বুদ্ধিভিত্তিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি পুলিশ বিভাগেও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।** এই উদ্যোগ একদিকে পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক উন্নত করবে, অন্যদিকে আহত ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।

কমিউনিটি পুলিশ কর্তৃক কমিউনিটি সেবায় ব্যবহার করার পদ্ধতি

পদ্ধতি	ফলাফল
পুলিশ বর্তমানে বিট পুলিশিং ও কমিউনিটি পুলিশিং চর্চা করছে। এছাড়াও	জন আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়
প্রতিবেশী পুলিশিং যা প্রতিটি নাগরিকের জন্য সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। অধিক্ষেত্র ২০-২৫ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং জন আস্থা অর্জিত হয়। এর ফলে পুলিশের কমিউনিটিতে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।	অপরাধ ও পুলিশ ভীতি হ্রাস পায় অধিক জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় সেবা পরিচালনায় বহুমুখী কর্ম ফলাফল অর্জিত হয় সহমর্মিতা ও সমবেদনা বিবেচনায় ভিকটিমের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়
বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, এতে সেবাদানকারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে পুলিশের ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস পায়, কাজের ওভারলেপিং বন্ধ হয়। নিরাপত্তা সেবার ব্যয় হ্রাস পায়।	কমিউনিটির সামাজিক কার্যক্রমে (বিয়ে, জন্মদিন) অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়
SARA, (Scanning, Analysis, Response and Assessment). **মডেলের ব্যবহার, এ পদ্ধতি পুলিশ মূলত সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য নিবিড়ভাবে গবেষণালব্দ ফলাফলের ভিত্তিতে সমাধানের জন্য কাজ করে।**	উন্মুক্ত স্থান, জলাধার, ইত্যাদির নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়
শিক্ষার্থী ক্যাডেট কোর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
বিশেষ ও অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করে পুলিশ আইন ১৮৬১ সহ প্রচলিত আইন ও বিধির অধীনে এ ধরনের নিয়োগের বিধান রয়েছে। এ ধরনের পুলিশ নিয়োগ করে পুলিশ সমস্যার সমাধান করতে পারে।	সামাজিক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিরাপত্তা ও সমস্যা সমাধান করা যায়।

জনকেন্দ্রিক পুলিশের জন্য কমিটি গঠন, কমিটির কার্যপরিধি এবং কমিটির কার্যক্রম

কমিটি গঠন প্রক্রিয়া

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশসহ স্থানীয় অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে স্থানীয় নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পূর্বের উত্তম চর্চা (ময়মনসিংহ রণ পাহারা পার্টি, সিভিল ডিফেন্স পার্টি, ডাকাতি বন্ধে স্থানীয় যুব কমিটি ইত্যাদি) অনুসরণ করা যেতে পারে। কমিটি গঠনের পূর্বে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা, দায়িত্ব বণ্টন, পুলিশসহ অন্যান্যদের ভূমিকা পালনের আওতা ও ক্ষেত্র বিন্যস্ত করা যেতে পারে। কমিটির বৈশিষ্ট্যগত কাঠামোতে (নৈর্ব্যক্তিক, যতটুকু সম্ভব অরাজনৈতিক, সমাজ সেবায় আগ্রহী, স্থানীয় শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ইত্যাদি) অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ যেন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কমিটির গঠন

স্থানীয় সুধীজন ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সার্কেল অফিসার আওতাভুক্ত এলাকার বিস্তৃতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিটির আকার নির্ধারণ করতে পারবে। এতে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নিম্নোক্ত শ্রেণি ও পেশার মানুষদের নিয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১. আইন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন এইরূপ গ্রহণযোগ্য আইনজীবী/বিচারক ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা;

২. সিনিয়র সিটিজেন— স্থানীয় আবাসিক বাসিন্দা (বাড়ির মালিক/ভাড়াটে), অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, স্থানীয় ধর্মীয় নেতা;

৩. সকলের নিকট সমাদৃত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের সভাপতি/সেক্রেটারি;

৪. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং

৫. মানবাধিকার কর্মী, নারী অধিকার কর্মী, সমাজকর্মী বা উন্নয়নমূলক সংগঠনের (এনজিও) প্রতিনিধি ইত্যাদি।

খ. কমিটির কার্যপরিধি

কমিটির প্রথম সভায় কমিটির সদস্যগণ কার্যক্রম ও কার্য এলাকা সুনির্দিষ্ট করবে। কমিটির পদবি যথা— সমন্বয়ক/সদস্য সচিব এবং অন্যান্য সদস্যের পদবি কমিটি নির্ধারণ করবে।

গঠিত কমিটি নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করতে পারে—

প্রস্তাবিত কমিটির প্রধান লক্ষ্য হবে— আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার, জনসম্পৃক্ততা ক্রমান্বয় বৃদ্ধি করা এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য :

১. মানুষের পুঞ্জীভূত অভিযোগ শুনে তাৎক্ষণিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. পুলিশের জবাবদিহিতার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ণ;

৩. পুলিশ সদস্যের নিরাপত্তা বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা;

৪. পরাজিত শক্তির কেউ যেন কোনো প্রকারের উস্কানি দিয়ে পরিবেশ ঘোলাটে করতে না পারে সেজন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;

৫. পুলিশ সদস্যদের আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করা, ইত্যাদি।

গ. কমিটির কার্যক্রম

১. অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করে প্রতিটি কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক করে সর্বজনগ্রাহ্য কার্যক্রম পরিচালনা;

২. বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন;

৩. কমিটির আওতাধীন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য ও কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে যৌথ টহল প্রদানের মাধ্যমে হানাহানি, চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধ;

৪. এলাকায় বিদ্যমান সামাজিক সংঘাত যথা বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নিরসনে নিবিড় ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি;

৫. স্থানীয় জনসাধারণের জীবন, সম্পদ, স্থাপনা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয়সহ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়মিত তদারকি করা এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, মাদকের অর্থ জোগানদাতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকসেবীদের নিরাময় সেবা প্রদান ও উপদেশ এবং পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭. থানার বিভিন্ন এলাকায় ইভটিজিং সমস্যা নিরসনে ছাত্র-শিক্ষক ও জনতার সমন্বয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভার আয়োজন এবং

৮. স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত দল-উপদলের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা।

ভলেন্টিয়ার পুলিশ গঠন সংক্রান্ত ধারণাপত্র

১) শিরোনাম : ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট (ভিপিসি) স্কিম

২) ভূমিকা :

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী তারুণ্যসীমার মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮১.৯৩ মিলিয়ন ০-২৪ বছর বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে। বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে ৪১.০৭ মিলিয়ন পুরুষ এবং ৪০.৮৬ মিলিয়ন নারী রয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, কিশোর এবং তরুণ বয়সী ছেলে-মেয়েরা সাধারণত বিভিন্ন অপরাধের শিকার হয় কিংবা নিজেরা কেউ না কেউ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। কাজেই এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে যদি একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে আনা যায় তবে অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা যেমন কমে যাবে তেমনি জননিরাপত্তা অধিকতর সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বর্তমানে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ, তথ্য আদান প্রদান, সমন্বয় ও সহযোগিতা করার মতো কোনো বিশেষায়িত ইউনিট বা শাখা নেই। মাঠ পর্যায়ের কর্মরত পুলিশ সদস্যগণ মাঝে মধ্যে স্ব-উদ্যোগে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সচেতনতামূলক সভা বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। নিয়মিতভাবে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি করা হয় না। বাংলাদেশে যদিও বিএনসিসি, স্কাউট,

লিও ক্লাব, স্কুল ভিত্তিক কমিটি ইত্যাদি কিছু সংগঠন/কমিটির কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান এসব সংগঠনে বিশেষ করে অপরাধ নিবারণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, নিজেকে অপরাধে না জড়ানো কিংবা অপরাধ করা হতে বিরত থাকা, অপরাধ নিরসনে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম কিংবা এতদসংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু পুলিশিং কার্যক্রম একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম কাজেই দেশের যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে যদি স্থায়ী কোনো ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায় তবে তা জনস্বার্থে এবং জননিরাপত্তা সংহতকরণে অধিক কার্যকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

৩) ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট-এর বৈশ্বিক উদাহরণ:

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পুলিশিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে। যুক্তরাজ্যে Metropolitan Police Cadet বা Met Volunteer, ভারতের Student Police Cadet (SPC), স্কটল্যান্ডের পুলিশ ক্যাডেট স্কিম, সিঙ্গাপুরের The National Police Cadet Corps (NPCC) অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এসকল সংগঠনের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে সমাজের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন কমিউনিটি পুলিশিং, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, তথ্য বিনিময় ইত্যাদি কর্মকান্ড করে থাকে। এর ফলে যুব সমাজের সহযোগিতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং একটি নিরাপদ দেশ বিনির্মাণ সহজতর হয়।

৪) বাংলাদেশে ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট-এর উপযোগিতা:

বাংলাদেশের পুলিশের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ। এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পুলিশের সংখ্যানুপাতিক হার বিবেচনা করলে পুলিশ ও জনগণের অনুপাত প্রায় ১:৮০৩ জন। এ অনুপাতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ যেমন ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা কিংবা মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তুলনা করলে জনগণের তুলনায় পুলিশের সংখ্যা অনেক কম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশে বিএনসিসি'র ন্যায় ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট গঠন করা গেলে যুব সমাজ কর্তৃক অপরাধ নিরসনে বিশেষভাবে কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট-এর কাঠামো ও কর্মপরিধি গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে বিশাল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও জন আকাঙ্ক্ষিত ধারায় তাদের পরিচালিত করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা যায়। পুলিশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে, পুলিশিং কাজে সহায়তা এবং সর্বোপরি, পুলিশ ও তারুণ্যের শক্তির সংমিশ্রণে নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট একটি অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৭২টি পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ রয়েছে। এসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি, বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি জেলায় পুলিশ লাইন্স মাঠ, বিভিন্ন রিজিয়নে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এবং পুলিশিং-এর বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত ইন্সট্রাক্টর বা প্রশিক্ষক রয়েছেন। কাজেই ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে অনতিবিলম্বে বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এর কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সারা দেশব্যাপী এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হবে।

৫) ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট স্কিম বাস্তবায়নে কাঠামোগত ধারণা:

(ক) প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

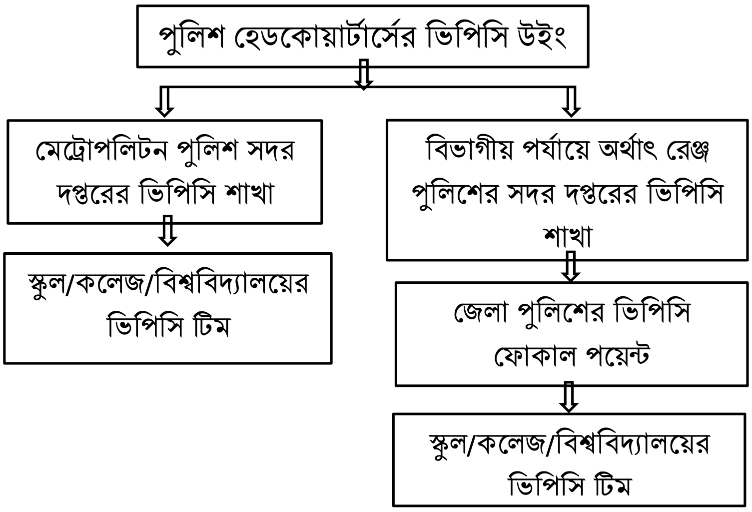

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

স্কুলের ভিপিসি টিম গঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুলের টিম গঠনের সার্বিক সক্ষমতার (শিক্ষকদের Availablity, স্কুলের অবকাঠামোগত সুবিধা ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ইত্যাদি) বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে টিম গঠন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্কুলের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলার শিক্ষা বিভাগ বা মন্ত্রণালয়) এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(খ) কার্যাবলি:

- ছাত্রসমাজকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, গণতান্ত্রিক আচরণ এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখার নিমিত্ত যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে (যেমন- মাদকের অপব্যবহার রোধ করা, নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি রোধ করা, ইভ টিজিং, কিশোর অপরাধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কার্যক্রমে নিজেকে না জড়ানো ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা।
- পুলিশ ও জনগণের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস সুসংহতকরণে তরুণ সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংযুক্ত করা।
- খেলাধুলা ও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বের এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে ভূমিকা রাখা।

(গ) নিয়োগ: সাধারণত ১৩-২৫ বছর বয়সী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছেলে-মেয়েদের ভিপিসি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। কোনো অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে ভিপিসি হবার জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষিত পুলিশ কর্মকর্তাগণ ভিপিসিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুশীল সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ভিপিসিগণকে নানা বিষয়ে পাঠদান করতে পারেন। প্রশিক্ষণার্থী ভিপিসিগণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যেমন কোর্ট, পুলিশ স্টেশন, কারাগার, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি সরেজমিনে ভ্রমণ করে ধারণা লাভ করতে পারেন। এ ছাড়াও আবাসিক ক্যাম্পিং, কমিউনিটি সম্পৃক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার অপরাধ বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা লাভ করতে পারেন।

(ঙ) ব্যক্তিগত প্রোফাইল ও আইডি কার্ড: প্রত্যেক ভিপিসির ব্যক্তিগত তথ্য সংবলিত একটি প্রোফাইল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ এবং প্রত্যেককে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি আইডি কার্ড ইস্যু করা যেতে পারে। ভিপিসিগণ দায়িত্ব পালনকালে এই আইডি কার্ড প্রদর্শিত রেখে দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) কর্ম দিকনির্দেশনা বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ: ভিপিসিগণের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার (নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, আইডি কার্ড ইস্যু ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের কৌশলগত (Strategic) দিকনির্দেশনা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে অধস্তন ইউনিটসমূহে প্রদান করা হবে। অধস্তন ইউনিটসমূহ প্রাপ্ত দিকনির্দেশনার আলোকে ভিপিসিগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মে সম্পৃক্তকরণ ও কর্ম পর্যবেক্ষণ করবেন। কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রয়োজন হলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বিভাগীয়/মেট্রো পুলিশ ও জেলা পুলিশের ইউনিট প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় অফিস বা মাঠ পর্যায়ের অফিস) সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

(ছ) বাজেট: সরকার ভিপিসি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পুলিশ বাজেটে একটি বিশেষ বরাদ্দ দিতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেটে এ সংক্রান্তে বিশেষ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। এসব ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ওপর ধার্যকৃত মাসিক চাঁদা, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের Corporate Social Responsibilities (CSR) থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে অপরাধ দমন ও সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন আউটরিচ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

(জ) সার্টিফিকেট: যদি কোনো ভিপিসি এক বছরের অধিকাল বেশি ভিপিসি কার্যক্রমসমূহ থাকে তবে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে।

৬। ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট গঠনে প্রত্যাশিত ফলাফল:

- পুলিশ এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় সেতুবন্ধন তৈরি হবে।
- তরুণ সমাজ নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকতে সক্ষম হবে এবং তারা অপরাধ করার প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।
- যথাযথ প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত আচরণ দৃশ্যমান হবে।
- পুলিশের পক্ষে তারুণ্যের মনোজগৎ ও চলার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণপূর্বক তাদের আইন মান্য করার অভ্যাস সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।
- তরুণগণ নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
- সর্বোপরি, পুলিশিং কার্যক্রমে সহায়তা করার মাধ্যমে পুলিশের ঘাটতি জনবলের নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব হবে।

৭) উপসংহার:

তারুণ্যের শক্তি যে কোনো দেশের সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বিগত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে পুলিশ ও স্কুল-কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের আস্থাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও জনতার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়া এবং দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূল রাখতে ভলেন্টিয়ার পুলিশ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অংশীজনের সহায়তা পাওয়া গেলে ভলেন্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেট বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং বৈশ্বিক Best Practice বিবেচনায় অপরাধ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৬.১৬। কমিউনিটি পুলিশিং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে আইনি কাঠামো ও বাজেট বরাদ্দ:

বাংলাদেশে বিদ্যমান কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাপনাকে শুধু অপরাধ নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করতে হলে, কমিউনিটি পুলিশিংয়ের পরিসর বৃদ্ধি করে একে কার্যকর একটি 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' ব্যবস্থা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি। এটি কার্যকর হলে, নির্দিষ্ট এলাকায় পুলিশের সার্বিক কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি পুলিশ বাহিনীরও কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি, বিগত সময়ে পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা সমাজের তৃণমূল পর্যায় থেকে সারিয়ে তোলার একটি টেকসই কৌশল হিসেবে কমিউনিটি পুলিশিংকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী না হয়ে, সমাজে সম্মানিত, সৎ এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি।

ছাত্রসমাজ আমাদের দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী। ছাত্রসমাজকে কেন্দ্র করে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেমন- Bangladesh National Cadet Corps (BNCC), Scout ইত্যাদি রয়েছে। এ সকল সংগঠন সাধারণত সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে ছাত্রদের সমন্বয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত নেই, অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ (Student Police Cadet) যুক্তরাজ্য (Met Volunteers) ও উন্নত বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে বেসরকারি সিকিউরিটি সার্ভিস রয়েছে, যারা বিভিন্ন অফিস ও বাসাবাড়িতে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। এই জনগোষ্ঠীকে একটি পদ্ধতিগত কাঠামোর মাধ্যমে জননিরাপত্তা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করলে জননিরাপত্তা আরও সুসংহত হবে। এছাড়াও কিছু কিছু বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা (এনজিও) মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নানাবিধ কাজ করে যাচ্ছে এবং কিছু মন্ত্রণালয়ও (মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) বিভিন্ন ভূমিকা পালনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরাধ দমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দেশে প্রচলিত গ্রাম আদালত ও চৌকিদারি প্রথা বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল স্থানীয় ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

সার্বিক বিশ্লেষণ এবং দেশের বিদ্যমান জনসম্পৃক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো পর্যালোচনা করে একটি Comprehensive Community Policing কাঠামো গঠন করা যেতে পারে। এ কাঠামোটি মূলত সহায়ক পুলিশ হিসেবে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এ ধরনের পুলিশিং ব্যবস্থা প্রচলিত হলে স্বাভাবিকভাবেই বাজেট সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের অধীনস্ত (উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভা) কর কাঠামোর আওতায় রাজস্ব আহরণপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে কমিউনিটি পুলিশিংভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৬.১৭। সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:

(সংলগ্নী ০৬ দ্রষ্টব্য)

১। নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা

ক) ভূমিকা:

কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ ও সফলতা সাধন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সদস্যদের মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য ন্যায়ত একটা সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা। কেননা কর্মস্থলে গতিশীলতা আনতে নতুন নিয়োগের পাশাপাশি পদোন্নতি ও পদায়নসহ প্রশিক্ষণের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতি ও পদায়নসহ প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় না। কেননা পদোন্নতি বা উপযুক্ত স্থানে পদায়ন না হলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা যায়, যার নেতিবাচক প্রভাব সামগ্রিক কাজের ওপর পড়ে। কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনিয়মিত পদোন্নতি ও

যোগ্য কর্মীকে অযোগ্য স্থানে পদায়নের কারণে অধিক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন কর্মীদের উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে নিরুৎসাহিত করে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ পুলিশের সুষ্ঠু ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করা হলে তা সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের মনোবল ও কর্মস্পৃহা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি জনসম্পদ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ঘটবে যা সার্বিকভাবে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে বিশ্বজুড়ে পুলিশিং ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ পুলিশেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পুলিশিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন অতীব জরুরি। তাই পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মজীবনে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে **বাংলাদেশ পুলিশের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার অতীব জরুরি।**

খ) উদ্দেশ্য:

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী পুলিশিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পুলিশের সেবা প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিপূর্বক বাংলাদেশ পুলিশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সমসাময়িক বিরাজমান অপরাধের ধরন অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম—এরূপ সর্বতো গ্রহণযোগ্য পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সার্বিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করা।

গ) বাংলাদেশ পুলিশের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি:

- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের জন্য বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল এবং কাঠামোগত দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় সহকারী পুলিশ সুপারের নিয়োগ নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে:
  বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রয়োজন, তা উপেক্ষিত হচ্ছে। এজন্য বর্তমান বিসিএস পরীক্ষায় পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগের জন্য আলাদাভাবে শারীরিক যোগ্যতা [(উচ্চতা ও ওজন ইত্যাদি পরিমাপ, ফিজিক্যাল এনডিউরেন্স টেস্ট (PET), মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি)] অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনের যোগ্যতা নিরূপণ করা যায়। এতে, আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীরা পুলিশ ক্যাডারে আবেদন করার জন্য সহজে বিবেচিত হতে পারবেন। এক্ষেত্রে The Bangladesh Civil Service (Enforcement: Police) Composition and Cadre Rules, 1980 সহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের সুপারিশ করা হলো।
- পুলিশ সার্ভিসের পুলিশ সুপার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ফিট লিস্ট প্রস্তুত করে নিয়মিত বিরতিতে হালনাগাদ করতে হবে। হালনাগাদকৃত তালিকা থেকে পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়ন করবেন।
- বিশেষায়িত পুলিশ যথা (সিআইডি, সাইবার অপরাধ, বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি) স্ব স্ব বিভাগের ভেতরে সংশ্লিষ্ট পদে পদায়ন করতে হবে।
- সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পুলিশ বিভাগে সুপারিশকৃত বা আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য আলাদা স্বাস্থ্য পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে।
- কনস্টেবল থেকে এএসআই এবং এএসআই থেকে এসআই পদোন্নতিতে প্রতি বছর পরীক্ষা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার রীতি বাতিল করে ০১ বার উত্তীর্ণ হলে তাকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য তাকে যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
- বিভাগীয় পদোন্নতির নীতিমালা সংস্কার করে কনস্টেবল/এসআই নিয়োগ স্তর থেকে একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যাতে সদস্যদের মধ্যে পেশাদারিত্ব উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ/উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

২। বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা/মেট্রোপলিটন পুলিশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, লিগ্যাল এক্সপার্ট, করোনার পদায়ন/নিয়োগ প্রসঙ্গে:

(পুলিশ সদর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রস্তাব) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হন। এই কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ও সুনির্ধারিত বিচারিক ক্ষমতার অধিকারী। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে তারা সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে সম্মুখসারিতে কার্যনির্বাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ, দ্রুত বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা, নির্বাচনী দায়িত্ব পালন, পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন, উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা, প্রোটোকল ব্যবস্থাপনা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। পক্ষান্তরে বিচারিক কার্যক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পুলিশকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সব ধরনের বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। করোনা মহামারিসহ সকল জাতীয় দুর্যোগেই বাংলাদেশ পুলিশ সম্মুখ সারিতে থেকে দায়িত্ব পালন করেছে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তারা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী মোবাইল কোর্টের বিচারকদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮, পেনাল কোড ১৮৬০, পুলিশ রেগুলেশন ১৯৪৩সহ অন্যান্য অপরাধ দমন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। পুলিশ সদস্যরা সকল ক্ষেত্রেই যে ভূমিকাটি পালন করেন তা হলো সহায়তাদানকারীর ভূমিকা।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেখানেই সমাজ আছে, পুলিশ সেখানেই বর্তমান। সমাজে সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে পুলিশের কর্মকাণ্ড প্রকৃতিগতভাবেই অনায়াসে অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ পুলিশ হলো বাংলাদেশের একমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পুলিশ আইন ১৮৬১ এর ধারা ৫ অনুসারে বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান অধিকর্তা অর্থাৎ পুলিশ মহাপরিদর্শককে দেশের সর্বত্র একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া আছে। তবে এই ক্ষমতা নিরঙ্কুশ এবং অবারিত নয়। এ ধারায় উল্লেখ আছে যে, পুলিশ মহাপরিদর্শক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

পিআরবি, ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি, সাক্ষ্য আইন ও পুলিশ আইনসহ প্রায় সহস্রাধিক আইন বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুলিশের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে, অনেক আইনেই পুলিশি দায়িত্ব পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের বিধানসমূহ সাংঘর্ষিকও বটে। তাই বাংলাদেশ পুলিশে অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

পুলিশ মহাপরিদর্শককে প্রদত্ত ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা এককভাবে প্রয়োগ করার চাইতে যদি তার অধস্তন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রয়োগের সুযোগ থাকে তবে জরুরি ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হয়। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে এই ক্ষমতা তার অধস্তন কর্মকর্তাদের অর্পণ (Delegate) করার জন্য কমিশন সুপারিশ করতে পারে। এর ফলে যে কোনো জটিল মুহূর্তে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হতে পারবেন।

কমিশনের মতামত:

আইজিপিকে প্রদত্ত ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা ডেলিগেট করার বিষয়ে এবং মেট্রোপলিটন পুলিশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রস্তাবে কমিশন একমত পোষণ করে না।

ক) লিগ্যাল এক্সপার্ট নিয়োগ:

দেশের বিদ্যমান ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধী শনাক্তকরণের জন্য নির্মোহ তদন্ত পরিচালনা পুলিশের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

অপরাধের তথ্য উদ্‌ঘাটন ও অপরাধীকে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশকে নিরলসভাবে কাজ করতে হয়। পুলিশ বাহিনী নিয়মিত এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে থাকে। তবে পরিপূর্ণভাবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে বিশেষজ্ঞ/পারদর্শী না হওয়ায় আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকালীন সময়ে তাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে আসামিপক্ষের অভিজ্ঞ উকিলরা আইনি মারপ্যাঁচে তদন্ত প্রতিবেদনকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। তাই তদন্তকাজে আইনি সহায়তা ও আদালতে আসামি পক্ষের উকিলের সওয়াল/জেরা যথাযথভাবে মোকাবিলার জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে থেকে **'লিগ্যাল অফিসার্স সেল'** নিয়োগ করা যেতে পারে। অথবা এক্ষেত্রে দক্ষ ও পারদর্শী আইনজীবীদের নিয়ে স্থায়ীভাবে দেশের প্রত্যেক মেট্রোপলিটন পুলিশ/জেলা পুলিশে **'লিগ্যাল প্যানেল'** সৃষ্টি করা যেতে পারে। যারা চুক্তিভিত্তিকভাবে নিয়োগ লাভ করে আইনজ্ঞ হিসেবে পুলিশকে সহায়তা প্রদান করবেন।

মতামত: **'লিগ্যাল অফিসার্স সেল' এবং 'লিগ্যাল প্যানেল'** সৃষ্টির বিষয়ে কমিশন একমত পোষণ করছে।

খ) করোনার নিয়োগ:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুলিশ কাঠামোতে 'করোনার' হলেন বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা যিনি অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা ও আদেশ প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ শাসনভুক্ত অনেক দেশে 'করোনার' নিযুক্ত করার ব্যবস্থা চালু হয়। করোনারের দায়িত্বের মধ্যে নিজ এলাকার মধ্যে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত এবং সার্টিফিকেশন প্রদানের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করা অন্যতম। করোনার তার অফিস কর্মএলাকার মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের মৃত্যুর রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচারিক পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে 'করোনার' নিয়োগ ও দায়িত্ব-কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। তবে, সাধারণত আইনি শিক্ষা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী ব্যক্তিগণ অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত বোর্ডে মেডিকেল পরীক্ষক এবং ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ক্ষেত্রও এখন জটিল ও বিস্তৃত। তাই বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা/মেট্রোপলিটন পুলিশে লিগ্যাল এক্সপার্ট, করোনার পদায়ন/নিয়োগ করা এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশে যে কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রাথমিক তদন্ত বাংলাদেশ পুলিশের উপর ন্যস্ত। দেশের আদালতের আদেশ অনুযায়ী অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত কখনো থানা, কখনো পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), কখনো সিআইডি পরিচালনা করে। মৃত্যুর ফরেনসিক তদন্তে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অল্প সময়ে তদন্ত সমাপ্ত করে অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনতে বাংলাদেশ পুলিশে 'করোনার' অন্তর্ভুক্ত করা অতীব জরুরি। বাংলাদেশ পুলিশে 'করোনার' ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠলে দেশের একদিকে মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত হাসপাতালগুলো ও চিকিৎসকগণ বাড়তি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন, অন্যদিকে তদন্ত ও অপরাধী গ্রেপ্তারে বাংলাদেশ পুলিশ ওয়ান-স্টপ সেন্টার হিসেবে স্বাধীনভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ করতে পারবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'করোনার' নিয়োগের ব্যবস্থা দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকা, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে করোনার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমরা হংকং মডেল গ্রহণ করতে পারি। পরীক্ষামূলকভাবে ৮টি বিভাগীয় মেট্রোপলিটন এলাকায় করোনার ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করা হলো।

সুপারিশ: হংকং-এর করোনার আদালত অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ এবং পরিস্থিতি অনুসন্ধান করার দায়িত্ব পালন করে। মূলত প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট বিবেচনা করে করোনারগণ অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচারিক আদেশ দেন। বিচারিক আদেশ প্রদানের এখতিয়ার ছাড়াও করোনারগণ মৃতের পরিবারকে অনুদান প্রদান, দাফনের আদেশ, শ্মশানে স্থানের আদেশ, ময়নাতদন্তের মওকুফ, ময়নাতদন্তের আদেশ, মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ আদেশ, হংকংয়ের বাইরে সরানোর নির্দেশ, পুলিশকে মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ, আদেশ অনুসন্ধান, মৃতদেহের শরীরের অংশ অপসারণ ও ব্যবহার অনুমোদন, মৃত্যুর সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে হতে হবে।

৬.১৮। প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা:

সূচনা:

নিজ নিজ দাপ্তরিক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ একটি সর্বজনীন মাধ্যম। টেকসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং সর্বোত্তম সেবা এক সূত্রে গাঁথা। পেশাগত দক্ষতা ও সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৪১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৮টি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ৮টি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে রয়েছে মৌলিক প্রশিক্ষণ, বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, পদোন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, বাধ্যতামূলক ইন-সার্ভিস ট্রেনিং, নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, পদমর্যাদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (কনস্টেবল থেকে অ্যাডিশনাল আইজিপি), বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ।

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রযুক্তির প্রভূত প্রসারের ফলে অপরাধের প্রকৃতি ও ধরনেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাদক, চোরাচালান, সন্ত্রাস, শ্রমিক অসন্তোষ, সাইবার অপরাধ, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ও মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে এবং বহুমুখী দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে দক্ষ ও পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে:

১. **বাস্তব প্রশিক্ষণে অর্জিত ফলাফল পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া;**
সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৮(১) ধারায় কোনো স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদানের সময় তার সততা, মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রশিক্ষণে অর্জিত ফলাফল পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রণোদনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয় না। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের সময় অযথা সময়ক্ষেপণ করে এবং নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে না। ফলে প্রশিক্ষণ খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশিক্ষণের সঙ্গে প্রণোদনার সমন্বয়হীনতাই অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করা হয়।

ক) প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফলকে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে।
খ) প্রশিক্ষণের ফলাফল প্রশিক্ষণার্থীর এসিআরের প্রাপ্ত নম্বরে প্রতিফলিত হতে হবে।

২. **প্রশিক্ষণে বাজেটের স্বল্পতা:**
বাংলাদেশ পুলিশ বাজেটের সঙ্গে প্রশিক্ষণ বাজেটের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় পুলিশ বাজেটের মাত্র ০.৫% প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ থাকে যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

তুলনামূলক পর্যালোচনা (ট্রেনিং বাজেট/পুলিশ বাজেট)

	২০২১-২০২২ (কোটি)	২০২২-২০২৩ (কোটি)	২০২৩-২০২৪ (কেটি)	২০২৪-২০২৫ (কোটি)
বাংলাদেশ পুলিশ বাজেট	১৬০০০	১৪০০০	১৭০০০	১৮০০০
বাংলাদেশ পুলিশ ট্রেনিং বাজেট	৩০	৬৬	৫৫	৭০
শতকরা	০.২	০.৫	০.৩৫	০.৫

এ তুলনামূলক চিত্রের আলোকে, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণে বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল যা একটি দক্ষ এবং আইনবান্ধব পুলিশ গঠনের অন্তরায়। বাংলাদেশ পুলিশের ৪১ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে একাডেমিক প্রশিক্ষণে বাজেট বৃদ্ধিকরণে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।

৩. বাংলাদেশ পুলিশের ট্রেনিং সেন্টারসমূহে লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধিকরণ:

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও প্রযুক্তির প্রভূত প্রসারে অপরাধের প্রকৃতির যে পরিবর্তন এসেছে এর আলোকে বাংলাদেশ পুলিশের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে:

ক) ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ) বিভাগীয় শহরগুলোতে ফরেনসিক ল্যাব, সাইবার ল্যাব, সাইবার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে।

৪. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ চালুকরণ ও বৃদ্ধিকরণ:

ক) ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, ইকোনমিক ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি বিশেষায়িত বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

খ) বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পুলিশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত ইউনিটগুলোতে চাকরি করতে বাধ্য থাকবেন।

গ) অর্গানাইজড ক্রাইম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদেশ থেকে expertise এনে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।

৫. টিআরসি বেসিক ট্রেনিং ৬ মাসের পরিবর্তে ১ বছর করা যেতে পারে।

৬. ট্রমা-ইনফর্মড প্রশিক্ষণ: জনবান্ধব পুলিশিংয়ের পথে একটি পদক্ষেপ

ট্রমাটাইজড ভুক্তভোগীদের সঙ্গে পুলিশের সহানুভূতিশীল আচরণ জনবান্ধব পুলিশিংয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ সদস্যদের ট্রমা-ইনফর্মড প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সংবেদনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। এ প্রশিক্ষণে ট্রমাটাইজড ব্যক্তির সঙ্গে ধৈর্য ধরে কথা বলা, দোষারোপ এড়িয়ে তথ্য সংগ্রহ করা, এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদ্ধতি শেখানো হবে। এতে

ভুক্তভোগীরা পুলিশের প্রতি আস্থা পাবে এবং নিজেদের নিরাপদ বোধ করবে। একইসঙ্গে, পুলিশের সক্রিয় শ্রবণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ তাদের প্রতি ভুক্তভোগীদের সহযোগিতার মনোভাব বাড়াবে। সহানুভূতিশীল আচরণ শুধু ভুক্তভোগীদের মানসিক পুনর্বাসনে নয়, পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক উন্নত করতেও সহায়ক। এটি অপরাধ রিপোর্টিং বাড়িয়ে মামলা তদন্ত ও অপরাধ দমন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি, জনগণের কাছে পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে। একটি ট্রমা-ইনফর্মড এবং সংবেদনশীল পুলিশ বাহিনী আইনের শাসনকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, যা একটি জনবান্ধব ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সুপারিশ : পুলিশ সদস্যদের জন্য ট্রমা-ইনফর্মড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে, যা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ ও তাদের মানসিক স্বস্তি নিশ্চিত করবে।

৭. বাংলাদেশ পুলিশ ইউনিভার্সিটি

পুলিশের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি বিস্তারিত প্রস্তাব পাওয়া যায়। পুলিশ যুক্তি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুলিশ বাহিনীর জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে মর্মে জানিয়েছে। কমিশন এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মতামত:

কমিশন এ মুহূর্তে পুলিশ সংস্কারের জন্য পুলিশ ইউনিভার্সিটি স্থাপন খুব জরুরি মনে করে না। বর্তমানে সংস্কারের জন্য আরও অগ্রাধিকারমূলক বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা সমীচীন। তবে কমিশন মনে করে, পরবর্তীতে বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুলিশ সদর দপ্তর সরকারের কাছে বিবেচ্য বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করতে পারে।

৮. Centre for Police Research and Development (CPRD)

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতার পরিবর্তন সম্ভব হলেও বর্তমান সময়ে নতুন এবং আকস্মিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানধারণা এবং প্রতিপালনের সংস্কৃতি অত্যন্ত গভীরভাবে ধারণ করা প্রয়োজন। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে Centre for Police Research and Development (CPRD) গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

CPRD পুলিশিং এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য হবে একটি অন্যতম ও অগ্রগণ্য সেন্টার। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষায়িত একাডেমিক ডিগ্রি ও Evidence-based গবেষণা এর মাধ্যমে পুলিশ এর গুণগত মানোন্নয়ন এবং তথাপি প্রমাণভিত্তিক আধুনিক ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অপরাধ প্রকৃতির বিবর্তন, অভূতপূর্ব পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবেলা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা এবং আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও গঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণের নিমিত্ত পুলিশ স্টাফ কলেজের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি।

আইন ও অপরাধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তাদের তদন্তের মান সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান আকারে উন্নীত হবে। এই সেন্টার আইন, অপরাধ বিজ্ঞান তথা গবেষণামূলক কার্যক্রম এর মাধ্যমে প্রায়োগিক পুলিশিং-এ সহযোগিতা করবে। উক্ত সেন্টার থেকে নিম্নোক্ত কোর্সগুলো সম্পর্কিত ডিগ্রি প্রদান করা হবে:

- Police Leadership and Management (পুলিশ নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা)
- National Security / Security Management (জাতীয় নিরাপত্তা/নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা)
- Cyber Security (সাইবার নিরাপত্তা)

পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে একটি বিশেষায়িত উদ্যোগের সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে নতুন এবং বিশেষায়িত জ্ঞান সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ : Turkish National Police Academy, Centre for Higher Studies and Research, Bangladesh University of Professionals, Research for Equitable Access and learning Centre, University of Cambridge, Centre for Socio-Legal Studies , University of oxford, and Sussex Center for Global Insecurities Research (CGI), University of Sussex প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান সৃষ্টি করে চলছে।

সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হলে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশের চলমান মাস্টার্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ সেন্টারের অধীনে পরিচালিত হবে। অধিকন্তু, উক্ত সেন্টারের অধীনে পিএইচডি প্রোগাম চালু করা হবে। পিএইচডি চালুকরণ প্রসঙ্গে সমজাতীয় সেন্টারে এবং প্রতিষ্ঠান প্রচলিত নীতি ও প্রথা অনুসরণ করা হবে। সেন্টারে একাডেমিক এবং গবেষণার অগ্রগণ্য ক্ষেত্রেগুলো নিম্নরূপ হবে:

- Beat Policing/Community Policing (বিট পুলিশিং/কমিউনিটি পুলিশিং)
- Crime prevention and Security management (অপরাধ নিবারণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা)
- Evidence based Policing (প্রমাণ ভিত্তিক পুলিশিং)
- Cyber Crime investigation (সাইবার অপরাধ তদন্ত)
- Digital Forensic investigation (ডিজিটাল ফরেনসিক তদন্ত)
- Forensic Computer Investigation (ফরেনসিক কম্পিউটার তদন্ত)

উপযুক্ত সেন্টার থেকে অপরাধ হ্রাসকরণ এবং জনগণের নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত মাল্টিডিসিপ্লিনারি প্রমাণ ভিত্তিক এবং প্রাসঙ্গিক নীতি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো (এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়) অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

- Peace, Conflicts and Human rights (শান্তি, সংঘর্ষ এবং মানবাধিকার)
- Illicit drugs (অবৈধ মাদকদ্রব্য)
- Human trafficking and Organized Crime (মানব পাচার এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ)
- Violence against women and children (নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা)
- Economic Crime/financial Crime (অর্থনৈতিক অপরাধ)
- Youth Crime and offending (কিশোর অপরাধ এবং আইন লঙ্ঘন)

পুলিশসহ যে কোনো পেশার যে কোনো দেশের নাগরিক এ সেন্টারে অধ্যয়ন করতে পারবে।

কমিশনের মতামত:

প্রস্তাবিত Cnetre for Police Research and Development (CPRD) গঠন এবং প্রতিষ্ঠায় এই কমিশন নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। প্রাথমিকভাবে জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পুলিশ স্টাফ কলেজ ও পুলিশ একাডেমির সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালিত হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বাজেট প্রাপ্তি অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.১৯। অবকাঠামো উন্নয়ন:

নবসৃষ্ট ইউনিটসমূহের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ:

আধুনিক পুলিশিং সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে পুলিশের জন্য একটি জনবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশিং-এর ধ্যান-ধারণা হতে বের হয়ে আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশিং সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সকল পুলিশ ইউনিটের জন্য নিজস্ব ভূমির বন্দোবস্তকরণসহ আধুনিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ ও বর্তমানের সাইবার সিকিউরিটিসহ নিত্যনতুন পুলিশিং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে পুলিশের নবসৃষ্ট ইউনিট যেমন: শিল্প পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, নৌ পুলিশ, পিবিআইসহ পুলিশের সকল ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক ও পর্যাপ্ত ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

বিদ্যমান থানার অবকাঠামোগত পরীক্ষণ ও অধিকতর উন্নয়ন/সম্প্রসারণ:

- কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন পরিদর্শন, মতবিনিময় ও বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এ বিষয়ে একমত পোষণ করছে যে, পুলিশ বাহিনীতে অপেক্ষাকৃত নিচের গ্রেডের পুলিশ সদস্যদের আবাসন সংকট অত্যন্ত প্রকট। কনস্টেবলসহ সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) এবং ইন্সপেক্টরদের বাসস্থানের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢাকার রাজারবাগসহ দেশের সকল জেলা পুলিশ লাইন্স এবং থানায় নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের জন্য আলাদা ডরমেটরি/বাসস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। অবকাঠামো নির্মাণে এ কমিশন গুরুত্বারোপ করছে।

- বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মূল কেন্দ্র হচ্ছে থানা এবং বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকীকরণ মূলত থানার অবকাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আশি ও নব্বই এর দশকে পুরাতন ও জরাজীর্ণ থানা ভবনগুলোর মধ্যে থেকে কিছু থানা ভবন নতুন করে নির্মাণ করা হয়। ক্রমবর্ধমান জনগণের চাহিদা ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ধরন পরিবর্তনের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের তাগিদে থানার কর্মপরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং থানাভিত্তিক পুলিশ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থায় প্রতিটি থানার নিম্নোক্ত কার্যক্রম নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে যেমন- বিট পুলিশিং ও কমিউনিটি পুলিশিং, সার্ভিস ডেলিভারি ডেস্ক, মহিলা ও শিশু হেল্প ডেস্ক, ওপেন হাউস ডে, কম্পিউটার ও আইটি সার্ভিস, পুরুষ, মহিলা, ছেলে মেয়েদের পৃথক লক আপের ব্যবস্থা (মোট ৪টি), ব্রিফিং রুম, নারী পুরুষ সদস্যের পৃথক ব্যারাক কক্ষ। বিদ্যমান থানা ভবনগুলো স্বল্প আয়তনের হওয়ায় উক্ত কার্যক্রম অনেক থানাতেই পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুরাতন ৩৫৩টি থানাসমূহকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থায় আনায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান থানা ভবনসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে। বিদ্যমান থানা, তদন্তকেন্দ্র, ফাঁড়ি/পুলিশ ক্যাম্পের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করণ।

কারাগারের নিরাপত্তা ও পুলিশ লাইন্সের সমন্বয়

১৯ জুলাই ২০২৪ সালে একযোগে নরসিংদী সাব-জেলসহ সারা দেশে ১৭টি জেলখানায় আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে ৫টি কারাগার থেকে বন্দিরা পালিয়ে যায়, এবং শেরপুর ও নরসিংদী কারাগার সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। নরসিংদী জেলের প্রতিনিধিদের মতে, জেলরক্ষীরা পাগলা ঘণ্টির শব্দ শুনে জেল অভ্যন্তরে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হলেও জেলের বাইরে কোনো ঘটনা ঘটলে স্থানীয় পুলিশ তা দ্রুত মোকাবিলা করতে পারেনি। কারণ, সাব-জেলটি স্থানীয় থানা ও পুলিশ লাইন্সের দূরত্বে অবস্থিত।

একই সময়ে জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য সরকারি স্থাপনাগুলোও আক্রমণের শিকার হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং ফৌজদারি বিচার প্রশাসন, জেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার সুপারিশ করা যায়। বিশেষত, পুলিশ লাইন্স ও কারাগারের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এতে জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হবে, কারাগারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, এবং জননিরাপত্তা আরও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সুপারিশ: কারাগারের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামীতে নতুন কারাগার ও পুলিশ লাইন্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব যথাসম্ভব কম রাখতে হবে, যাতে একটি সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়। এক্ষেত্রে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা জরুরি।

৬.২০। সার্ভিস ডেলিভারি উন্নয়ন/সম্প্রসারণ:

Police BOT:

পুলিশ বট বা পুলিশিং কার্যক্রমে হিউম্যানয়েড রোবট-এর ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও পুলিশিং কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ বট নানামুখী পুলিশিং কার্যক্রমে যুক্ত। সুতরাং সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পুলিশ বট-এর অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশি সার্ভিলেন্স ও বোম ডিসপোজালের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পুলিশ **BOT চালু করা যেতে পারে।**

৬.২১। ভবিষ্যৎ টেক পুলিশি:

বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে পুলিশিং কার্যক্রমের যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক পুলিশিং প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অপরাধ প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, পুলিশ মবিলিটি, আইডেন্টিফিকেশন ও ট্রেসিং, জনসম্পৃক্ততা এবং কমিউনিটি আউটরিচের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশে যুগোপযোগী সংস্কার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, যা জননিরাপত্তা উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বর্তমান পুলিশি তদন্তের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রমাণভিত্তিক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে আরও দ্রুততম সময়ে অপরাধী শনাক্তকরণ, অপরাধী আটক এবং যথাযথভাবে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। এসকল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ফরেনসিক এবং ডিএনএ অ্যানালাইসিস, বায়োমেট্রিক ভিত্তিক, ডাটাভিত্তিক, এ.আই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ভিত্তিক এবং সাইবার অপরাধ ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ পুলিশে প্রচলন করা যেত পারে। এসকল প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ পুলিশকে ভবিষ্যৎমুখী ও আধুনিক করা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রযুক্তির যথাযথ ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এতদসংক্রান্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ পুলিশ জনবল গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

৬.২২। বাংলাদেশ পুলিশের জন্য আইসিটি ও টেক কোর গঠন:

প্রায় ২,১৪,০০০ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিশাল জনবহুল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে। পুলিশের প্রায় ২০টি বিশেষায়িত সংস্থা, ৪১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ হাসপাতাল, বিভিন্ন ইউনিট মিলিয়ে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কাজকর্ম ও সরঞ্জামাদি ক্রয়, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর দক্ষ ও আইসিটি বিষয়ে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল প্রয়োজন। এই কারিগরি ও প্রকৌশল

নির্ভর জনবলকে একটি সমন্বিত পরিচালন ব্যবস্থার আওতায় আনা গেলে কাজকর্মের উৎকর্ষতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনোলজির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সেগুলোর যৌক্তিক ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে সারা বিশ্বই একটি সাইবার ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ঝুঁকি থেকে পুলিশ বাহিনীর কৌশল, কার্যক্রম ও পরিকল্পনার নিরাপত্তা বিধানও একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বাহিনীতে একটি সমন্বিত আইসিটি কোর গঠন করার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

আইসিটি ও টেক কোরের স্বরূপ: আইসিটি ও টেক কোর একটি ক্যারিয়ার সার্ভিস হবে। পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত আইসিটি ও কৌশল নির্ভর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই কোরের সদস্য হবে। তাদের পুলিশের পোশাক ও র‍্যাংক ব্যাচ দেওয়াও সমীচীন হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

আইসিটি ও টেক কোরে নিম্নরূপ সাব-ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।

ক। সাইবার থ্রেট/ ক্রাইম প্রিভেনশন ইউনিট গঠন করা

ডিজিটাল নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অপরাধী শনাক্তে আইসিটি জনবলদের দিয়ে এথিক্যাল হ্যাকিং টুলস/ সফটওয়্যারগুলো আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান থাকার সহায়তায় বিগ ডেটা আনাল্যাটিকাল টুল, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ফেক নিউজ ডিটেকটর ইত্যাদি টুলস/ সফটওয়্যারের মতো আরও বিশেষায়িত সফটওয়্যারগুলো অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে চালনা করা সম্ভব।

খ। ডিজিটাল ফরেন্সিক ইউনিট গঠন করা

কম্পিউটার, স্মার্টফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে উন্নত ফরেনসিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। আদালতে সাইবার অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে এই প্রমাণটি গুরুত্বপূরণ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞান থাকার কারণে আইসিটি ইঞ্জিনিয়ারগণ এসকল উন্নত ফরেনসিক সরঞ্জাম অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে চালনা করতে পারবে।

গ। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট গঠন করা

বাংলাদেশ পুলিশে সময়ের চাহিদার কারণে অনেক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এসকল সফটওয়্যার ভেন্ডর-এর মাধ্যমে অনেক বেশি মূল্যে ক্রয় করতে হয়। পাশাপাশি ভেন্ডর-এর মাধ্যমে এসকল সফটওয়্যার মেইনটেইন্যান্স করা অনিরাপদ। একারণে আইসিটি জনবল দ্বারা সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপ ও মেইনটেইন্যান্স করা হলে অর্থের সাশ্রয়ের পাশাপাশি ডেটা নিরাপত্তা ও নিশ্চিত হবে। ক্ষেত্রবিশেষে যদি সফটওয়্যার ক্রয় করতে হয় তবে এই ইউনিটের সার্বিক সহযোগিতায় ক্রয় করতে হবে।

ঘ। হার্ডওয়্যার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক মনিটরিং ইউনিট গঠন করা

নিজস্ব আইসিটি জনবল দ্বারা হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে নিরাপত্তার পাশাপাশি গতিশীলতা ও বৃদ্ধি পাবে এবং পাশাপাশি অর্থের সাশ্রয় হবে। ভবিষ্যতে টেক পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে যেসব যন্ত্রপাতি, সার্ভারসহ অন্যান্য আইটি ইকুইপম্যান্ট ক্রয় করা হবে, তা এই ইউনিটের সার্বিক সহযোগিতায় ক্রয় করতে হবে।

এসব ইউনিটের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল পারস্পরিক বদলির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ একটি ক্যারিয়ার সার্ভিস গঠন করবে, যা আইসিটি সার্ভিস কোর নামকরণ করা যেতে পারে। এই পরিবর্তনগুলোর প্রত্যাশিত ফলাফল প্রযুক্তিনির্ভর কর্মীদের জন্য একটি উন্নত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এভাবে তাদের দক্ষতার জন্য যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হলে পুলিশ বাহিনী আরও যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রযুক্তিগত পেশাদারদের যোগদান করতে উৎসাহিত করবে। সর্বোপরি এতে পুলিশের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আরও স্বচ্ছ ও শক্তিশালী হবে।

৬.২৩। প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন:

পুলিশকে সব ধরনের অবৈধ প্রভাবমুক্ত রেখে নিরপেক্ষ ও আইনানুগ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য একটি 'পুলিশ কমিশন' গঠনের বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব পাওয়া যায়। পুলিশ বাহিনীর পক্ষ হতে বিভিন্ন সময়ে 'পুলিশ কমিশন', 'জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন' ইত্যাদি শিরোনামে প্রস্তাব প্রেরিত হয়। ২১/১০/২০২৪ইং তারিখে 'পুলিশ অর্ডিন্যান্স ২০০৭' শিরোনামে একটি অধ্যাদেশের খসড়া পুলিশ সদর দপ্তর হতে পাওয়া যায়, যা ২০০৭ সালের পুরানো অধ্যাদেশের খসড়ার উপরে ভিত্তি করে প্রণীত একটি সংশোধিত ভার্সন। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার খসড়া অধ্যাদেশটি অনুমোদন করেনি এবং পরবর্তী সরকারও উক্ত বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সর্বশেষ ২৪/১২/২০২৪ তারিখে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে "পুলিশ কমিশন" শিরোনামে পুনরায় একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। (পুলিশ সদর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রস্তাবাদি **সংলগ্নী ৭,৮** দেখা যেতে পারে)

উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন গঠন নিয়ে ভিন্নমত জানিয়েছে। **(সংলগ্নি ৯ দ্রষ্টব্য)**।

সংস্কার কমিশনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি তরুণ সমাজের পক্ষ থেকে পুলিশের জন্য পৃথক একটি কমিশন গঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সামগ্রিক বিষয় ধর্তব্যে নিয়ে পুলিশ সংস্কার কমিশন একটি নিরপেক্ষ প্রভাবমুক্ত 'পুলিশ কমিশন' গঠনের বিষয়ে নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে নাকি সাংবিধানিক কাঠামোভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হবে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, পুলিশ কমিশনের গঠন, কার্যপরিধি, সাংবিধানিক বা আইনি বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি বিষয়াদি আরও বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৬.২৪। মহিলা পুলিশসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:

বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীকে জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ সংক্রান্তে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক সেবা প্রদানের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ পুলিশে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। অধিকন্তু বাংলাদেশ পুলিশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায় এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ও কর্মক্ষেত্রে নারী সদস্যদের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ১৬,৮০১ জন যা বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবলের শতকরা ৮.৭৭%।

জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পুলিশের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পদায়ন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(ক) দেশের অভ্যন্তরে সেবার ক্ষেত্রে –

- **বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী সদস্যের পরিসংখ্যান**

বাংলাদেশ পুলিশে নারী সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের পদচারণা নিশ্চিত করে চলছে দেশের নারী পুলিশ সদস্যরা। আধুনিক জেন্ডার সমতা ভিত্তিক পুলিশ বাহিনী গঠনে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী-পুরুষ সদস্যদের সমতা, ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে জনগণের

নিরাপত্তা ও সেবা সুসংহত হবে। এ দেশের জেন্ডার সংবেদনশীল পুলিশিং নিশ্চিত করতে নারী পুলিশ সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী সদস্যের সংখ্যা:

ক্রমিক	পদের নাম	কর্মরত সংখ্যা (জন)
১.	ডিআইজি	০৬
২.	অ্যাডিশনাল ডিআইজি	৩৮
৩.	এসপি	৭৫
৪.	অ্যাডিশনাল এসপি	১১১
৫.	এএসপি	৭০
৬.	এএসপি (শিক্ষানবিশ)	০৪
৭.	ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)	১৩০
৮.	এসআই (নিরস্ত্র)	৯৪৫
৯.	সার্জেন্ট (শিক্ষানবিশ)	৩৬
১০.	সার্জেন্ট	৫৮
১১.	এএসআই (নিরস্ত্র)	১১৬৯
১২.	এটিএসআই	০৭
১৩.	এএসআই (সশস্ত্র)	১১৭
১৪.	নায়েক	৪১৪
১৫.	কনস্টেবল	১৩৬২১
	মোট জনবল	**১৬৮০১ জন**

বাংলাদেশ পুলিশের যে সকল ইউনিটে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ একান্ত প্রয়োজন:

ক্রম	ইউনিটের নাম	কর্মরত নারী পুলিশের সংখ্যা	কাঙ্ক্ষিত নারী পুলিশের সংখ্যা	নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন
১.	নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক (প্রতিটি থানায় ৩ শিফটে ১ জন করে এসআই ৩ জন করে কনস্টেবল)	৭১৫	৭,৯৬৮	৭,৮১২
২.	ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার [৬৪ টি]	১৫৬	১৯২০	১৭৬৪
৩.	পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন	১৬	১৬০	১৪৪
৪.	৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবা	৪৬	১০০	৫৪
৫.	সকল পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	২০৬	৩০৬	১০০
৬.	সকল মেট্রোপলিটন (৮টি) [বিশেষ করে ট্রাফিক, প্রটেকশন]	৪,৭২০	৬,২২০	১৫০০
৭.	সকল রেঞ্জ (৮টি)	৮,৭৭৩	১০,২৭৩	১৫০০
৮.	এসবি [ইমিগ্রেশন, প্রটেকশন এন্ড প্রটোকল]	৪৫৮	৫৫৮	১০০
৯.	এপিবিএন	৪০৪	৬০৪	২০০
১০.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ	৩৩৯	৮৩৯	৫০০

ক্রম	ইউনিটের নাম	কর্মরত নারী পুলিশের সংখ্যা	কাঙ্ক্ষিত নারী পুলিশের সংখ্যা	নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন
১১.	ট্যুরিস্ট পুলিশ	১২২	২২২	১০০
১২.	অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট	৩৮	৭৮	৪০
		মোট=	২৯,২৪৮/-	১৩,৮১৪/-

বর্তমান নারী পুলিশের সংখ্যা	কাঙ্ক্ষিত নারী পুলিশের সংখ্যা	নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন
১৬,৮০১	২৯,২৪৮/-	১৩,৮১৪/-

এছাড়াও ভবিষ্যতে বাংলাদেশ পুলিশের জনসেবার ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নতুন উদ্ভাবনী কার্যক্রমে যথেষ্ট সংখ্যক নারী পুলিশ সদস্য প্রয়োজন হবে।

- পুলিশের অর্গানোগ্রামে পদ না থাকলে অবিলম্বে পদ সৃষ্টি করতে হবে।
- জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ নারী পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা ও শাহবাগ থানায় পৃথক প্রবেশ ও বাহির পথসহ নারী ও শিশু হেল্পডেস্ক চালু করা যেতে পারে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি থানায় র‍্যাম্প (ramp) তৈরি করতে হবে।
- সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ-এ পারদর্শী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণীতে নারী পুলিশের অংশগ্রহণ**

প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় জেন্ডার ইস্যুকে সমন্বিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনবান্ধব পুলিশিং-এর জন্য প্রয়োজন জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও জেন্ডার সমতা। তাই সে লক্ষ্য অর্জনে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সর্বোপরি নারীর কল্যাণ নিশ্চিত করা জরুরি। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে সর্বোচ্চ ডিআইজি পদমর্যাদার নারী পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্বরত আছেন। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ অন্যান্য পুলিশ ইউনিটে নারী পুলিশ কর্মকর্তারা নীতি নির্ধারণীতে ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে ৩টি জেলায় নারী পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানের ২টি ব্যাটালিয়ান নেতৃত্ব দিচ্ছেন নারী পুলিশ কর্মকর্তা। অন্যদিকে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কোনো নারী পুলিশ পরিদর্শক কর্মরত নেই। বাংলাদেশ পুলিশকে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণীতে আরও নারী পুলিশের অংশগ্রহণ কাম্য।

- **বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)**

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন) ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নারী পুলিশের দক্ষতা ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার সকলকে একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্তির মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন ও নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের উন্নয়নেও সংগঠনটি কাজ করছে। বাংলাদেশ পুলিশে নারী পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ বজায় রাখা, জেন্ডার সংবেদনশীল পুলিশিং নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাস এর সঙ্গে কার্য সম্পাদন করার জন্য এ নেটওয়ার্ক কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশের সকল নারী পুলিশ সদস্য এ নেটওয়ার্কের সদস্য।

(খ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে-

- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ**

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ পুলিশের নারী পুলিশ সদস্যরা অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে। শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি নেতৃত্ব স্থানীয় দেশ হিসেবে বিবেচিত। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয় নারী পুলিশ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছিল। বর্তমানে ১১৩ জন নারী-পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে। এ পর্যন্ত মোট ১৮৮৪ জন নারী পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইউএন রেগুলেশন্স ১৩২৫ (২০০০) নারীদের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের প্রস্তাবনা অনুসারে, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘে নারী পুলিশ সদস্য সংখ্যা করতে হবে ২৫% এবং ২০২৮ সালের মধ্যে নারী পুলিশ সদস্য সংখ্যা করতে হবে ৩০%। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ পুলিশকে জাতিসংঘে কাঙ্ক্ষিত অবস্থান ধরে রাখতে নারী পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী পুলিশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬.২৫। জেন্ডার ও শিশুবান্ধব পুলিশিং:

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও, দেশের অনেক নারী, কিশোর-কিশোরী, এবং শিশু (পুরুষ ও মহিলা) এখনও নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকারের সহিংসতার শিকার হন। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার [Gender-based violence (GBV)] সকল ধরনের ঘটনা সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থি। বাংলাদেশ সিডও [Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)], সিআরসি [Convention on the Rights of the Child (CRC)], এবং দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এবং International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)-সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশীদার। সহিংসতা দমন ও প্রতিরোধে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য আইন- ১৮৬০ সালের পেনাল কোড; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২।

কঠোর শাস্তিমূলক আইন ও বিভিন্ন নীতি সত্ত্বেও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। উপরন্তু লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় আইন থাকা সত্ত্বেও অনেক ভুক্তভোগী এবং সহিংসতার শিকার নারী এবং শিশুরা ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আইন ব্যবস্থার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারেনা।

একটি দেশে যেখানে জনগণ লিঙ্গ বা যৌন ভিত্তিতে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা নারীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একারণে আইন প্রয়োগে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। নারীদের পুলিশ বাহিনীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতি অনুসরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণবান্ধব এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশিং সেবা নিশ্চিত করতে লিঙ্গ সংবেদনশীল পুলিশিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ:

১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনীতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এখনও নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। বর্তমানে পুলিশ বাহিনীতে নারীর সংখ্যা ১৬,৮০১, যা মোট সদস্যের মাত্র ৮.৭৭% (৬.২৪ নং অনুচ্ছেদে পূর্বে উল্লিখিত)। নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবিলায় লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতি কার্যকর করার জন্য পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী পুলিশ নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ:

অধিকাংশ পুলিশ স্টেশনে (মোট ৬৫৯টি) নারী, শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা/সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। তবে, নারী পুলিশ কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে এই ডেস্কগুলোতে ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান সম্ভব হয় না। ২০১১ সালে ঢাকা মহানগর পুলিশ একটি পৃথক নারী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, যার নাম **উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন**। এই ডিভিশনটি তিনটি ইউনিটের মাধ্যমে কাজ করছে:

- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (বর্তমানে ৮টি কেন্দ্র),
- তদন্ত ইউনিট,
- দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল (QRT)।

হাইকোর্টের নির্দেশনা:

২০১৫ সালে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ মামলা যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ১৮টি নির্দেশনা প্রদান করে [Naripokkho and Others vs. Bangladesh and Others; 10 SCOB [2018] HCD)] নির্দেশনাগুলোর নিম্নরূপ:

1) Every information relating to commission of cognizable offence including rape, sexual assault or like nature shall immediately be reduced to writing by the officer-in charge of a police station irrespective of the place of occurrence without any discrimination whatsoever and without causing any delay.
2) Also, a designated website should be opened enabling the informant to register his/her complaint online.
3) The statute should contain specific provision dealing with refusal or failure of the officer concern of the respective police station without sufficient cause to register such cases.
4) Every police station must have round the clock a female police officer not below the rank of a Constable. On receipt of the information of the offence of rape or sexual assault the duty officer recording the information shall call the female police officer present at the police station and make the victim and her family members comfortable.
5) At all stages the identity of the victim should be kept confidential.
6) To keep a list of female social workers who may be of assistance at all police stations.
7) The statements of the victim should be recorded in the presence of a lawyer or friend nominated by her, or a social worker or protection officer.
8) The victim should be made aware of her right to protection from the State and to give any information she requests on the matter.
9) The duty officer immediately upon receipt of the information shall inform the Victim Support Centre.
10) Interpretation services should be provided where necessary especially for women or girls with disabilities who are victims of rape or sexual assault.

11) After reducing the information into writing, the Investigating Officer along with the female police official available, shall escort the victim for medical examination without causing delay.
12) The Victim Support Centre should be discreet and should at all times have all the facilities required for the recovery of the victim.
13) In all rape cases or cases of sexual assault chemical/DNA tests are required to be conducted mandatorily.
14) The DNA and other samples should be sent to the concerned Forensic Science Lab or DNA Profiling Centres with 48(forty-eight) hours of the alleged occurrence. 15) Any failure of duty on the part of the investigating agency in collecting the report or causing the victim to be taken to the nearest hospital for medical examination would be punishable offence. 16) The investigating officer shall endeavour to complete the investigation at an earliest.
17) There should be wider dissemination of the national line number on violence against women, girls or children namely 10921 through visual, audio as well as in the print media including designated websites.
18) In addition to the above, to establish an office in every Metropolitan City for the purpose of providing necessary security, medical, chemical and counselling assistance and secured protection for the victim.

চ্যালেঞ্জ ও পদক্ষেপ:

সমাজে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় পুলিশিং ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশে নারী পুলিশ কর্মকর্তার স্বল্পতা নারীদের সহায়তা ডেস্কের কার্যক্রম সীমিত করে। অনেক নারী-পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তা নিতে অস্বস্তি বোধ করেন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় United Nations Population Fund (UNFPA) সহায়তায় পুলিশ সদস্যদের জন্য Standard Operating Procedure (SOP) তৈরি করা হয়েছে, যা নারীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ শেখায়।

জেন্ডার-বৈষম্য দূর করে জেন্ডার সমতা ও সংবেদনশীলতা ভিত্তিক সমাজ গঠন করা একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে নারী। ন্যায্যতা বিধানের মাধ্যমে এ বিপুল জনগোষ্ঠীর সকল ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সকল জনগণের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয় লাভের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে ও নারীদের সুরক্ষার জন্য অনেক আইন ও পলিসি প্রণয়ন করেছে এবং সে সঙ্গে অনুসরণ করছে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের নিমিত্ত প্রণীত কিছু আন্তর্জাতিক সনদ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নকারী একটি রাষ্ট্র। SDG এর 'লক্ষ্য ৫: জেন্ডার ইকুয়ালিটি' অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে জেন্ডার ইক্যুইটির (জেন্ডার ন্যায্যতা) মাধ্যমে জেন্ডার ইকুয়ালিটি (জেন্ডার সমতা) আনয়ন করাই মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ পুলিশে জেন্ডার এবং শিশু সংবেদনশীল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

- **নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক**

২০২০ সাল থেকে ৬৬৪ থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের আইনি সেবা নিশ্চিত করতে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়।

১। অনেক নারী ও শিশু যৌন বা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হলে সামাজিক বাধা ও লোকলজ্জার ভয়ে থানায় অভিযোগ করতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু ভুক্তভোগীরা নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী হেল্পডেস্কে সামাজিক বাধা ও লজ্জা কাটিয়ে নির্ভয়ে সমস্যার কথা জানাতে পারে।
২। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে মাত্র ৯৪৮ নারী সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত। ২৪ ঘণ্টা নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের আইনি সেবা নিশ্চিত করতে (৬৬৪ × ৩) = ১৯৯২ জন নারী সাব-ইন্সপেক্টর প্রয়োজন।
উদাহরণ: উত্তরা বিভাগের ৬ থানায় প্রয়োজন ১৮ জন, কর্মরত মাত্র ৪ জন। এছাড়া নারী সাব-ইন্সপেক্টরদের হেল্পডেস্কের পাশাপাশি তদন্ত, পেট্রোলিং এবং অপমৃত্যু মামলার দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে মূল কাজ ব্যাহত হয়।
৩। নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের হেল্পডেস্কে প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হয় যার জন্য কোনো বাজেট বা বরাদ্দ থাকে না। তাই এ বিষয়ে বরাদ্দ প্রয়োজন।

৪। হেল্পডেস্কে আসা নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সেবা নিশ্চিত করতে থানা ভবন বা ইউনিটে কর্মরত নারীদের স্বতন্ত্র আবাসন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তাই আবাসন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে।

- **ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার**

নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা করার নিমিত্ত দেশব্যাপী স্থাপিত হয়েছে ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত এ কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন অপরাধের শিকার নারী ও শিশুদের আইনি সহায়তা/সেবা, আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং নিখোঁজ শিশুদের আশ্রয় দেওয়াসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকে। নারী ও শিশুদের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রগুলো সম্পূর্ণভাবে নারী পুলিশ সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমানে নারী পুলিশ সদস্যের অপর্যাপ্ততার কারণে এ সেন্টারগুলো প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে চাহিত নারী পুলিশ সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ অত্যন্ত জরুরি। দেশের ০৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে সর্বমোট ১৫৬ জন নারী পুলিশ সদস্য কর্মরত আছে। নারী ও শিশুদের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাঙ্ক্ষিত সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য রোটেশনে ডিউটি করা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে বর্তমানে কমপক্ষে ২৩৪ জন্য নারী পুলিশ সদস্য প্রয়োজন।

- **পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন**

সাইবার স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক চালু হয়েছে 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ। সাইবার অপরাধের শিকার নারীরা এ পেইজের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে মেয়ে শিশুদের অনেক অভিযোগ এ পেইজে ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। এ সেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নারী পুলিশ সদস্য। এ সেবার জন্য রেঞ্জ/জেলা/থানা পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে সাংগঠনিক সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এ ফেইসবুক পেইজটি তদারকি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় যেখানে বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৬ জন নারী পুলিশ সদস্য কর্মরত আছে। সাইবার স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৮টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ৮টি রেঞ্জ কর্তৃক এ কার্যক্রম তদারকি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দেশব্যাপী এ সেবা নিশ্চিত করতে সাংগঠনিক সংস্কারসহ কমপক্ষে ১০০ জন নারী পুলিশ সদস্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- **৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবা**

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯ জরুরি প্রয়োজনে জনগণের কাছে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবা সহজলভ্য করতে অসামান্য অবদান রাখছে। ৯৯৯ সেবা চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০ মিলিয়নেরও বেশি কল রিসিভ করেছে। এ সকল কলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কল নারী ও শিশুবান্ধব সেবা যেমন- বাল্যবিবাহ রোধকরণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারসহ অনেক সেবা বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবা কর্মরত নারী

পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ৪৬ জন। এক্ষেত্রে দেশব্যাপী এ সেবা নিশ্চিত করতে সাংগঠনিক সংস্কারসহ কমপক্ষে ১০০ জন নারী পুলিশ সদস্য প্রয়োজন। উল্লেখ্য জাতীয় জরুরি সেবা প্রার্থীদের মধ্যে বিশেষ করে নারী ও শিশু সেবাপ্রার্থীদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য নারী পুলিশ সদস্য বিশেষ প্রয়োজন। নির্যাতনের শিকার ও অন্যান্য বিপদগ্রস্ত নারী ও শিশু সেবাপ্রার্থীরা অভিযোগ করার ক্ষেত্রে নারী পুলিশ সদস্যদের কাছে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে।

এছাড়াও ভবিষ্যতে বাংলাদেশ পুলিশের জনসেবার ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নতুন উদ্ভাবনী কার্যক্রমে যথেষ্ট সংখ্যক নারী পুলিশ সদস্য প্রয়োজন হবে।

শিশু সুরক্ষা:

বাংলাদেশের শিশুদের একটি বিশাল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দরিদ্রতা, যত্নের অভাব এবং বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকারের নির্যাতন ও সহিংসতার মধ্যে বিপন্ন জীবনযাপন করে। বাড়ির বাহিরে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভেতরেও, তারা হুমকির সম্মুখীন। তাই বাংলাদেশের শিশুদের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। এই সমস্যা সমাধানে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষ। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (ইউএনসিআরসি), যা বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে অনুসমর্থন করে। সরকার ২০১১ সালে 'জাতীয় শিশু নীতি' প্রণয়ন করে। শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে উক্ত নীতিমালায় বর্ণিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়:

- সকল প্রকার সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি এবং শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও তাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধে কার্যকর জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিচারিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা হবে;
- শিশুদের মাদক সেবন থেকে বিরত রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ এবং আসক্তদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে না বা তাদের উক্ত কর্মকাণ্ডে প্রলুব্ধ ও বাধ্য করা যাবে না।

শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দেশে বর্তমানে বেশকিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে। উক্ত আইনগুলোর মধ্যে কিছু আইন মহিলা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৯৭৪ সনের শিশু আইন রহিত করে 'শিশু আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে ১৮ বছরের নিচের সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য আইনটিতে বিশেষ ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিশু আইন, ২০১৩ এর অধীনে পুলিশ/শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার উল্লেখযোগ্য দায়-দায়িত্ব:

- প্রতিটি থানায় একটি শিশু বিষয়ক ডেস্ক থাকবে, যার দায়িত্বে থাকবেন অন্যূন সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা নামে অভিহিত হবেন; তবে থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকলে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, তিনি উক্ত ডেস্ক এর দায়িত্বে থাকবেন।
- শিশুবিষয়ক মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
- কোন শিশু থানায় এলে বা শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলে, শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা,-
    - প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;

- শিশুর মাতা-পিতা অথবা, তাদের অবর্তমানে, শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করবেন এবং বিস্তারিত তথ্যসহ আদালতে হাজির করার তারিখ জ্ঞাত করবেন; তবে কোনো কারণে অবহিত করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট শিশুকে আদালতে হাজির করার প্রথম দিবসে উক্ত বিধান অনুসরণ না করার কারণ সংবলিত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করতে হবে;
- শিশুকে তাৎক্ষণিক মানসিক পরিষেবা প্রদান করবেন; শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রয়োজনে, ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করবেন এবং শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হচ্ছে কি না বা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হচ্ছে কি না তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।
- প্রবেশন কর্মকর্তার সঙ্গে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক, আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে, বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিকল্পপন্থা (diversion) অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা করবেন।
- কোন শিশুকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে মুক্তি প্রদান বা বিকল্প পন্থায় প্রেরণ অথবা তাৎক্ষণিকভাবে আদালতে হাজির করা সম্ভবপর না হলে, শিশুটিকে, ক্ষেত্রমত, তার মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে, জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য যে কোনো অপরাধে, শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে, অথবা, শর্ত ও জামানত ব্যতীত জামিনে মুক্তি প্রদান করতে পারবেন।
- বিকল্পপন্থা অবলম্বন বা কোনো কারণে শিশুকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে, আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে তাকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।
- প্রতি মাসে শিশু সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট-এর মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ও, ক্ষেত্রমত, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।
- কোনো অপরাধ সংঘটনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু জড়িত থাকলে, পুলিশ রিপোর্ট (জি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা ক্ষেত্রমত, অনুসন্ধান প্রতিবেদন (সি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করে দাখিল করবেন।
- প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু কর্তৃক একত্রে সংঘটিত কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অপরাধ পৃথকভাবে আমলে গ্রহণ করতে হবে।
- কোনো শিশুকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত কোনো আইনের অধীনে গ্রেপ্তার বা আটক করা যাবে না, এবং ৯ (নয়) বৎসরের নিম্নের কোনো শিশুকে কোনো অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করা বা, ক্ষেত্রমত, আটক রাখা যাবে না।
- কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো শিশুকে গ্রেপ্তার করা হলে গ্রেপ্তারের কারণ, স্থান, অভিযোগের বিষয়বস্তু, ইত্যাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং প্রাথমিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করে নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন।
- গ্রেপ্তার করার পর কোনো শিশুকে হাতকড়া বা কোমরে দড়ি বা রশি লাগানো যাবে না।
- থানায় শিশুর জন্য উপযোগী কোনো নিরাপদ স্থান না থাকলে গ্রেপ্তারের পর হতে আদালতে হাজির না করার সময় পর্যন্ত শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিরাপদ স্থানে আটক রাখার ক্ষেত্রে শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক বা ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এরূপ কোনো শিশু বা অপরাধী এবং আইনের সংস্পর্শে আসা কোনো শিশুর সঙ্গে একত্রে রাখা যাবে না।

- শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, শিশুবান্ধব পরিবেশে, শিশুর জবানবন্দি গ্রহণ করবেন; তবে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।
- কোনো পুলিশ কর্মকর্তা সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদ্সংক্রান্ত কোনো সংবাদপ্রাপ্ত হলে, উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন এবং শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে অধিদপ্তর বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে নিরাপদ করা অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ আন্তর্জাতিক চাইল্ড প্রটেকশন স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আইনটির পরিপূর্ণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এর সুফল লাভ হতে শিশুরা, সর্বোপরি রাষ্ট্র বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই শিশুরা যাতে নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে বেড়ে উঠে আগামী দিনের কর্ণধার হয়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্যে পুলিশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্তৃপক্ষকে শিশু আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

<u>সুপারিশ:</u>

- বিভিন্ন পর্যায়ে যে হটলাইন নম্বরগুলো আছে সেগুলোর তৎপরতা ও কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলাকেন্দ্রিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড যেমন: Victim Support Centre সহ Women Support and Investigation Division এবং Police Cyber Support for women ৬৪ জেলায় স্থাপন করতে হবে।
- শিশু অধিকার ও শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পুলিশের মধ্যে জেন্ডার ও চিলড্রেন সেনসিটিভিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। বিবেচ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহে যেসকল বিধিবিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৬.২৬। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে পুলিশিং:

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এদেশের অসংখ্য নদনদী বিধৌত অধিকাংশ এলাকায় সমতল ভূমি। শতকরা ০৯% পার্বত্য এলাকা এবং দুর্গমও বটে। এলাকাভেদে পুলিশি কার্যক্রমেরও ভিন্নতা রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্রিটিশ আমল থেকেই পার্বত্য অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সমতল ভূমির তুলনায় ভিন্নতর অন্যদিকে অসংখ্য নদীপথ ও নদনদীর মোহনার কারণে অপরাধপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ নৌ-পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

বরিশাল, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, খুলনা, ভোলা এলাকায় জলপথমণ্ডিত মোট ২৪১৪০ বর্গ কি.মি নৌপথ নেটওয়ার্কভুক্ত রয়েছে তাই এই অঞ্চলে নদীপথে দস্যুতা, চোরাচালান, মানব পাচারসহ অন্যান্য

অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এসমস্ত জেলায় ভাসমান থানা গঠন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এতে বর্তমানে এসমস্ত এলাকায় বিদ্যমান নৌযানসহ অন্যান্য লজিস্টিকস বৃদ্ধি করতে হবে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ভাসমান থানা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরাধের ধরন শুধু ভূমি বিরোধ ও দৈনন্দিন ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গেই জড়িত নয় বরং সশস্ত্র সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক শঙ্কা ও ঝুঁকির সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, Chittagong Hill-tracts Regulation, 1900, অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে সামাজিক বিচার আচার সম্পন্ন হওয়ার সংস্কৃতি এখনও চালু আছে উপর্যুক্ত অবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সম্পাদন করতে উদ্যোগী থাকবে। **(বিস্তারিত সংলগ্নি ১০ দ্রষ্টব্য)**

সুপারিশ:

১। বরিশাল, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, খুলনা, ভোলাসহ সমগ্র দেশে আনুমানিক ২৪,১৪০ (প্রায়) বর্গকিলোমিটার জলপথমণ্ডিত এলাকা নৌ নেটওয়ার্কভুক্ত রয়েছে, তাই এই অঞ্চলে নদীপথে দস্যুতা, চোরাচালান, মানব পাচারসহ অন্যান্য অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এসমস্ত জেলায় 'ভাসমান থানা' গঠন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ভাসমান থানা চিহ্নিত করে এসমস্ত এলাকায় বিদ্যমান নৌযানসহ অন্যান্য লজিস্টিকসের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরাধের ধরন শুধু ভূমি বিরোধ ও দৈনন্দিন ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়; বরং সশস্ত্র সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক শঙ্কা ও ঝুঁকির সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট রেগুলেশন্স, ১৯০০ অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে সামাজিক বিচার-আচার সম্পন্ন হওয়ার সংস্কৃতি এখনও চালু আছে। উপর্যুক্ত অবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সম্পাদন করতে উদ্যোগী থাকবে।

৬.২৭ সিআইডি ফরেনসিক সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন:

অপরাধ তদন্ত পদ্ধতি, সনাতন ও ডিজিটাল ফরেনসিক কর্মদক্ষতাসহ প্রয়োজনীয় জনবল, সম্পদ ও প্রযুক্তির যৌক্তিক পুনর্বিন্যাস বা বৃদ্ধি করে যে কোনো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ:

১। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (সিলেবাস/মডিউল) সংশোধনের জন্য সিআইডির নিজস্ব অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ পরামর্শকগণকে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত করা।
২। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) পদ সৃজন করা।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ:

১। **ফরেনসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এফটিআই) চালুকরণ**: ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় ফরেনসিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রাসঙ্গিক। ফরেনসিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত পেতে তথা তদন্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বস্তুগত আলামত চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, পরিবহন ও সংরক্ষণে পেশাগত জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রে উক্ত আলামত এর বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত মামলায় ইতিবাচক ফলাফল প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখতে পারে না।

তদন্ত ও তদারককারী কর্মকর্তাদের প্রাসঙ্গিক আলামতসমূহ সম্বন্ধে পরিচিতিকরণ, শনাক্তকরণ, প্রয়োগ, মূল্যায়ন ও আইনগত প্রক্রিয়ায় এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে পেশাগত জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরেনসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন ডিআইজিকে কমান্ড্যান্ট করে একটি পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এফটিআই) চালু করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

২। **ক্রাইমসিন ইউনিট গঠন:** অপরাধ তদন্তকালে ক্রাইমসিন থেকে প্রাপ্ত বস্তুগত আলামতসমূহ যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হলে উক্ত আলামতসমূহ পরীক্ষাগারে কর্মরত বিশারদগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে সহায়তা করেন। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সঠিক পথে তদন্ত পরিচালনা করে অপরাধের সঙ্গে অপরাধীকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে ক্রাইমসিন ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৩। **সিআইডির নিজস্ব ভবনের নির্মাণ**: মামলা সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ সংরক্ষণের জন্য সিআইডি হেডকোয়ার্টার্স এবং ৬৪ জেলার সিআইডি অফিসে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ব্যবস্থাপনা নেই। সিআইডির ৬১টি জেলার নিজস্ব অফিস না থাকায় আলামত সংরক্ষণের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে **সিআইডির ৬১ জেলায় নিজস্ব ভবনের** ব্যবস্থা করা গেলে আলামত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। সিআইডি হেডকোয়ার্টার্স কেন্দ্রিক আলামতসমূহ সিআইডি হেডকোয়ার্টার্সের নির্দিষ্ট স্থানে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। **বিভাগীয় শহরগুলোতে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা:** প্রতিটি বিভাগীয় শহরগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ফরেনসিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিভাগীয় শহরগুলোতে অথবা দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মামলার রুজুর এলাকা সমীক্ষা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৫। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব: প্রতিটি বিভাগে একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এর অধীনে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব চালু করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৬। ব্যালিস্টিকস শাখা : একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে ক্রাইমসিন ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন। একজন এএসপির অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে ব্যালিস্টিকস ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৭। জালনোট ও অন্যান্য দলিলাদি শনাক্তকরণ শাখা : একজন এএসপির অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে জালনোট ও অন্যান্য দলিলাদি শনাক্তকরণ ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৮। পদচিহ্ন শাখা : একজন এএসপি/পুলিশ পরিদর্শকের অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে **পদচিহ্ন** ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৯। হস্তলিপি শাখা : একজন এএসপির অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে **হস্তলিপি** ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

১০। ফিঙ্গারপ্রিন্ট শাখা : একজন এএসপির অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে **ফিঙ্গারপ্রিন্ট** ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ :

১। সিআইডির ল্যাবসমূহে যে সকল যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার এবং কার্যপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে ISO এর স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করলে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিআইডির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়াও পরীক্ষিত আলামতসমূহের পরীক্ষার ফলাফল Automated System এর মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **AFIS শাখা** : একজন এএসপির অধীনে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে Automated Fingerprint Identification System (AFIS) ল্যাব গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৩। বিভাগীয় শহরে ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি স্থাপন : ডিএনএ ল্যাবরেটরি পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল এবং এর মান বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং বিধায় দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মামলার সমীক্ষা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা না করে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত জনবল বৃদ্ধি অগ্রাধিকার দিয়ে সিআইডি হেডকোয়ার্টার্সে ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরির পরিসর বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং জেলা শহরগুলোতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।

৭। সংস্কার প্রস্তাবসমূহ

সুপারিশমালা:

নং	ক্ষেত্র	সুপারিশ/মতামত	বাস্তবায়নের ধরন	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
১.	**বলপ্রয়োগ**	**১।** ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি আইন, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন্স (পিআরবি)'র যথাযথ অনুসরণ করে এবং সেইসঙ্গে সময়ের বিস্তর ব্যবধানে আধুনিক বিশ্বে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যে সকল প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার করা হয় তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক পাঁচ ধাপে বলপ্রয়োগের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত ধাপগুলোকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক বলপ্রয়োগের জন্য নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুসরণের লক্ষ্যে **আইনগত বৈধতা দেওয়ার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে।** এতে ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির ঝুঁকি এড়িয়ে চলা সম্ভবপর হবে।	**মধ্য মেয়াদি**	৪৬
২.	**আটক/গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ**	১। গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা [8 SCOB (2016) AD] অবিলম্বে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো। অধিকন্তু, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত আপিল বিভাগের উক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনটি প্রত্যাহার কিংবা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে উহার আলোকে, প্রয়োজনে, ফৌজদারি কার্যবিধিসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-প্রবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। ২। আটক ব্যক্তি বা রিমান্ডে নেওয়া আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিটি থানায় স্বচ্ছ কাচের ঘোরাটোপ দেওয়া একটি আলাদা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ (Interrogation room) অবশ্যই থাকবে। ৩। পুলিশের তত্ত্বাবধানে থানাহাজত ও কোর্ট হাজতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বন্দিদের কোর্ট থেকে আনা-নেওয়ার সময় ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোতে মানবিক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। ৪। নারী আসামিকে যথেষ্ট শালীনতার সঙ্গে নারী পুলিশের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ৫। তল্লাশির সময় পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয় দিতে অস্বীকার করলে অথবা সার্চ ওয়ারেন্ট না থাকলে জরুরি যোগাযোগের জন্য নাগরিক নিরাপত্তা বিধানে একটি জরুরি কল সার্ভিস চালু করা যায়। ৬। জব্দকৃত মালামালের যথাযথ তালিকা না হলে এবং তল্লাশি কার্যক্রমটি সন্দেহজনক মনে হলে তা তাৎক্ষণিক জানানোর জন্য মেট্রো এলাকায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার/জেলা পুলিশ সুপারের বরাবর জরুরি কল সার্ভিস চালু করা যায়। ৭। অভিযান পরিচালনা করার সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কাছে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ও ভিডিও রেকর্ডিং ডিভাইসসহ (Body-worn-camera) ভেস্ট/পোশাক পরিধান করতে হবে। ৮। রাতের বেলায় (সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়) গৃহ তল্লাশি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ৯। থানায় মামলা রুজু তথা এফআইআর গ্রহণ ও তদন্ত কঠোরভাবে সার্কেল অফিসার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক নিয়মিত তদারকি জারি রাখতে হবে। ১০। কেইস ডায়েরি আদালতে দাখিল করে আদালতের আদেশ ব্যতীত কোনোক্রমেই এফআইআর বহির্ভূত আসামি গ্রেপ্তার করা যাবে না।	**অবিলম্বে ও মধ্য মেয়াদি**	৩৭, ৪১ এবং ৬৩-৬৫

নং	ক্ষেত্র	সুপারিশ/মতামত	বাস্তবায়নের ধরন	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
		১১। ভুয়া/গায়েবি মামলায় অনিবাসী/মৃত/নিরাপরাধ নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য করতে হবে। ১২। অজ্ঞাতনামা আসামিদের নামে মামলা দেওয়ার অপচর্চা পরিহার করতে হবে। কোনো পুলিশ সদস্য যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাউকে এধরনের মামলায় হয়রানি করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৩। বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মিডিয়ার সামনে কাউকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।		
৩.	**মানবাধিকার**	**১।** আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সরাসরি সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করার জন্য পুলিশ সংস্কার কমিশনের তরফ থেকে জোর সুপারিশ করা হচ্ছে। ২। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বা তাদের প্ররোচনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান নিজেই যাতে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়েও একটি মানবাধিকার সেল কার্যকর থাকার বিষয়ে কমিশন সুপরিশ করছে। ৩। সংবিধান, বিভিন্ন আইন এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা পুলিশ কর্তৃক অমান্য করার দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়ার জন্য নতুন হেল্প লাইন চালু করা কিংবা ট্রিপল নাইন (৯৯৯) কর্তৃক সেবার মধ্যে এ ধরণের অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ৪। ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষার জন্য একটি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা উচিত, যা জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। ৫। পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে র‍্যাবের (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন) অতীত কার্যক্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ৬। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র-জনতাকে হত্যা ও আহত করার জন্য দোষী পুলিশ সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।	**অবিলম্বে**	**৩২-৩৬**
৪.	**প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী**	১। পুলিশ সংস্কার কমিশন সামগ্রিক বিষয় ধর্তব্যে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ প্রভাবমুক্ত ‘পুলিশ কমিশন’ গঠনের বিষয়ে নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। ২। প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে নাকি সাংবিধানিক কাঠামোভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হবে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩। পুলিশ কমিশনের গঠন, কার্যপরিধি, সাংবিধানিক বা আইনি বাধ্যবাধকতা, আইনে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।	**মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি**	**৮৯, সংলগ্নি ৭,৮,৯ দ্রষ্টব্য।**
৫.	**থানায় জিডি রেকর্ড, মামলা রুজু, তদন্ত ও পুলিশ ভেরিফিকেশন**	১। থানায় জিডি গ্রহণ বাধ্যতামূলক, কোনোক্রমেই জিডি গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না; ২। মামলার এফআইআর গ্রহণে কোনোরূপ অনীহা/বিলম্ব করা যাবে না; ৩। ফৌজদারি মামলার তদন্তের জন্য একটি বিশেষায়িত দল গঠন করতে হবে, যাদের তদন্ত সংক্রান্ত ইউনিট ও থানা ব্যতীত অন্যত্র বদলি করা যাবে না। ভবিষ্যতে মামলা পরিচালনা ও তদন্ত একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের অধীনে পরিচালিত হতে হবে এবং তারা ফৌজদারি মামলা প্রসিকিউশন সংক্রান্ত একটি বিশেষ তদন্ত দল হবে। **পুলিশ ভেরিফিকেশন:**	**অবিলম্বে**	**৬৪, ৬৫ এবং ৬৭**

নং	ক্ষেত্র	সুপারিশ/মতামত	বাস্তবায়নের ধরন	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
		৪। জাতীয় পরিচয়পত্রধারী (NID) চাকরিপ্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানা অনুসন্ধানের বাধ্যবাধকতা রহিত করা যেতে পারে। ৫। চাকরিপ্রার্থীর বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা/শিক্ষা সনদপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করার দায়-দায়িত্ব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে। এগুলো পুলিশ ভেরিফিকেশনের অংশ হবে না। ৬। পুলিশ ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা রহিত করাসহ এতদ্‌সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংস্কার করা যেতে পারে। তবে চাকরিপ্রার্থী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তা ভেরিফিকেশন রিপোর্টে প্রতিফলিত করতে হবে। ৭। চাকরির জন্য সকল পুলিশ ভেরিফিকেশন সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে এবং অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।		
৬.	**যুগোপযোগী আইন ও প্রবিধানমালা**	ব্রিটিশ আমলে প্রণীত কিছু কিছু আইন ও প্রবিধান যুগের প্রয়োজনে সংস্কার/হালনাগাদ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কমিশনে নিম্নলিখিত আইনগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা যুগোপযোগী করার জন্য সুপারিশ করছে। ১। পুলিশ আইন, ১৮৬১; পুলিশকে জনবান্ধব ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক বাহিনী/প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন অথবা নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। ২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; বলপ্রয়োগ ও মানবাধিকার সুরক্ষায় এ আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো। ৩। পি আর বি, ১৯৪৩; জনবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী গঠনে এ প্রবিধানমালায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তন/পরিমার্জন অথবা নতুন প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।	**স্বল্প মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি**	**২৯**
৭.	**পুলিশের দুর্নীতি ও প্রতিকার**	**১। 'সর্বদলীয় কমিটি' গঠন:** পুলিশের কাজকর্মে ইচ্ছাকৃত ব্যত্যয় বা পেশাদারি দুর্নীতি রোধে স্বল্পমেয়াদি একটি কার্যক্রম হিসেবে 'ওয়াচডগ বা ওভারসাইট কমিটি' গঠন করা যায়। প্রতিটি থানা/উপজেলায় একটি 'সর্বদলীয় কমিটি' গড়ে তোলা যায়, যারা স্থানীয় পর্যায়ে 'ওভারসাইট বডি' হিসেবে কাজ করবে এবং দুর্নীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। **২। বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন:** উপরোল্লিখিত ১ম সুপারিশ চলমান অবস্থায় একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা যায় এবং 'সর্বদলীয় কমিটির' অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যাবতীয় বিষয় ধর্তব্যে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এই টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা যায়। ৩। পুলিশের বর্তমান পুরস্কার কাঠামোকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থামতে তাদের বিভিন্ন কাজে প্রণোদনা ও উৎসাহ দিতে বিভিন্ন পুরস্কার (মেডেল ও ভাতা/বিপিএম/পিপিএম অন্যান্য) দেওয়া হয়। বর্তমান কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই এবং পুরো প্রক্রিয়াটি প্রভাবমুক্ত নয়। এই সুযোগের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এতদ্‌সংক্রান্ত নিয়মকানুন ও বিধিমালা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।	**অবিলম্বে**	**৬২ -৬৩**
৮.	**দুর্নীতি প্রতিরোধ ও চলমান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ**	১। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সততা ও নৈতিকতার উচ্চমান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ২। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন, ইত্যাদি উচ্চ পর্যায়ের একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যে কোনো ধরনের অনিয়ম/ব্যত্যয় তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় আনতে হবে।	**মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি**	**৬৩-৬৫**

নং	ক্ষেত্র	সুপারিশ/মতামত	বাস্তবায়নের ধরন	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
		৩। পদায়ন, বদলি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠাকে গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ৪। পদায়ন, বদলি এবং পদোন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। ৫। থানার কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায়ের অপবাদ/অভিযোগ পুলিশ সুপার কর্তৃক তদন্তের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **সরকারি ক্রয়:** ৬। প্রতিটি থানায় বিবিধ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন যেমন- লাশ পরিবহন, সাক্ষী আনা-নেওয়া, বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি। ৭। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অডিট ও ইন্সপেকশন শাখার মাধ্যমে অধীনস্ত ইউনিটসমূহের ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়াদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা রুটিন ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। ৮। একই সঙ্গে দৈবচয়ন/আকস্মিক পরিদর্শন বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অডিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **থানাকেন্দ্রিক আর্থিক বিষয়াদি:** ৯। জিডি গ্রহণে কালক্ষেপণ/ওজর-আপত্তি বা কোনো রকম দুর্নীতির প্রমাণে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ১০। মামলার তদন্তব্যয় বৃদ্ধিসহ জিডি, ভেরিফিকেশন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য প্রতি থানায় বিশেষ বরাদ্দ ও ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১১। থানায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ ও মেরামতের নিয়মিত ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য প্রতি থানা বরাবর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। ১২। পুলিশের টহল ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য টিওএন্ডইভুক্ত প্রয়োজনীয় গাড়ি এবং জ্বালানি সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। ১৩। থানায় বাদী/বিবাদীদের নিয়ে কোনো ধরনের মধ্যস্থতা, Arbitration বা Alternate Dispute Resolution (ADR) এর জন্য বৈঠক বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। **ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা:** ১৪। মামলা প্রদানের ক্ষেত্রে বডিওর্ন (body-worn) ক্যামেরাসহ উন্নত প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ১৫। মামলা দায়ের, রেকার বিল চার্জ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ১৬। রাস্তায় যানবাহনে নিয়মিত চেকিং বা চেকপোস্টের মাধ্যমে চেকিংয়ের ক্ষেত্রে বডিওর্ন (body-worn) ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার সন্নিবেশন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেতে পারে।		
৯.	**প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা**	**প্রশিক্ষণ** ১। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফলকে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। ২। প্রশিক্ষণের ফলাফল প্রশিক্ষণার্থীর এসিআরের প্রাপ্ত নম্বরে প্রতিফলিত হতে হবে।	**অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি**	**৮২-৮৯ এবং ৯৯-১০০**

৩। অর্গানাইজড ক্রাইম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ (Expertise) এনে ট্রেনিং সেন্টারে প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।

৪। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) কর্মসূচিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে এর মাধ্যমে দক্ষ পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। যাতে তারা অন্যান্য পুলিশ সদস্যকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সক্ষম হয়।

৫। বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পুলিশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত ইউনিটগুলোতে চাকরি করতে বাধ্য থাকবেন।

৬। বলপ্রয়োগে অনুমোদিত Standard Operating Procedure (SOP) অনুসরণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তা মনিটরিং করতে হবে।

৭। পুলিশ সদস্যদের মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার জন্য এবং স্ব-স্ব ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা দিতে তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এসংক্রান্ত পৃথক প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮। বৈধ ও অবৈধ আদেশ প্রতিপালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণে সম্যক ধারণা দিতে হবে।

৯। পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের মানবাধিকার বিষয়াদির ওপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালার বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১০। প্রত্যেক পুলিশ সদস্য ‘জনগণের সেবক এবং বন্ধু’ এই মনোভাব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে।

সক্ষমতা:

ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে পুলিশি কার্যক্রম:

১১। বরিশাল, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, খুলনা, ভোলাসহ সমগ্র দেশে আনুমানিক ২৪,১৪০ (প্রায়) বর্গকিলোমিটার জলপথমণ্ডিত এলাকা নৌ নেটওয়ার্কভুক্ত রয়েছে, তাই এই অঞ্চলে নদীপথে দস্যুতা, চোরাচালান, মানব পাচারসহ অন্যান্য অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এসমস্ত জেলায় ‘ভাসমান থানা’ গঠন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ভাসমান থানা চিহ্নিত করে এসমস্ত এলাকায় বিদ্যমান নৌযানসহ অন্যান্য লজিস্টিকসের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২। পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরাধের ধরন শুধু ভূমি বিরোধ ও দৈনন্দিন ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়; বরং সশস্ত্র সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক শঙ্কা ও ঝুঁকির সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট রেগুলেশন্স, ১৯০০ অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে সামাজিক বিচার-আচার সম্পন্ন হওয়ার সংস্কৃতি এখনও চালু আছে। উপর্যুক্ত অবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সম্পাদন করতে উদ্যোগী থাকবে।

গবেষণা ও উন্নয়ন:

১৩। প্রস্তাবিত Centre for Police Research and Development (CPRD) গঠন এবং প্রতিষ্ঠায় এই কমিশন নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। প্রাথমিকভাবে জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পুলিশ স্টাফ কলেজ ও পুলিশ একডেমির সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালিত হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বাজেট প্রাপ্তি অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪। টেক পুলিশিং: বিশ্বব্যাপি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে পুলিশিং কার্যক্রমের প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এসংক্রান্ত অ্যান্ডভান্সড্ ডিজিটাল ফরেনসিক এবং ডিএনএ অ্যানালাইসিস, বায়োমেট্রিক ভিত্তিক, ডাটা ভিত্তিক, এ.আই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স) ভিত্তিক এবং সাইবার অপরাধ ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইত্যাদি সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ পুলিশে প্রচলন করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশের দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজন।

নং	ক্ষেত্র	সুপারিশ/মতামত	বাস্তবায়নের ধরন	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
		১৫। আইসিটি ও টেক কোর: পুলিশ বাহিনীকে নতুন নতুন টেকনোলজির সঙ্গে পরিচিত করানো এবং সেগুলোর যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, সাইবার ঝুঁকি প্রতিরোধ করা, আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা, আইসিটি খাতের উন্নয়ন, আইসিটি সরঞ্জামাদির প্রমিত মান Standard Specification (SS) অনুসরণ করে সংগ্রহ ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি **আইসিটি ও টেক কোর** গঠনের সুপারিশ করা হলো।		
১০.	**নারী, শিশু ও জেন্ডার সচেতনতা**	১। শিশু অধিকার ও শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। বিভিন্ন পর্যায়ে যে হট লাইন নম্বরগুলো আছে সেগুলোর তৎপরতা ও কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলাকেন্দ্রিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড যেমন: Victim Support Centre সহ Women Support and Investigation Division এবং Police Cyber Support for women ৬৪ জেলায় স্থাপন করতে হবে। ৩। পুলিশের মধ্যে জেন্ডার ও চিলড্রেন সেনসিটিভিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখতে হবে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিবেচ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহে যেসকল বিধিবিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	**অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি**	**৯৯**
১১.	**পুলিশের কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ**	১। পুলিশের জন্য একটি পরিপূর্ণ মেডিকেল সার্ভিস গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। **২।** প্রতি জেলা/মেট্রোপলিটন পুলিশে **লিগ্যাল অফিসার্স সেল** গঠন করে **'লিগ্যাল এক্সপার্ট'** নিয়োগের বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করছে। ৩। পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত ডোপ টেস্টের ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের আওতায় আনতে হবে। পুলিশ লাইন্স, থানা পুলিশ ক্যাম্প, ব্যারাকে সর্বত্র স্বাস্থ্যসম্মত ও মানবিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ৪। অতিরিক্ত কাজের চাপ কমানোর জন্য তাদের কর্মঘণ্টা সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। ০৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত ডিউটির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা চালু করতে হবে। ৫। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে পুলিশ সদস্যদের মানসিক চাপ হ্রাসকল্পে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। ৬। মাঝে মধ্যে বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও সতেজতা তৈরি করতে হবে। ৭। প্রতিটি থানায় আগত মহিলা (ভিকটিম/আটক) এবং মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য চেঞ্জিং/ড্রেসিং/ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৮। পুলিশ লাইন্স, থানা, ক্যাম্প ইত্যাদি অবস্থানে কনস্টেবল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের জন্য শতভাগ/পর্যাপ্ত সংখ্যক ডরমিটরি/কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ৯। ডরমিটরিতে প্রতি নারী-পুরুষের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন সুবিধা (নারী-পুরুষের আলাদা বিশ্রামাগার, শৌচাগার, পৃথক ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা) নিশ্চিত করতে হবে। ১০। আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশের জন্য বিশেষত নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ১১। কনস্টেবল এবং সমমানের পুলিশ সদস্যদের কাজের ব্যাপকতা, পরিধি ও সময়কাল বিবেচনা করে তাদের জন্য একটি পৃথক ছুটি গ্রহণ এবং ভোগের অনুশাসন/নীতিমালা সরকার বিবেচনা করতে পারেন।	**অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি**	**৩০,৩১ এবং ৮০-৮২**

<table>
<tr><th>নং</th><th>ক্ষেত্র</th><th>সুপারিশ/মতামত</th><th>বাস্তবায়নের ধরন</th><th>প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>১২। পুলিশ ব্যারাকে অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকায় পুলিশ সদস্যদের মানসিক চাপ হ্রাস করার জন্য তাদের বছরে ১ বার ভাতাসহ নির্দিষ্ট মেয়াদের ছুটি ভোগ বাধ্যতামূলক করা উচিত।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১২.</td><td>নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি</td><td>১। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের জন্য বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল এবং কাঠামোগত দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় সহকারী পুলিশ সুপারের নিয়োগ নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে:

বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রয়োজন, তা উপেক্ষিত হচ্ছে। এজন্য বর্তমান বিসিএস পরীক্ষায় পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগের জন্য আলাদাভাবে শারীরিক যোগ্যতা [(উচ্চতা ও ওজন ইত্যাদি পরিমাপ, ফিজিক্যাল এনডিউরেন্স টেস্ট (PET), মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি)] অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনের যোগ্যতা নিরূপণ করা যায়। এতে, আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীরা পুলিশ ক্যাডারে আবেদন করার জন্য সহজে বিবেচিত হতে পারবেন। এক্ষেত্রে The Bangladesh Civil Service (Enforcement: Police) Composition and Cadre Rules, 1980 সহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের সুপারিশ করা হলো।

২। সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) সভায় বাংলাদেশ পুলিশের এজেন্ডা থাকলে আইজিপিকে বোর্ডে উপস্থিত রাখার সুপারিশ করা হলো।

৩। পুলিশ সার্ভিসের পুলিশ সুপার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ফিটলিস্ট প্রস্তুত করে নিয়মিত বিরতিতে হালনাগাদ করতে হবে। হালনাগাদকৃত তালিকা থেকে পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে।

৪। বিশেষায়িত পুলিশ যথা (সিআইডি, সাইবার অপরাধ, বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি) স্ব-স্ব বিভাগের ভেতরে বা সংশ্লিষ্ট পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদায়ন করতে হবে।

৫। কনস্টেবল থেকে এএসআই এবং এএসআই থেকে এসআই পদোন্নতিতে প্রতি বছর পরীক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার রীতি বাতিল করে ১ বার উত্তীর্ণ হলে তাকে শারীরিক যোগ্যতাসাপেক্ষে পরবর্তী তিন বছরের জন্য পদোন্নতির যোগ্য হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করা হলো।

৬। বিভাগীয় পদোন্নতির নীতিমালা সংস্কার করে কনস্টেবল/এসআই নিয়োগ স্তর থেকে একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং প্রণয়ন করতে হবে। যাতে সদস্যদের মধ্যে পেশাদারিত্ব উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ/উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

৭। বর্তমানে থানাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী পুলিশের সংখ্যা শতকরা মাত্র ০৮ শতাংশ যা জনসেবা বৃদ্ধিতে নিতান্ত অপ্রতুল। থানাসহ, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন এবং অন্যান্য ইউনিট ও অফিসে কাঙ্ক্ষিত নারী পুলিশের সংখ্যা বর্তমানে ১৬,৮০১ থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ২৯,২৪৮ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

১৩। নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান অর্গানোগ্রামে পদ সৃষ্টি করতে হবে।</td><td>অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি</td><td>৭৯-৮০</td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td>পুলিশের বিশেষায়িত সংস্থা/ইউনিট শক্তিশালীকরণ</td><td>১। পরীক্ষামূলকভাবে ৮টি বিভাগীয় মেট্রোপলিটন এলাকায় করোনার (Coroner) নিয়োগ এবং তাঁর অফিস স্থাপনের সুপারিশ করা হলো।

২। মামলার আলামত চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, পরিবহন ও সংরক্ষণের পেশাগত জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য একটি ফরেনসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (AFIT) প্রতিষ্ঠা করা যায়।

৩। সকল বিভাগীয় শহরে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের সুপারিশ করা হলো।

৪। প্রতিটি বিভাগে একটি ক্রাইমসিন ইউনিট/ব্যালাস্টিক শাখা গঠন করা যেতে পারে।

৫। প্রতিটি বিভাগে জাল নোট ও অন্যান্য জাল দলিলাদি শনাক্তকরণের জন্য ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।</td><td>মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি</td><td>১০০-১০১</td></tr>
</table>

নং	ক্ষেত্র	সুপারিশ/মতামত	বাস্তবায়নের ধরন	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
		৬. প্রতিটি বিভাগে একটি পদচিহ্ন শাখা, একটি হস্তলিপি শাখা ও একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট শাখা গঠন করা যেতে পারে। ৭. প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অটোমেটেড ডিএনএ ল্যাব স্থাপন করার সুপারিশ করা হলো।		
১৪.	**জনকেন্দ্রিক ও জনবান্ধব পুলিশিং**	১। **টাউন হল সভা–** জনগণ ও পুলিশের মধ্যে আস্থা পুনর্গঠন ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত **টাউন হল সভার** আয়োজন করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ২। **নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন–** আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও উন্নতির জন্য এলাকায় (প্রতি থানা) নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা যায়। ৩। নাগরিক সচেতনতা তৈরির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠনমূলক পাঠ/চর্চা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে পুলিশিং ও আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি রাখা জরুরি। যেমন: **'একদিন পুলিশ হয়ে দেখুন'** এ ধরনের রোল প্লে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুলিশের কাজকর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে। ৪। পুলিশের আলাদা পিআর (পাবলিক রিলেশন) স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে, যাতে পুলিশের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ আরও জোরদার হয়। যেমন– পুলিশের বিভিন্ন হটলাইনের ব্যাপারে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রমোশন করা যেতে পারে। বিশেষ করে নারীদের জন্য পুলিশের যেই সেবাগুলো আছে তা আরও প্রচার-প্রচারণার দরকার আছে। ৫। **কমিউনিটি পুলিশিং–** বর্তমানে প্রচলিত কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করে এটিকে চেক এন্ড ব্যালেন্স-এর একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রস্তাব করা হলো, যা পুলিশের জবাদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং পুলিশের কাজে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। ৬। **পুলিশের সেবামূলক ও জনবান্ধব কার্যক্রম:** বর্তমানে চলমান পুলিশের সেবাধর্মী কার্যক্রমের যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন। আরও আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনবান্ধব পুলিশিং-এর জন্য জোর প্রচেষ্টা ও প্রচার প্রয়োজন। পুলিশকে সেবাধর্মী ও জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় পুলিশ সদর দপ্তরের কার্যকর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বহুল প্রচারসহ গতিসঞ্চার করা অপরিহার্য। ৭। পুলিশের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে থানাভিত্তিক মামলা কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত। ৮। **জনবান্ধব পুলিশ গঠনে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ:** বাংলাদেশে বিগত ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বুদ্ধিভিত্তিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি পুলিশ বিভাগেও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির সুপারিশ করা হলো। **এই উদ্যোগ একদিকে পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক উন্নত করবে, অন্যদিকে আহত ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।**	**স্বল্প মেয়াদি**	**৬৯-৭৪**
১৫.	**বিবিধ পর্যবেক্ষণ**	১। কারাগারের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামীতে নতুন কারাগার ও পুলিশ লাইন্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব যথাসম্ভব কম রাখতে হবে, যাতে একটি সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়। এক্ষেত্রে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হলো। ২। মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার বা ডাটাবেজ তৈরিকরণের সুপারিশ করা হলো। ৩। বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CDMS) সফটওয়্যারে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রবেশাধিকার প্রদান বা বিকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব (CDMS) তৈরি ও সময় সময় জনগণের প্রবেশাধিকার প্রদানের সুপারিশ করা হলো।	**মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি**	**২৪**

৮। সমাপনী মন্তব্য:

পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কে এক গভীর ক্ষত রয়েছে, যার শিকড় ঔপনিবেশিক যুগে রোপিত এবং যা সম্প্রতি জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই ক্ষত একদিনে সারানো সম্ভব নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ। বর্তমান সংস্কার কমিশন এই ক্ষত নিরাময়ের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, যা পুলিশকে জনগণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এসব সুপারিশে মানবাধিকার রক্ষা, বলপ্রয়োগ নীতির সংস্কার, পুলিশের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, আইনি কাঠামোর সংস্কার, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, দুর্নীতি দমন, পুলিশের কল্যাণ এবং জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কমিশন এই প্রক্রিয়ায় জনমত জরিপ, অংশীজনের মতামত এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদির সহায়তা নিয়েছে। তবে, সময়ের স্বল্পতা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু কোনো সংস্কারই কার্যকর হবে না, যদি জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালানো পুলিশ সদস্য ও তাদের নির্দেশদাতাদের চিহ্নিত করে বিচার নিশ্চিত না করা হয়। একইভাবে, ফ্যাসিবাদী শাসনামলে গুম, খুন, নিখোঁজ, গ্রেপ্তার বাণিজ্য এবং দুর্নীতিতে যুক্ত পুলিশ সদস্য ও তাদের নির্দেশদাতাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানও অপরিহার্য। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার অসম্ভব, বরং অতীতের মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থেকেই যাবে।

তাই, পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে অপরাধে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিচারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে, কমিশনের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য ও অঙ্গীকারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আমরা বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ পুলিশি বাহিনী ও দক্ষ পুলিশি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৯। সংলগ্নীসমূহ:

সংলগ্নীসমূহের তালিকা

সংলগ্নী নং	শিরোনাম	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং
০১	“পুলিশ সংস্কার কমিশন” সংক্রান্ত গেজেট	০১
০২	আইনি ও প্রবিধানিক	২৯
০৩	পুলিশ সদস্যদের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন সরলীকরণ, ঝুঁকি ভাতা/আর্থিক প্রনোদনা	২৯
০৪	প্রস্তাবিত 'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’ (PMS)	৩২
০৫	প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি	৬৭
০৬	পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৭৮
০৭	প্রস্তাবিত পুলিশ অর্ডিন্যান্স -২০০৭	৮৯
০৮	প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন	৮৯
০৯	স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত	৮৯
১০	ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে পুলিশিং	৯৯

৩/১০/২০২৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন, ১৪৩১/ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩৩০-আইন/২০২৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে "পুলিশ সংস্কার কমিশন" নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল:

(ক) **পুলিশ সংস্কার কমিশন**

১.	জনাব সফর রাজ হোসেন, সাবেক সচিব	- কমিশন প্রধান
২.	জনাব আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩.	জনাব মোহাম্মদ ইকবাল, সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও সাবেক মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	- সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ হারুন চৌধুরী, সাবেক বিভাগীয় কমিশনার ও যুগ্মসচিব	- সদস্য
৫.	জনাব শেখ সাজ্জাদ আলী, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	- সদস্য
৬.	জনাব মো: গোলাম রসুল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	- সদস্য
৭.	জনাব শাহনাজ হুদা, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৮.	জনাব এ এস এম নাসিরউদ্দিন এলান, মানবাধিকার কর্মী	- সদস্য
৯.	শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	- সদস্য

CamScanner

(খ) কমিশন ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করিবে;

(গ) কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) কমিশনের প্রধান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারি পদমর্যাদা, বেতন/সম্মানি ও সুযোগ-সুবিধা পাইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রধান বা কোন সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কমিশনের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(চ) কমিশন প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(ছ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

CamScanner

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি:

৯. জনাব মো: জারিফ রহমান, গবেষক, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

পরবর্তীতে অন্তর্ভূক্ত ২ (দুই) জন কমিশন সদস্য:

১০. জনাব মো: রফিকুল হাসান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

১১. জনাব মোহাম্মদ আশফাকুল আলম, কমান্ডেন্ট (ডিআইজি), পিটিসি, টাঙ্গাইল।

পুলিশ আইন ১৮৬১সহ ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮, পিআরবি ১৯৪৩ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ

পুলিশের অন্তর্ভুক্তি যেসকল আইনে প্রয়োজন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

দেশে বিদ্যমান পুলিশ আইনগুলো ব্রিটিশ আমলের। সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে না পারায় এগুলোর কিছু জায়গায় আধুনিকায়ন করা এখন সময়ের দাবি। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আইনগুলোর সংস্কার করা খুব জরুরি। বাংলাদেশ পুলিশ যেহেতু আইনি কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হয় সেক্ষেত্রে পুরনো আইন যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে অপরাধের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। তাই পুরনো আইনগুলোকে সংস্কার ও কিছু ক্ষেত্রে নতুন আইন করা অতীব আবশ্যক। এতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশের কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর হবে।

সার্বিক বিবেচনায় নিম্নোক্ত আইনসমূহে পুলিশের অন্তর্ভুক্তি দেশের আপামর জনসেবায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কেননা এ সব আইনে পুলিশের অধিকতর সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ পুলিশের সাথে জড়িত মৌলিক আইন যেমন দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দরকার।

ক্রম	আইনের নাম	প্রণীত সন
১)	ফৌজদারি কার্যবিধি	১৮৯৮
২)	দণ্ডবিধি	১৮৬০
৩)	সাক্ষ্য আইন	১৮৭২
৪)	প্রকাশ্য জুয়া আইন	১৮৬৭
৫)	অস্ত্র আইন	১৮৭৮
৬)	পাসপোর্ট আইন	১৯২০
৭)	জেল কোড	১৯২০
৮)	পুলিশ (বিদ্রোহে উসকানি) আইন	১৯২২
৯)	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন	১৯৯৫
১০)	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	২০০০
১১)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন	২০০৬
১২)	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন	২০১০
১৩)	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন	২০১০
১৪)	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন	২০১২
১৫)	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন	২০১২
১৬)	শিশু আইন	২০১৩
১৭)	নিরাপদ খাদ্য আইন	২০১৩

ক্রম	আইনের নাম	প্রণীত সন
১৮)	নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন	২০১৩
১৯)	সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন	২০১৮
২০)	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন	২০২৩
২১)	সাইবার নিয়ন্ত্রণ আইন	২০২৩
২২)	পৌর পুলিশ আইন	প্রস্তাবিত

১। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৮৯

ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC) আইন আধুনিকায়ন এবং পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই সংশোধনীগুলি পুলিশকে আরও কার্যকর ভাবে অপরাধ প্রতিরোধ এবং তদন্ত করতে সাহায্য করবে, এবং সাথে সাথে তাদের জবাবদিহিতা ও তদারকি নিশ্চিত করবে।

১. **প্রতিরোধমূলক পুলিশিং ক্ষমতা বৃদ্ধি (ধারা ১০৭-১১০)**

   সহিংসতা বা হুমকির আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে পুলিশের প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অস্থায়ী প্রতিরোধমূলক আদেশ জারি করতে বা স্থানীয় সম্প্রীতি রক্ষা করতে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এই ক্ষমতা পুলিশকে সম্ভাব্য অপরাধ প্রতিরোধ করতে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

২. **পারিবারিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার জন্য বিশেষ বিধান**

   পারিবারিক সহিংসতা বা যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে অস্থায়ী সুরক্ষা আদেশ প্রদানের ক্ষমতা এবং নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর সুযোগ পুলিশকে প্রদান করা উচিত। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পুলিশকে আদালতের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই বিধান নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং তাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

৩. **সাইবার অপরাধের বিস্তৃত এখতিয়ার (নতুন বিধান)**

   CrPC-তে সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় পুলিশকে ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, গ্রেফতার করা, এবং ক্ষতিকর কন্টেন্ট মুছে ফেলার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এই ক্ষমতা ডিজিটাল যুগে অপরাধ দমন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে সাহায্য করবে।

৪. **জামিনের শর্ত ও সুরক্ষা বাড়ানো (ধারা ৪৯৬)**

   জামিনের বিধানগুলো সংশোধন করে পুনঃঅপরাধী এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর জামিন শর্ত আরোপের ক্ষমতা পুলিশকে দিতে হবে। এটি বিচার ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করবে এবং অপরাধীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

৫. **পুলিশি জবাবদিহিতা ও তদারকি**

CrPC-তে একটি স্বতন্ত্র তদারকি বোর্ড গঠন করা উচিত যা পুলিশের কার্যক্রম তদারকি ও অভিযোগ তদন্ত করবে, যা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর জনসাধারণের তত্ত্বাবধানকারী সংস্থার মতো কাজ করবে। এই বোর্ড পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করবে এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

২। দণ্ডবিধি, ১৮৬০

দণ্ডবিধি আইনকে আরও কার্যকর এবং সময়োপযোগী করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই সংশোধনীগুলি বিভিন্ন অপরাধের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান, শাস্তির বিধান শক্তিশালী করণ এবং পুলিশের ভূমিকা স্পষ্ট করে একটি ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

- **অপরাধের সংজ্ঞা আধুনিকীকরণ:** হয়রানি, সাইবারবুলিং এবং ঘৃণামূলক অপরাধের ক্ষেত্রে ডিজিটাল, সামাজিক এবং মানসিক দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে অপরাধের সংজ্ঞা হালনাগাদ করা উচিত। এটি আধুনিক সমাজের বিভিন্ন অপরাধের ধরণ সম্পর্কে আইনকে সচেতন করবে এবং সঠিক বিচার নিশ্চিত করবে।
- **লিঙ্গভিত্তিক ও পারিবারিক অপরাধ:** এ ধরনের অপরাধের জন্য (যেমন, ধারা ৩৫৪, ৩৭৫) শাস্তি বাড়ানো এবং পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পুলিশ হস্তক্ষেপের বিধান যুক্ত করা উচিত। এটি নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং তাদের প্রতি সহিংসতা কঠোর ভাবে দমন করবে।
- **বৈষম্য বিরোধী বিধান:** দণ্ডবিধিতে বৈষম্যমূলক অপরাধগুলোর জন্য নতুন বিধান সংযোজন করে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধিতা ভিত্তিক বৈষম্য অবৈধ ঘোষণা করে এবং পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। এটি সমাজে সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।
- **শিশু সুরক্ষার জন্য নতুন ধারা:** শিশু নির্যাতন বা পাচারের ক্ষেত্রে পুলিশকে তাৎক্ষণিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা এবং কঠোর শাস্তির বিধান থাকা উচিত। এটি শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
- **কমিউনিটি পুলিশিং বিধান:** পুলিশকে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা যুক্ত করে, যেটি প্রতিরোধমূলক এবং পরামর্শদাতা ভূমিকা পালন করবে। এটি পুলিশ এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করবে এবং অপরাধ প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে।

৩। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

সাক্ষ্য আইনকে আরও কার্যকর এবং সময়োপযোগী করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই সংশোধনীগুলি ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা, সাক্ষী ও ভুক্তভোগীর সুরক্ষা এবং এভিডেন্স পরিচালনার প্রক্রিয়া উন্নত করে একটি ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

১. **ডিজিটাল** এভিডেন্স **গ্রহণযোগ্যতা (ধারা ৩ - সংজ্ঞা):**

"সাক্ষ্য" এর সংজ্ঞায় ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করে পুলিশকে ইলেকট্রনিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করা উচিত। এটি ডিজিটাল যুগে অপরাধ তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রমাণের ব্যবহার সম্ভব করবে।

২. **ডিজিটাল ও সাইবার প্রমাণের জন্য প্রিসাম্পশন (ধারা ৬৫এ এবং ৬৫খ):**

নির্দিষ্ট শর্তে আদালতকে ডিজিটাল এভিডেন্স প্রামাণিকতা অনুমান করার অনুমতি দিয়ে প্রিসাম্পশন শক্তিশালী করা উচিত। এটি ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা সহজ করবে এবং বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর করবে।

৩. **ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা (নতুন ধারা):**

সংবেদনশীল মামলায় সাক্ষী ও ভুক্তভোগী সুরক্ষার বিধান যুক্ত করা উচিত, যা পুলিশকে সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম করবে। এটি সাক্ষীদের ভয় মুক্ত করে সত্য প্রকাশে উৎসাহিত করবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

৪. **বস্তুগত ও ইলেকট্রনিক** এভিডেন্স **সরলীকৃত প্রক্রিয়া:**

বস্তুগত ও ডিজিটাল এভিডেন্স পরিচালনার জন্য সহজ প্রক্রিয়া যুক্ত করে পুলিশের কার্যপ্রণালীকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে। এটি এভিডেন্স সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং এভিডেন্স এর অখণ্ডতা রক্ষা করবে।

৫. **কমিউনিটি সাক্ষ্য ও বিকল্প সাক্ষ্য:**

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন অপরাধের ক্ষেত্রে কমিউনিটি সাক্ষ্য এবং বিকল্প **সাক্ষ্য** গ্রহণযোগ্যতার জন্য নমনীয়তা যুক্ত করা উচিত। এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

৪। প্রকাশ্য জুয়া আইন, ১৮৬৭

বাংলাদেশে জুয়া খেলা একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, কারণ এটি সামাজিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এজন্য ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে "পাবলিক গ্যাম্বলিং অ্যাক্ট" বা "প্রকাশ্য জুয়া আইন" প্রণয়ন করা হয়, যা আজও কার্যকর। এই আইনের লক্ষ্য ছিল অবৈধভাবে পরিচালিত জুয়ার প্রতিরোধ, বিশেষত পাবলিক স্থানে এবং অনুমোদনবিহীন জুয়ার আসরগুলোতে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ:

- **পাবলিক গ্যাম্বলিং**: কোনো ব্যক্তি যদি অনুমোদনবিহীন স্থানে জুয়া খেলার জন্য জড়িত থাকে বা অংশগ্রহণ করে, তবে সেটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।
- **অনুমোদনবিহীন স্থানে জুয়ার আয়োজন**: যদি কেউ কোনো অনুমোদন ছাড়াই নির্দিষ্ট জায়গায় জুয়া খেলার আয়োজন করে, তবে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

- **অর্থনৈতিক লেনদেন:** জুয়া থেকে অবৈধ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ফৌজদারি হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং এই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।
- **শাস্তি ও জরিমানা:** আইন অমান্যের জন্য বিভিন্ন শাস্তি এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা:

- অনুমোদনবিহীন জুয়া খেলার আসর শনাক্ত করে এবং অভিযানে অংশ নেয়।
- জুয়া খেলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে এবং আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।
- প্রচলিত ও অনলাইন উভয় ধরনের জুয়া শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জুয়ার ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করে।

সংস্কার প্রস্তাবনা

জুয়া আইনের সংশোধন প্রয়োজন, বিশেষত অনলাইন গ্যাম্বলিং এবং প্রযুক্তিনির্ভর জুয়ার প্রচলন বেড়ে যাওয়ার কারণে। কিছু প্রস্তাবিত সংস্কার ও এর সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে:

- **অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক আইন:** আধুনিক সময়ে অনলাইন জুয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করতে আলাদা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এটি কার্যকর হলে অনলাইন গ্যাম্বলিং রোধে সহায়ক হবে।
- **শাস্তি কঠোরকরণ:** জুয়া খেলা এবং এর আয়োজকদের জন্য শাস্তি আরও কঠোর করা যেতে পারে, যা অপরাধ দমনে প্রভাব ফেলবে।
- **আর্থিক লেনদেনের নজরদারি:** জুয়া থেকে অর্জিত অর্থের উপর কড়া নজরদারি এবং অনুসন্ধান করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ফলাফল:

এসব সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে, অনলাইন এবং সরাসরি জুয়া নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে, সমাজে অপরাধের হার কমবে, এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস পাবে। এছাড়া, আইন প্রয়োগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৫। অস্ত্র আইন, ১৮৭৮

অস্ত্র ও গোলাবারুদ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত একটি আইন। এই আইনটি অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ ব্যবহার ও প্রবাহ রোধ করতে ব্যবহৃত হয়। আইনটি বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে অস্ত্র ব্যবহার, দখল এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারা:

ধারা ৩: অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ন্ত্রণ

ধারা ৪: লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা

ধারা ২৫: গোলাবারুদ বা অস্ত্রের অবৈধ সরবরাহ

ধারা ৩৭: অস্ত্রের ব্যবহার

ধারা ৩৯: অপব্যবহার

পুলিশের ভূমিকা:

- **অভিযান পরিচালনা:** পুলিশ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে।
- **গ্রেপ্তার:** পুলিশ অস্ত্রধারী ও অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- **তথ্য সংগ্রহ:** পুলিশ স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা নিয়ে অস্ত্রের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে, এবং অপরাধীদের শনাক্ত করে।
- **আইনগত ব্যবস্থা:** গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করে পুলিশ আদালতে মামলা দায়ের করে।

সংস্কারের প্রস্তাব:

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত এই আইনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনলে আইনটি আরো কার্যকর ও জনবান্ধব করা সম্ভব হবে। নিচে এই আইনের সংস্কারের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হলো:

- অবৈধ অস্ত্রের উৎপাদন এবং আমদানিতে বিদ্যমান আইনে আরো উচ্চমাত্রার শাস্তির বিধান আরোপন।
- প্রাচীন এই আইনে লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়া, পরিদর্শন, এবং অস্ত্র ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিধিমূলে নিয়মিত মনিটর পরিদর্শনের ব্যবস্থা আরোপ করা।
- বিদ্যমান আইনে গঠিত কমিশনের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার (database) তৈরি করা যেতে পারে যেখানে সমস্ত অস্ত্র এবং তাদের মালিকদের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দ্রুত তথ্য যাচাই করতে সাহায্য করবে।
- বর্তমান আইনে এক ব্যক্তি কতটি অস্ত্র রাখতে পারেন সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। নতুন আইনে: ব্যক্তিগত অস্ত্রের সীমা নির্ধারণ।
- উচ্চক্ষমতার অস্ত্র যেমন অটোমেটিক অস্ত্র সাধারণ জনগণের জন্য নিষিদ্ধ।
- বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের জন্য আলাদা লাইসেন্স প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলী নির্ধারণ।

ফলাফল

এইসব প্রস্তাবিত সংস্কার আনলে আইনটি বাংলাদেশে অধিক কার্যকর হবে, জনমুখী হবে, এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া বর্তমান আইনের আধুনিকায়নের মাধ্যমে অস্ত্রের অপব্যবহার কমানো সম্ভব হবে, যা দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

৬। পাসপোর্ট আইন, ১৯২০

বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রণীত একটি আইন হলো পাসপোর্ট আইন-১৯২০ । এই আইনটি পাসপোর্টের অধিকার, নথি যাচাই, এবং বিদেশে যাত্রার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ:

ধারা ৩: পাসপোর্টের প্রয়োজনীয়তা

ধারা ৪: পাসপোর্টের নিয়ন্ত্রণ

ধারা ৫: পাসপোর্ট বাতিল

ধারা ৬: অবৈধ পাসপোর্ট ব্যবহার

ধারা ১০: নিষেধাজ্ঞা

পুলিশের ভূমিকা:

- **পাসপোর্ট যাচাই:** পুলিশ বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্ট এবং ভিসার যাচাই করে এবং সন্দেহজনক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।
- **অভিযান পরিচালনা:** পুলিশের গোয়েন্দা শাখা বিদেশে পাচার বা অবৈধ পাসপোর্ট ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে।
- **গ্রেপ্তার:** অবৈধ পাসপোর্ট বা জাল পাসপোর্ট ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- **তথ্য সংগ্রহ:** পুলিশের বিভিন্ন শাখা পাসপোর্ট সম্পর্কিত অপরাধের তথ্য সংগ্রহ করে এবং অপরাধীদের শনাক্ত করতে কাজ করে।

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:

- **জাল পাসপোর্ট তৈরি:** পুলিশ একটি চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অনেক জাল পাসপোর্ট উদ্ধার করে এবং এতে জড়িত ব্যক্তিদের ধারা ৪-এর আওতায় গ্রেপ্তার করে।
- **অবৈধ ভ্রমণ:** একজন ব্যক্তি অবৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে আটক করে এবং ধারা ৩ ও ৬-এর আওতায় মামলা দায়ের করে।

সংস্কারের প্রস্তাবনা

পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত একটি প্রাচীন আইন, যা সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানানসই নয়। এই আইনটিকে আধুনিককরণের মাধ্যমে সংস্কার করা গেলে পাসপোর্ট সেবা আরো জনবান্ধব, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এবং সংশোধনের সুপারিশ প্রদান করা হলো:

- বিদ্যমান আইনের অধীন একটি **ই-গভর্নেন্স পোর্টাল** তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে আবেদন থেকে শুরু করে পাসপোর্ট সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ট্র্যাক করা সম্ভব হবে।
- **বায়োমেট্রিক ডেটা ও ফেসিয়াল রিকগনিশন** সিস্টেম সংযোজন করে প্রতিটি আবেদনকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পাসপোর্ট জালিয়াতি প্রতিরোধ।
- একটি **শক্তিশালী মনিটরিং সেল** তৈরি করা যেতে পারে, যা পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শন করবে এবং এই ধরনের চক্র বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। জেল কোড, ১৯২০

জেল কোড আইন বা কারাগারে বন্দিদের অধিকার সংরক্ষণের আইন, মূলত বন্দিদের মানবাধিকার রক্ষা এবং কারাগারে তাদের নিরাপত্তা ও সঠিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটি কারাবন্দী মানুষদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে এবং শাস্তির অধিকার সুরক্ষা প্রদান করে। কারাগারের পরিবেশে দুর্ব্যবহার, অবহেলা, বা নিষ্ঠুর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য জেল কোড আইন প্রণয়ন করা হয়।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ:

- বন্দিদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন: কোনও বন্দিকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা নিষিদ্ধ।
- অত্যাধিক শাস্তি প্রদান: কারাগারে অত্যাধিক শাস্তি বা নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদান করা যাবে না।
- অবৈধ বন্দি বা অকারণ আটক: যেকোনো বন্দিকে অবৈধভাবে বা অকারণে আটক রাখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- বন্দিদের স্বাস্থ্য সেবা না প্রদান: বন্দিদের যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান না করা।
- বন্দির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করা: বন্দি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না, এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
- আইনি সহায়তা না দেওয়া: বন্দিদের আইনি সহায়তা না প্রদান বা সঠিক বিচার ব্যবস্থার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

পুলিশের ভূমিকা

- বন্দিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: কারাগারে বন্দিদের সুরক্ষা এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা।
- দুর্ব্যবহার রোধ করা: বন্দিদের প্রতি পুলিশ সদস্যদের অবিচার বা নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করা।
- আইন প্রয়োগ: আইন অনুযায়ী বন্দিদের সঙ্গে সঠিক আচরণ নিশ্চিত করা এবং শাস্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- মনিটরিং ও নিরীক্ষণ: বন্দিদের ওপর নজর রাখা, তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলা মনিটর করা এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া।
- আইনি সহায়তা প্রদান: বন্দিদের তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- সম্প্রতি ঢাকার সিএমএম আদালত হতে জঙ্গি মামলার আসামী হাজিরা প্রদান শেষে কোর্ট হাজতখানায় নিয়ে যাওয়ার প্রাকালে আদালত প্রাঙ্গন হতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত দুইজন আসামীকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের আলোকে শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গী, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত/যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী বা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দিদেরকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর কিংবা কারাগার থেকে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপনকালে তারা যাতে দুষ্কৃতিকারীদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারে কিংবা জেল খানায় অবস্থানকালে কোন অপরাধ সংগঠনের পরিকল্পনা করতে না পারে সেজন্য আটক থাকা বন্দিদের উপর নিয়মিত নজরদারী এবং বন্দিদের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক।

- এছাড়া জেল কোড এর বিধি ৪৬৪ এবং ৪৭৪ অনুযায়ী কারাগারে বিদ্রোহ, গোলযোগ, পলায়ন সংক্রান্ত ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে পুলিশকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কারাগারে বন্দিদের প্রকৃতি এবং কারাগারের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে পুলিশের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। **সে লক্ষ্যে জেলখানা কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় পুলিশের নিবিড় ও নিয়মিত সমন্বয় এবং যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত জেলখানা পরিদর্শন করা অত্যাবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান।** কিন্তু জেল কোডের বিধি ৫৫ অনুযায়ী জেল পরিদর্শক হিসেবে যে সকল কর্মকর্তগণ দায়িত্ব পালন করেন তন্মধ্যে সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার অথবা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি এবং জেলা পুলিশ সুপার অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কারা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে বন্দীদের উপর নজরদারী স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া কারাগারে জঙ্গী বন্দিদের গতিবিধি পর্যালোচনা এবং তাদের কর্মকান্ডের উপর নজরদারী রাখার ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- জেলখানা পরিদর্শনের লক্ষ্যে জেল কোডের অধ্যায়-৪ এর বিধি ৫৫ সংশোধনপূর্বক জেলের পরিদর্শক হিসেবে সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার অথবা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (উপ-পুলিশ কমিশনারের নিম্নে নহে) এবং জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার-কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ: কারাগারে বন্দিদের মৌলিক মানবাধিকার ও চিকিৎসা সেবা সঠিকভাবে নিশ্চিত করা।
- কারাগারের অবস্থা উন্নয়ন: কারাগারের অবস্থা আরও উন্নত করা, যাতে বন্দিরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে নিরাপদ ও সুস্থ থাকে।
- বন্দিদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা: জেল কোট আইনে পুনর্বাসনের উপায় আরও কার্যকর করা উচিত, যাতে বন্দিরা কারাগার থেকে মুক্তি পেলে সমাজে ভালভাবে মিশে যেতে পারে।
- বন্দি সুরক্ষা নিশ্চিত করা: বিশেষ করে নারী ও শিশুবন্দিদের জন্য আরও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- আইনি সহায়তার প্রসার: বন্দিদের আইনি সহায়তা আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করতে হবে।

ফলাফল

- মানবাধিকার সুরক্ষা: বন্দিদের মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে এবং কারাগারে তাদের প্রতি অবিচারের মাত্রা কমে যাবে।
- কারাগারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা: শৃঙ্খলা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে, যা কারাগারের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও নিরাপদ রাখবে।
- পুনর্বাসন প্রক্রিয়া উন্নত হবে: বন্দিরা মুক্তি পাওয়ার পর পুনর্বাসনে সহজেই ফিরতে পারবে, ফলে অপরাধের পুনরাবৃত্তি কমবে।
- কারাগারে চিকিৎসা সেবা উন্নত হবে: বন্দিদের স্বাস্থ্য সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে, এবং চিকিৎসা সেবা পাওয়া সহজ হবে।

- আইনি সহায়তা নিশ্চিত হবে: বন্দিরা তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সঠিক সময়ে আইনি সহায়তা পাবেন।

৮। পুলিশ (বিদ্রোহে উসকানি) আইন, ১৯২২

বিভিন্ন সময়ে পুলিশের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বিদ্রোহ ও দমন আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পুলিশ বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিহার্য, তাই বাহিনীর ভেতরে শৃঙ্খলার অভাব জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। পুলিশ বাহিনীর ভেতরে বিদ্রোহ, অমান্যতা, এবং অসদাচরণ রোধ করার লক্ষ্যে এই আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ এবং দেশ ও জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ:

- **বিদ্রোহ ও কর্তব্য অমান্য করা:** পুলিশ সদস্য কর্তব্য পালনকালে যদি তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ উপেক্ষা বা অমান্য করে, তবে তা বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য হয় এবং শাস্তিযোগ্য।
- **অসদাচরণ ও শৃঙ্খলাভঙ্গ:** দায়িত্ব পালনে গাফিলতি, সহকর্মীদের প্রতি অসদাচরণ, বা সহিংসতায় জড়ানো শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।
- **অবৈধ সমাবেশে অংশগ্রহণ:** কোনো অনুমোদন ছাড়াই পুলিশের কোনো অংশ কোনো আন্দোলন বা বিদ্রোহে অংশ নিলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।
- **শাস্তি:** শাস্তির মধ্যে সাময়িক বরখাস্ত, চাকরিচ্যুতি, জরিমানা, এবং বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি আরোপ করা হয়।

পুলিশের ভূমিকা:

- আইনের প্রয়োগ এবং পুলিশের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশ বাহিনীর কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, যেমন: পুলিশের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তদারকি।
- বিদ্রোহ বা শৃঙ্খলাভঙ্গ প্রতিরোধে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি।
- অপরাধী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করা।
- বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য নীতি এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানো।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- **বিদ্রোহ প্রতিরোধে আরও আধুনিক প্রশিক্ষণ:** পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি এবং বিদ্রোহ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটি পুলিশ সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করবে।
- **উপর্যুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা:** পুলিশের অধিকার সংরক্ষণ এবং বেতন ও কাজের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে বাহিনীর মধ্যে সন্তুষ্টি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।
- **নাগরিক অভিযোগ শুনানি ব্যবস্থা:** সাধারণ জনগণ যদি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে, তবে তাদের অভিযোগের যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। এটি পুলিশের উপর নজরদারি বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

- **মনোবিজ্ঞানী বা মানসিক পরামর্শদাতার ব্যবস্থা:** পুলিশের মানসিক চাপ ও অসন্তুষ্টির নিরসনে মানসিক পরামর্শদাতার সাহায্য নিলে বাহিনীর সদস্যরা আরো ভালো মানসিক অবস্থায় থাকতে পারবেন।

ফলাফল:

উপরোক্ত সংস্কার বাস্তবায়ন করলে পুলিশ বাহিনীর ভেতরে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে, এবং বাহিনীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। বিদ্রোহ বা শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা কমে আসবে, এবং বাহিনী আরও পেশাদার ও জনবান্ধব হয়ে উঠবে।

৯। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ প্রণয়ন করা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা এবং জনগণের সুস্থ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য। এ আইনটির প্রাথমিকভাবে মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, এবং পরিবেশগত সুরক্ষা বৃদ্ধির করা । আইনটি পরিবেশ সংরক্ষণে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য বেশ কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

- পরিবেশ দূষণ: বায়ু, পানি, মাটি, বা শব্দ দূষণ করে এমন কর্মকান্ডের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।
- বনভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈধ শোষণ।
- শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দূষণকারী কার্যক্রম পরিচালনা, যা অনুমোদিত নয়।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার ও তার যথাযথ নিষ্পত্তি না করা।

পুলিশের ভূমিকা

- পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা।
- পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলাগুলি তদন্ত করা এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা।
- অবৈধ বন নিধন, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা এবং এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে কাজ করা।
- পরিবেশগত বিপদ মোকাবিলায় পুলিশের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকলে প্রান্তিক অঞ্চলে পরিবেশ সুরক্ষার কার্যকারিতা বাড়ানো সম্ভব হবে।
- এই আইনে পুলিশের ক্ষমতা থাকলে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় পরিবেশগত সুরক্ষায় সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের প্রস্তাবনা

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ সংস্কারের মাধ্যমে আরও আধুনিক, কার্যকর এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কিছু প্রস্তাবনা হলো:

- জরিমানার হার বৃদ্ধি করা, যাতে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি দূষণ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে।
- নতুন ধারা সংযোজন করা, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও কার্বন নির্গমনের মতো নতুন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে।

- প্রযুক্তিগত ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ ব্যবস্থা উন্নত করা, যাতে দূষণকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করা যায়।
- স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া।
- শিল্পকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মানদণ্ড আরও কঠোর করা।

ফলাফল

- **পরিবেশের মান** উন্নত হবে, যা মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হবে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব** কমাতে সহায়তা করবে, ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ কমবে।
- **পর্যটন শিল্প** বিকশিত হবে, কারণ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে।

১০। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

নারী ও শিশুদের ওপর যে কোনো ধরণের নির্যাতন, যৌন সহিংসতা, পাচার, এবং শারীরিক নির্যাতন প্রতিরোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারা:

ধারা ৯(১): ধর্ষণ

ধারা ৯(২): গণধর্ষণ

ধারা ৯(৩): ধর্ষণের ফলে মৃত্যু

ধারা ১১(গ): যৌতুকের জন্য নির্যাতন

ধারা ১৩: পাচার

ধারা ১০: যৌন হয়রানি বা শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শারীরিক নির্যাতন

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:

- **ধর্ষণের মামলা:** কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করলে বা গণধর্ষণের শিকার হলে ধারা ৯(১) এবং ৯(২)-এর অধীনে মামলা করা হয়।
- **যৌতুকের জন্য নির্যাতন:** কোনো নারীকে যৌতুকের জন্য নির্যাতন করলে ধারা ১১(গ)-এর অধীনে মামলা করা হয়।
- **নারী বা শিশু পাচার:** কোনো নারী বা শিশুকে বিদেশে পাচার করলে ধারা ১৩-এর অধীনে মামলা করা হয়।
- **শ্লীলতাহানি বা যৌন হয়রানি:** কোনো নারী বা শিশুর প্রতি শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে যৌন হয়রানি করলে ধারা ১০-এর অধীনে মামলা করা হয়।

পুলিশের ভূমিকা

এ আইনের অধীনে পুলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা হলো:

- **অভিযোগ গ্রহণ:** নির্যাতনের অভিযোগ বা মামলা দায়ের হলে পুলিশ তা গ্রহণ করে এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করে।
- **তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহ:** পুলিশের দায়িত্ব হলো নির্যাতনের মামলাগুলোর নিরপেক্ষ ও কার্যকর তদন্ত চালানো। প্রমাণ সংগ্রহে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়ক।
- **গ্রেফতার ও শাস্তি প্রয়োগ:** সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করে বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং আদালতে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করা।
- **ভিকটিম সুরক্ষা ও পুনর্বাসন:** আইন অনুযায়ী পুলিশকে ভিকটিমদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও সেবা সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে হয়।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- **ধারা ৯ (ধর্ষণ):** ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইনের ব্যবস্থাগুলি আরও কঠোর করা এবং দ্রুত বিচারের জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনালের সুপারিশ।
- **ধারা ১১ (যৌন নির্যাতন ও হেনস্থা):** যৌন হয়রানি বা হেনস্থা সম্পর্কিত আইনের ব্যাখ্যাগুলি স্পষ্ট করা, যাতে প্রতিটি ধরনের হেনস্থাকে আইনি কাঠামোতে সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- **ধারা ১৪ (তদন্তের সময়সীমা):** তদন্তের নির্ধারিত সময়সীমা প্রণয়ন করা, যাতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভিকটিম ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়।
- **ধারা ১৬ (পুলিশ ও ভিকটিমের সুরক্ষা):** পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা, যাতে তারা ভিকটিমদের সাথে সংবেদনশীল ও সম্মানজনক আচরণ করতে পারে এবং অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সতর্ক হয়।
- **ধারা ১৮ (ভিকটিম সুরক্ষা প্রোগ্রাম):** ভিকটিমদের সুরক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম চালু করা, যা তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করবে এবং পরবর্তী জীবনে মানসিক ও শারীরিক সমর্থন দেবে।

ফলাফল

- **ত্বরিত ন্যায়বিচার:** আইনের কঠোর প্রয়োগ ও তদন্তের নির্ধারিত সময়সীমার কারণে দ্রুত বিচার সম্পন্ন হবে, ফলে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।
- **ভিকটিম সুরক্ষা ও মানসিক পুনর্বাসন:** নতুন ভিকটিম সুরক্ষা প্রোগ্রাম ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার ফলে নির্যাতিতদের মানসিক সহায়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, যা তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সহজ করবে।
- **সাধারণ জনগণের আস্থা বৃদ্ধি:** পুলিশের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়ানোর ফলে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় অভিযোগ দায়ের করতে সক্ষম হবেন।
- **সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস:** আইনের কঠোর ও দ্রুত প্রয়োগ অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করবে এবং সমাজে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পাবে।
- **পুলিশের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি:** পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বাড়বে এবং তারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

১১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬

দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা ও অনলাইন অপরাধ মোকাবিলার জন্য প্রণীত একটি আইন, যা বিভিন্ন সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে। ২০১৩ সালের সংশোধনীতে আইনটি আরও কঠোর করা হয় এবং নতুন ধারা সংযোজন করা হয়।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারা:
ধারা ৫৭: অনলাইনে মিথ্যা, অশালীন, মানহানিকর বা আপত্তিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার
ধারা ৬৬: সাইবার অপরাধের জন্য শাস্তি
ধারা ৫৪: কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসে অননুমোদিত প্রবেশ
ধারা ৫৫: কম্পিউটার বা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার ক্ষতি করা
ধারা ৫৬: কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা ব্যাঘাত ঘটানো
ধারা ৬৩: ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন

উদাহরণ:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো: ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া তথ্য, মানহানিকর পোস্ট এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা হুমকির অভিযোগে বেশ কিছু মামলা ধারা ৫৭-এর অধীনে করা হয়েছে।
অপরের অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং: কারও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট বা ইমেইল হ্যাকিং এর অভিযোগে ধারা ৫৪ ও ৫৫-এর অধীনে মামলা করা হয়েছে।
ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও ছড়ানো: ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে দিয়ে কাউকে হয়রানি করলে ধারা ৫৭-এর অধীনে মামলা করা হয়।
ওয়েবসাইট বা সার্ভারে হ্যাকিং: কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হ্যাক করা হলে ধারা ৫৬ এর অধীনে মামলা হয়।
এই আইনটি বিশেষ করে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে এবং মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, বিশেষ করে ধারা ৫৭ অপব্যবহারের কারণে সমালোচিত হয় এবং পরবর্তীতে এটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়।

পুলিশের ভূমিকা

- **অপরাধ তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহ:** পুলিশ সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত চালায় এবং ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ করে।
- **ডিজিটাল নজরদারি:** আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে নজরদারি চালায়, যাতে কেউ গুজব বা অপরাধমূলক কনটেন্ট প্রচার না করতে পারে।
- **গ্রেফতার ও আইনের আওতায় আনা:** সাইবার অপরাধে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা, গ্রেফতার এবং যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** সাধারণ জনগণকে অনলাইনে নিরাপদ থাকা এবং সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে পুলিশ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ (২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন) এর প্রজাবনা মোতাবেক তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণীত। গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথা প্রাপ্তির অধিকার চিয়া, বিবেক ও বাক। স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকারকে শক্তিশালী ভিত প্রদানের সফলতার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বাচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে যেমন প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহ তেমনি দেশের নিরাপত্তা ও বৃহত্তর পরিসরে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তি প্রয়োজন তথ্য প্রদান প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কাজের ধরণ ও প্রকৃতিগত কারণে সকল সময় সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না বিধায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ (২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন)-এর ধারা-৭ মোতাবেক কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর তথ্যসমূহকে এই আইনের আওতার বাহিরে রাখা হয়েছে। উদাহরণসরূপ পুলিশিং সংক্রান্ত কয়েকটি উপ-ধারা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমনঃ ধারা-৭ এর উপ-ধারা-৭(৩৯) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক যোগনে প্রদত্ত কোন তথা। উপ-ধারা-৭(১) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য, উপ-ধারা-৭(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথা। ইত্যাদি, যদিও এ ধারার অধীন আলোচ্য উপ-ধারাসমূহসহ অন্যান্য উপ-ধারায় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ না করার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধিকন্তু দেশের নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ বিবেচনায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা-৩২ মোতাবেক তপশিলভুক্ত করে কিছু প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতার বাহিরে রাখা হয়েছে। বর্ণিত তফসিলে বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি, এসবি ও র‍্যাবের গোয়েন্দা সেলও তপশিলভুক্ত রয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থা পিবিআই। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) যা ২০১১ সালে গঠিত হয়ে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে। শুধুই তদন্ত কার্যক্রমকে ফোকাস করে কাজ করতে থাকা এই সংস্থার অধিকাংশ তথ্য নিরপেক্ষ-তদন্ত-সম্পাদন ও জনস্বার্থ রক্ষায় 'প্রকাশ না করার ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থা'র তালিকায় থাকা যৌক্তিক ও সুষ্ঠু তদন্ত কার্যক্রমের সহায়ক। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ আইনটি পিবিআই গঠনের পূর্বে প্রণীত হওয়ায় প্রণয়নকালীন সময়ে পিবিআই সংস্থাটি। তপশিলভুক্ত না হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। তাছাড়া, ২০১৭ সাল থেকে জঙ্গিকার্যক্রম ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ পুলিশের এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষে উক্ত ইউনিটকে অনেক স্পর্শকাতর গোয়েন্দা তথ্য-উপার নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই এসমস্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হলে সামগ্রিকভাবে এ ইউনিটের কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা সেল/শাখাসমূহের কার্যক্রমও নিরাপত্তাজনিত কারনে জনস্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এর ধারা-৩২(৪) মোতাবেক সরকার তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে, সময়-সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত তপশিল সংশোধন করতে পারবে এবং তফসিলে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।।
- এমতাবস্থায়, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) ও বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা সেল/শাখাসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত ও সমুন্নত রাখার জন্য

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতা বহির্ভুক্তির তপশিলভূক্ত করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত বসড়া প্রয়নন আপনার সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

- **ধারা ৫৭**: এই ধারায় গুজব প্রচার, মানহানি এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের জন্য শাস্তির বিধান ছিল, যা বিতর্কিত হয়েছিল। এটিকে আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, যাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং এটি অযথা অপব্যবহার না হয়।

ফলাফল

- **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা**: ধারা ৫৭-এর সংস্কারের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখানো হবে এবং অযথা হয়রানি বন্ধ হবে।
- **ত্বরিত ন্যায়বিচার**: তদন্ত প্রক্রিয়া ও সময়সীমা নির্ধারণের ফলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এবং ভুক্তভোগীরা ত্বরিত ন্যায়বিচার পাবে।
- **ডিজিটাল নিরাপত্তা বৃদ্ধি**: নতুন সাইবার অপরাধ সংজ্ঞা ও পুলিশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, যা জনগণকে অনলাইনে সুরক্ষিত রাখবে।
- **গোপনীয়তা রক্ষা**: গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ধারা সংযোজনের ফলে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, যা ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- **পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি**: সাইবার অপরাধ দমনে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়বে এবং তারা আরও কার্যকরভাবে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারবে।

১২। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১০ সালে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। এটি মূলত নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গৃহস্থালী বা পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ঘটে যাওয়া সহিংসতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

- **ধারা ৩ (সহিংসতার সংজ্ঞা)**
- **ধারা ৬ (অভিযোগ দাখিল)**
- **ধারা ১০ (অস্থায়ী প্রতিকার)**
- **ধারা ১৫ (রক্ষাকবচ আদেশ)**
- **ধারা ২১ (সহায়তা কেন্দ্র)**

পুলিশের ভূমিকা

- **অভিযোগ গ্রহণ**: পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশকে তা গ্রহণ করতে হয় এবং প্রাথমিকভাবে তদন্ত করতে হয়।
- **অস্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা**: আইন অনুযায়ী পুলিশকে ভিকটিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এটি রক্ষাকবচ আদেশ বাস্তবায়ন এবং ভিকটিমকে নির্যাতনকারীর থেকে নিরাপদ রাখায় সহায়ক।

- **তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহ**: সহিংসতার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের দায়িত্ব হলো নির্যাতনের প্রমাণ সংগ্রহ করে সঠিক বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।
- **সহায়তা কেন্দ্রে পাঠানো**: ভিকটিমদের পুনর্বাসন এবং পরবর্তী সেবার জন্য পুলিশকে সহায়তা কেন্দ্রে পাঠানোর বিষয়েও সহায়তা করতে হয়।

সংস্কারের প্রস্তাবনা

- **ধারা ৬ (অভিযোগ দাখিল)**: অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে করে অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা দূর হবে।
- **ধারা ১০ (অস্থায়ী প্রতিকার)**: অস্থায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ভিকটিমদের নিরাপত্তার জন্য পৃথক আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন, যা আঞ্চলিকভাবে সহজে প্রবেশযোগ্য হবে।
- **ধারা ১৫ (রক্ষাকবচ আদেশ)**: রক্ষাকবচ আদেশের বাস্তবায়নে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন, যাতে অভিযোগকারী দ্রুত প্রতিকার পান এবং নির্যাতনকারী পুনরায় হেনস্থা করতে না পারে।
- **ধারা ২১ (সহায়তা কেন্দ্র)**: সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা ও সেবা বাড়ানোর প্রয়োজন, যাতে ভিকটিমরা মানসিক ও আইনি সহায়তা পেতে সহজেই সেখানে পৌঁছাতে পারে। পাশাপাশি ভিকটিমদের জন্য মানসিক ও কাউন্সেলিং সেবার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা দরকার।
- **ধারা ২৩ (প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা)**: পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, যাতে তারা পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আরও সংবেদনশীল ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে এবং আইনি কাঠামো অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হয়।

ফলাফল

- **ভিকটিমদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ**: অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার ফলে নির্যাতিতরা ত্বরিত সুরক্ষা পাবে এবং সুরক্ষা আদেশ দ্রুত কার্যকর হবে।
- **সহিংসতার প্রবণতা কমানো**: অস্থায়ী প্রতিকার ও রক্ষাকবচ আদেশ কঠোর হলে পারিবারিক সহিংসতা কমে আসবে এবং অপরাধীরা ভয় পাবে।
- **ভিকটিমের পুনর্বাসন ও মানসিক সহায়তা**: সহায়তা কেন্দ্র ও কাউন্সেলিং সেবার ব্যবস্থা উন্নত হলে ভিকটিমরা মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ হতে সহায়তা পাবে এবং পুনর্বাসিত হবে।
- **সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি**: আইনের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপারে সাধারণ জনগণ সচেতন হবে এবং তারা দ্রুত আইনগত সহায়তা নিতে উদ্বুদ্ধ হবে।
- **ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ**: পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রশিক্ষণের ফলে তারা আরও দক্ষতার সাথে এবং সঠিকভাবে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবে, যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।
- বর্তমানে কেবল আদালত সুরক্ষা আদেশ প্রদান করতে পারে। যদি পুলিশকে জরুরি পরিস্থিতিতে সাময়িক সুরক্ষা আদেশ প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে আদালতে পৌঁছানো কঠিন হতে পারে, সেখানে ভুক্তভোগীরা দ্রুত সুরক্ষা পাবে।
- পুলিশকে অনুমোদিত সেবা প্রদানকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, পুলিশ তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান করতে পারবে এবং ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতের আদেশ পাওয়া না যায়।

১৩। বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

বাংলাদেশের নদ-নদীর প্রধান সংকট চারটি; প্রবাহস্বল্পতা, দখল, দূষণ, বালু উত্তোলন। এই চার সংকটই আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সংক্ষেপে বলি। প্রবাহস্বল্পতা দেখা দিলে সেই নদীতে প্রথমে দখলের আপদ আসে। কারণ প্রবহমান নদীতে দখলের প্রকোপ কম। যে কারণে আমরা দেখি, গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের মতো প্রবল নদীতে দখল দূরে থাক, মানুষ বরং নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়। নদী দখল করে যখন আবাসিক, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে, সেগুলোর হাত ধরে আসে দূষণ। আবার প্রবাহ যখন কমে যায়, তখন বালু উত্তোলন শুরু হয়। যখন নগর বা জনপদ সম্প্রসারিত হতে থাকে, তখন তার প্রয়োজনে কাছ থেকেই বালু উত্তোলন শুরু হয়।

কর্তৃপক্ষ ইজারা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। অথচ আইন বলছে, বালু তুলতে গেলে বিআইডব্লিউটিএ হাইড্রোগাফিক জরিপ করে ছাড়পত্র দেবে, তারপর বালু তুলতে পারবে ইজারাদার। বালু তোলার আগে, সময় ও পরে নদীর পরিস্থিতি দেখার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে পরিদর্শন ও জরিপ করার কথা। বালু উত্তোলনের কারণে পরিবেশ বা প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওই বালুমহাল বিলুপ্ত করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ম প্রয়োগে তেমন আগ্রহ নেই বলে প্রতীয়মান।

পুলিশের ভূমিকা

- অনুমোদনহীন বা অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অবৈধ উত্তোলন বন্ধে হস্তক্ষেপ।
- স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ে অবৈধ উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা।
- বালু ও মাটির বৈধ উত্তোলন ও পরিবহন নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি।
- জনস্বার্থে বালু ও মাটি সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সংস্কার প্রস্তাবনা

শাস্তি, জরিমানা, কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ কী ? আইনের তো প্রয়োগ হচ্ছে না। তাই সংস্কার করা খুবই জরুরি।

ফলাফল

বালু ও মাটির বৈধ উত্তোলন ও পরিবহন নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে নতুন ভূমি সম্প্রসারিত হবে, অন্যদিকে ব-দ্বীপের ভূমি ক্ষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য তৈরি করবে। আমাদের ভূমির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকবে।

১৪। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রতিরোধ এবং দমন করার জন্য প্রণীত একটি আইন। এই আইনটি অর্থের অবৈধ উৎস থেকে অর্জিত অর্থের বৈধতা দেওয়া এবং অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারা:

ধারা ২: সংজ্ঞা

ধারা ৪: মানিলন্ডারিং অপরাধ

ধারা ৫: অপরাধের জন্য শাস্তি
ধারা ৬: সম্পদের বাজেয়াপ্তি
ধারা ৮: অর্থ পাচারের অভিযোগের তদন্ত

পুলিশের ভূমিকা:

- **তদন্ত পরিচালনা**: পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর মানিলন্ডারিংয়ের ঘটনা তদন্ত করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে।
- **গ্রেপ্তার**: পুলিশ অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- **অর্থ বাজেয়াপ্ত করা**: তদন্তের সময় অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করে এবং আদালতে প্রমাণ পেশ করে।
- **জনসচেতনতা**: মানিলন্ডারিং সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:

- **অর্থ পাচার মামলা**: একটি ব্যাংক থেকে বৃহৎ পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধারা ৪ এবং ৫-এর আওতায় মামলা করে।
- **সম্পদ বাজেয়াপ্তি**: পুলিশের তদন্তে প্রমাণিত হয় যে কোনো ব্যক্তি মানিলন্ডারিংয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে, তখন সেই সম্পদ ধারা ৬-এর আওতায় বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সংস্কার প্রস্তাবনা

বিভিন্ন আর্থিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর কিছু ধারায় সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো হলো:

- বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকতর চাঞ্চল্যকর ও স্পর্শকাতর মামলা, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদের বিস্তাররোধসহ সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনা এবং অর্থপাচার প্রতিরোধে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ঢাকা মেট্রোপলিটন, পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল এনইম (সিটিটিসি) এবং এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) কাজ করে আসছে। সর্বমহলে স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পুলিশ বুরো অব ইনভেস্টিগেশন বিধিমালা, ২০১৬ এর তপশিলভুক্ত অপরাধসমূহ যেমন-খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, প্রতারণা, মানবপাচার, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদন, মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত ইত্যাদি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা-২(ঠ)-এ বর্ণিত 'সম্পৃক্ত অপরাধ বা Prodicate Offence' এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে এন্টি টেররিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯ এ বিধি-৮(১) মোতাবেক সন্ত্রাস বিরোধী আইনের পাশাপাশি তপশিলে আলোচা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা-২(১) (২১) এবং (২৭) ৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও ২৩ এ বর্ণিত অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা মেট্রোপলিটিক পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট অবৈধ অস্ত্রের ব্যাবসা, মানব-পাচার, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগান, সংঘবদ্ধ অপরাধসহ ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমসমূহ তদন্ত করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তদন্তের এক পর্যায়ে শুধুমাত্র আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে মামলার তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করে অন্য সংস্থায় হস্তান্তর করতে হয় ফলে ন্যায় বিচার বিলম্বিত হয়।

- যেযেতু ২০১৫ সালে এই আইনটি অধিকতর সংশোধনসহ উক্ত আইনের ধরা-২(ঠ) এ বর্ণিত সম্পৃক্ত অপরাধ বা Predicate Offence'-এর তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক তদন্তযোগ্য বিবেচনায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করায় সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সহজতর হয়েছে সেহেতু চাঞ্চল্যকর ও স্পর্শকাতর মামলাসমূহ, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসী কার্যে এবং উক্তরূপ কার্যের অর্থায়নে জড়িত ব্যক্তি বা সত্ত্বার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অনুসন্ধান এবং এতৎসংক্রান্ত রুজুকৃত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের সুবিধার্থে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা-২(১)-এ বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটাটিসি) এবং এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)-কে অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে সম্পৃক্ত অপরাধ বা Predicate Offence' সুষ্ঠু তদন্তের সুবিধার্থে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তনয় বিয়াগ (সিআইডি)-এর ন্যায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিগাদি) এবং এটি টেররিজম ইউনিট (এটিইড)-কে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর খরা-২(১) এবং মালিয়ালি বিধিমালা, ২০১৯ এর তপশিলে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য খসড়া প্রস্তাবনা সদয় অবগতিসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এরয়াদে তোরণ করা হলো।
- **ধারা ২ (মানি লন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা)**: এই ধারায় মানি লন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা আধুনিক আর্থিক প্রযুক্তি (ফিনটেক) ও ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে হওয়া অর্থ পাচার অন্তর্ভুক্ত করে আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন। এতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে মানি লন্ডারিং আটকানো সহজ হবে।
- **ধারা ৫ (অবৈধ সম্পদের উৎস)**: অবৈধ সম্পদের উৎসের সঠিক তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করার জন্য আরও কঠোর বিধান প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে দোষী প্রমাণিত হলে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা জরুরি।
- **ধারা ১২ (আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি)**: আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানি লন্ডারিং চিহ্নিত করতে নির্দিষ্ট সময়সীমায় পর্যবেক্ষণ করা এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান প্রয়োজন। এখানে আধুনিক সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- **ধারা ১৫ (রিপোর্টিং ও তথ্য আদান-প্রদান)**: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সংযোজন প্রয়োজন। এতে রিপোর্টিং সময়সীমা সংক্ষিপ্ত হবে এবং সময়মত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।
- **ধারা ১৯ (অপরাধীদের শাস্তি)**: মানি লন্ডারিং অপরাধে অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রয়োজন, যেখানে এই ধরনের মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।
- **ধারা ২৩ (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)**: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে তথ্য ভাগাভাগি এবং যৌথ তদন্তের বিধান আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

ফলাফল

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধির ফলে অবৈধ লেনদেন শনাক্ত করা সহজ হবে এবং আর্থিক খাত আরও সুরক্ষিত থাকবে।
- মানি লন্ডারিং মামলার জন্য পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ফলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এবং অর্থ পাচারকারীদের শাস্তি নিশ্চিত হবে।
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে তথ্য ভাগাভাগির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধার ও অপরাধীদের দ্রুত বিচার করা সম্ভব হবে।

১৫। শিশু আইন, ২০১৩

বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। এই আইন মূলত শিশুদের প্রতি নির্যাতন, অবহেলা, এবং বিভিন্ন ধরনের শোষণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং শিশুদের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থার ব্যবস্থা করে। আইনটি শিশুদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নেও সহায়ক।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

- **ধারা ৪ (শিশুর সংজ্ঞা)**: এই ধারায় ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- **ধারা ১৫ (শিশু আদালত)**: শিশুর জন্য পৃথক আদালতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তাদের বিচারপ্রক্রিয়া আলাদাভাবে পরিচালনা করা যায় এবং এটি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **ধারা ২১ (অবশ্যই অভিভাবক বা সামাজিক সেবা প্রতিনিধির উপস্থিতি)**: শিশুর ক্ষেত্রে পুলিশ বা আদালত অভিভাবক অথবা সমাজসেবা প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।
- **ধারা ৪৪ (আটক, গ্রেফতার ও আটকাদেশ)**: এই ধারায় শিশুদের গ্রেফতার বা আটক করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীলতা বজায় রেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে।
- **ধারা ৫২ (নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা)**: শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধে কঠোর বিধান রয়েছে, যা শিশুর সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুলিশের ভূমিকা

- **গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা**: শিশুকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বিশেষ সংবেদনশীলতার সঙ্গে আচরণ করা। শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের মতো গ্রেফতার না করা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- **শিশু আদালতে মামলা প্রেরণ**: শিশুদের মামলাগুলো শিশু আদালতে প্রেরণ করা এবং আইনি প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা, যাতে তারা সুষ্ঠু বিচার পায়।
- **সমাজসেবা প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ**: শিশুর সাথে পুলিশি প্রক্রিয়ায় একজন সমাজসেবা প্রতিনিধি বা অভিভাবকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহায়তা**: শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বা শোষণ শনাক্ত করা, প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- **ধারা ৭০ (সহিংসতা থেকে সুরক্ষা)**: পুলিশকে শিশুর সুরক্ষায় সংযুক্ত করা হলে, শিশুর প্রতি শোষণ ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা প্রদান সম্ভব হবে।

- **ধারা ৮৬ (ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে শিশুকে অপসারণ)**: জরুরি পরিস্থিতিতে শিশু সুরক্ষায় পুলিশের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকলে, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হবে।

- **শিশু আদালত ও সংশোধনাগারের উন্নয়ন:** শিশু আদালত এবং শিশু সংশোধনাগারের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিশুদের মানসিক পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থা বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে শিশুরা মানসিক সহায়তা পায় এবং পুনর্বাসিত হতে পারে।

ফলাফল

- **শিশুদের বিচারপ্রক্রিয়া সহজ হবে:** দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত হলে শিশুরা দ্রুত তাদের বিচার পাবে এবং তাদের জীবনে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে ফিরে আসতে পারবে।
- **অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে:** শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বা শোষণের শাস্তি আরও কঠোর হলে এই ধরনের অপরাধ কমে আসবে এবং শিশুদের প্রতি অন্যায় আচরণ রোধ করা সম্ভব হবে।
- **সমাজসেবা প্রতিনিধিদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে:** তাদের দায়িত্ব স্পষ্ট করা হলে শিশুর সুরক্ষা ও পুনর্বাসন আরও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।
- **শিশুদের মানসিক পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ:** মানসিক পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থা বাড়ানোর ফলে শিশুরা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়ক হবে।
- **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** পুলিশ এবং সমাজসেবা প্রতিনিধিদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়বে, যা ভবিষ্যতে শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও শোষণের ঝুঁকি কমাবে।

১৬। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর মূল লক্ষ্য হল খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা এবং জনসাধারণকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। এই আইনের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল, অনিরাপদ বা ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রণ, এবং অন্যান্য খাদ্য সংক্রান্ত অনিয়মকে দমন করা হয়। এর মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমুহ

- ধারা ২৩: খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ বা অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, বিতরণ বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান।
- ধারা ২৪: খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার বা খাদ্যে নিষিদ্ধ পদার্থ মেশানোর ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান।
- ধারা ২৯: মান নির্ধারিত খাদ্য নীতিমালা লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

পুলিশ এর ভুমিকা

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর করতে পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ এই আইনের অধীনে প্রাথমিক তদন্ত, অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ, অভিযুক্তদের গ্রেফতার, এবং আদালতে প্রেরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়া, বিভিন্ন অভিযানে পুলিশের উপস্থিতি আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং জনমনে ভীতি সৃষ্টি করে, যা খাদ্য অপরাধ কমাতে সাহায্য করে।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- সাজা আরও কঠোরকরণ: কিছু ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা কম থাকায় অপরাধীরা বার বার একই অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। তাই শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত।
- অন্যান্য সংস্থা ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্তকরণ: শুধুমাত্র পুলিশই নয়, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইনে সংশোধন আনা প্রয়োজন।
- প্রযুক্তির ব্যবহার: তদন্ত প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ধারা যোগ করা উচিত। এতে প্রমাণ সংগ্রহ ও তদন্ত আরও কার্যকর হবে।

ফলাফল

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির ফলে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যাবে:

- খাদ্যে ভেজাল কমবে: কঠোর শাস্তি এবং কার্যকর আইন প্রয়োগের ফলে অপরাধীরা এ ধরনের অপরাধ করতে ভয় পাবে।
- ভোক্তার আস্থা বৃদ্ধি: নিরাপদ খাদ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আস্থা বাড়বে।
- তদন্ত প্রক্রিয়ার উন্নতি: প্রযুক্তি ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় দ্রুত এবং নির্ভুল তদন্ত করা সম্ভব হবে।
- এই সংস্কারের ফলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

১৭। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন, ২০১৩

বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যার মাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে বা অন্য কোনো ক্ষমতাসীন সংস্থার অধীনে নির্যাতন ও মৃত্যু প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের প্রণয়ন একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ ছিল, যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমুহ

- ধারা ৩: নির্যাতনের সংজ্ঞা এবং এর আওতায় যেসব কর্মকাণ্ড আসে তা নির্ধারণ করে।
- ধারা ৪: নির্যাতনের জন্য শাস্তির বিধান।
- ধারা ৫: হেফাজতে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের জন্য শাস্তি নির্ধারণ।
- ধারা ৬: অপরাধ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ধারা ৭: অভিযুক্ত কর্মকর্তার শাস্তি।

পুলিশ এর ভূমিকা

পুলিশ এ আইনের অধীনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের দায়িত্ব হলো অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নির্যাতন বা অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা। পুলিশ হেফাজতে যেকোনো ধরনের নির্যাতন বা মৃত্যুর ঘটনা এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের সুরক্ষার ব্যবস্থা: হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আরো কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত।

- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি: পুলিশ কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি এবং জবাবদিহিতার সিস্টেম উন্নত করা।
- স্বাধীন তদন্ত সংস্থা: নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন তদন্ত সংস্থা গঠন করা যাতে নির্যাতনের অভিযোগ যথাযথভাবে তদন্ত করা যায়।
- প্রশিক্ষণ: পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্যাতন এবং মানবাধিকার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

ফলাফল

এই আইনে সংস্কার আনয়নের ফলে কিছু সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে:

- পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।
- হেফাজতে নির্যাতন এবং মৃত্যুর হার কমবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- পুলিশের কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, যা তাদের নিজেদের আচরণেও শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।
- আদালত, আইনজীবী, এবং মানবাধিকার সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে "নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন, ২০১৩" সঠিকভাবে কার্যকর করতে পারলে দেশের আইনের শাসন এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ হবে।

১৮। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮

বাংলাদেশে সংক্রামক রোগের বিস্তার প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও রোগ নির্মূলে এই আইনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ডেঙ্গু, কলেরা, যক্ষ্মা, এবং সাম্প্রতিককালে কোভিড-১৯ এর মতো সংক্রামক রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। এ ধরনের মহামারি নিয়ন্ত্রণ করতে, রোগের দ্রুত বিস্তার রোধে এবং সংক্রমিত রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী আইন প্রয়োজন। ২০১৮ সালে প্রণীত এই আইনটির মাধ্যমে সরকারকে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

- ধারা ৪: সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।
- ধারা ৫: সংক্রামক রোগী বা সন্দেহজনক রোগীর চলাচলে সীমাবদ্ধতা এবং আইসোলেশন নিশ্চিত করা।
- ধারা ৯: সংক্রামক রোগের তথ্য গোপন করার জন্য শাস্তির বিধান।
- ধারা ১১: সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে জনস্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ।
- ধারা ১৩: সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে বা দায়িত্বে অবহেলা করলে শাস্তি নির্ধারণ।

পুলিশ-এর ভূমিকা

পুলিশ এই আইনের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের দায়িত্ব হলো:

- সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকার ঘোষিত নির্দেশনাগুলো কার্যকর করা।

- আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টাইন বিধিমালা কার্যকর করা এবং জনগণকে জনস্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে বাধ্য করা।
- কোনো ব্যক্তির চলাচলে সীমাবদ্ধতা আরোপ এবং বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া।

আইনে সংস্কার প্রয়োজনীয়তা

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে আরো কার্যকর করতে কিছু ক্ষেত্রে আইনের সংস্কার প্রয়োজন হতে পারে:

- **ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা:** সংক্রামক রোগীর চলাচল এবং সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার।
- **সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জরুরি ক্ষমতা বৃদ্ধি:** বিশেষ মহামারির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য জরুরী ক্ষমতা প্রদান করা।
- বিধি লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, যাতে মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য হয়।
- **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক প্রচারণা চালানো।

সংস্কারের ফলাফল

এই আইনে সংস্কার আনয়নের ফলে কিছু সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলাফল হতে পারে:

- মহামারির সময়ে সংক্রামক রোগের বিস্তার দ্রুত রোধ করা যাবে।
- জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।
- সরকার ও স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়বে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে।
- রোগীদের সঠিকভাবে ট্র্যাক ও আইসোলেট করে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যতে মহামারি বা স্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।

১৯। ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩

বাংলাদেশে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ, অবৈধ দখল এবং জাল দলিলের মাধ্যমে জমি দখলের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অনেক মানুষ তাদের আইনসঙ্গত জমির মালিকানা রক্ষা করতে গিয়ে প্রতারণা, হয়রানি এবং বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৩ সালে প্রণীত ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ভূমি সংক্রান্ত অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ভূমিকা রাখে এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য আইনি ব্যবস্থা ও শাস্তি নির্ধারণ করে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ

- **ধারা ৩:** অবৈধভাবে জমি দখল করা বা দখলে সহায়তা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা।
- **ধারা ৫:** জাল দলিল বা কাগজপত্র তৈরি করা বা জমি সংক্রান্ত ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে প্রতারণা করা।
- **ধারা ৭:** প্রকৃত মালিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা, বা জমি-সংক্রান্ত বেআইনি কাজের মাধ্যমে ভোগদখল বাধাগ্রস্ত করা।
- **ধারা ১০:** ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে সঠিক আইনি প্রক্রিয়া মেনে না চললে বা আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান।

পুলিশের ভূমিকার ক্ষেত্রসমূহ

- অবৈধ জমি দখল প্রতিরোধে পুলিশ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করতে পারে।
- জমি সংক্রান্ত অভিযোগে পুলিশ তদন্ত পরিচালনা করবে।
- পুলিশ আদালতের আদেশে জমি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।
- ভূমি অধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের ক্ষমতা রয়েছে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে ভূমি বিরোধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।
- পুলিশ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে ভূমি বিরোধ সমাধান করবে।
- ভূমি অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পুলিশের সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইনে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

- প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ: যাতে প্রকৃত মালিক দ্রুত এবং সহজে তার জমির অধিকার প্রমাণ করতে পারে।
- অনলাইন রেকর্ড সিস্টেম: জমির মালিকানা, দলিল এবং অন্যান্য তথ্য ডিজিটালাইজেশন করা, যা ভূমি সংক্রান্ত প্রতারণা ও জালিয়াতি কমাতে সাহায্য করবে।
- জরিমানা ও শাস্তি বৃদ্ধি: ভূমি দখল ও জাল দলিল তৈরির ক্ষেত্রে শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ আরও বাড়ানো।
- স্বাধীন তদন্ত সংস্থা: ভূমি-সংক্রান্ত অপরাধের সঠিক তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা, যা পুলিশের ওপর চাপ কমাবে এবং তদন্তকে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ করবে।

সংস্কারের ফলাফল

- ভূমি সংক্রান্ত প্রতারণা, জালিয়াতি ও অবৈধ দখল কমবে।
- জমির প্রকৃত মালিকরা আইনি সুরক্ষা ও ন্যায্যবিচার পাবেন।
- পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা আরও সুসংহত ও কার্যকর হবে।
- ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা দ্রুত সম্পন্ন হবে, ফলে জনসাধারণের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাবে।
- জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য হবে, যা সম্পত্তি নিয়ে আইনসঙ্গত লেনদেনকে সহজ করবে।

২০। সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

ডিজিটাল বিশ্বে মানুষের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনলাইন নির্ভর হয়ে পড়েছে। তবে এর ফলে সাইবার অপরাধের ঝুঁকিও বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ বাংলাদেশের সাইবার অপরাধ দমন, সাইবার অপরাধী চিহ্নিত করা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই আইনের মাধ্যমে সাইবার জগতে প্রবেশ করা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ:

- ডেটা চুরি বা ডেটা অপরাধ: অবৈধভাবে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহার।

- হ্যাকিং: সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ের সিস্টেমে অবৈধ প্রবেশ।
- ফিশিং: অবৈধভাবে পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড তথ্য চুরি।
- নফইন্সিভ কনটেন্ট শেয়ারিং: অনলাইনে হুমকি বা গালাগাল ছড়িয়ে দেওয়া।
- সাইবার বুলিং এবং হ্যারাসমেন্ট: সামাজিক মিডিয়া বা অনলাইনে একজনের বিরুদ্ধে নির্যাতন বা শিকার করা।
- ফেক নিউজ ও গুজব: মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া।
- আইটি অপরাধ: সফটওয়্যার বা অন্যান্য প্রযুক্তি মাধ্যমে আইনি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন।

পুলিশ এর ভূমিকা:

- অপরাধ তদন্ত: সাইবার অপরাধের তদন্ত করা এবং অপরাধী চিহ্নিত করা।
- প্রযুক্তি ব্যবহার: সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রযুক্তি এবং টুলস ব্যবহার করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: সাইবার অপরাধ মোকাবেলা করতে পুলিশের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি: সাইবার নিরাপত্তার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা।

আইনে সংস্কার আনয়ন প্রয়োজন:

বর্তমান সাইবার নিরাপত্তা আইন কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিছু সংস্কারের প্রয়োজন:

- **ডাটা প্রাইভেসি ও সুরক্ষা:** ব্যক্তিগত ডেটার সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করা উচিত।
- **আইনগত সমন্বয়:** সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের আইনি প্রক্রিয়া এবং সমন্বয় গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- **ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহের পদ্ধতি:** ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইনি দিক থেকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।
- **তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন:** প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনকে মাথায় রেখে আইনসমূহ আপডেট করা প্রয়োজন।

ফলাফল:

এই আইনের প্রয়োগ এবং সংস্কার গুলোর ফলে:

- সাইবার অপরাধের হার কমানো: অপরাধীরা আইনের আওতায় আসবে, ফলে সাইবার অপরাধ কমবে।
- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: জনগণের তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবার নিরাপত্তা শিক্ষা বৃদ্ধি: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধি পাবে।

২১। পৌর পুলিশ আইন

বাংলাদেশে পৌর এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পৌর পুলিশ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও বাংলাদেশে সাধারণ পুলিশের পাশাপাশি পৌর পুলিশ রয়েছে, তবে এর কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে সীমিত এবং সুনির্দিষ্ট। পৌর পুলিশের উদ্দেশ্য হলো পৌরসভাগুলোর আওতাধীন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছোটখাটো অপরাধ রোধ করা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা, এবং পৌরসভার সেবা কার্যক্রমে সহযোগিতা করা। এ আইনের অধীনে পৌর পুলিশের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনার বিধান রয়েছে।

অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ:

পৌর পুলিশ আইন অনুযায়ী পৌর এলাকার ভেতরে কিছু অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ উল্লেখযোগ্য, যেমন:

- **পৌর এলাকায় শৃঙ্খলাভঙ্গ**: পৌর এলাকায় প্রকাশ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা যেমন মারামারি, গালিগালাজ বা বেপরোয়া গাড়ি চালানো অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।
- **পৌর আইন অমান্য করা**: পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অমান্য করলে পৌর পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।
- **অনুমোদন ছাড়া সভা বা জমায়েত**: কোনো জমায়েত বা সভা আয়োজন করতে হলে পৌরসভার অনুমোদন প্রয়োজন। অনুমোদনবিহীন সভা বা জমায়েতকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **দোকান বা হকারদের নিয়ন্ত্রণ**: অনুমোদন ব্যতীত দোকান বা ফুটপাতে ব্যবসা করলে পৌর পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

পুলিশের ভূমিকা:

- পৌর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পৌর পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তারা:
  পৌর এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।
- শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যানজট রোধে পদক্ষেপ নেয়।
- পৌর এলাকার হাট-বাজার এবং জনসাধারণের চলাচলে শৃঙ্খলা রক্ষা করে।
- পৌর পরিষদের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করে এবং পৌরসভার আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সংস্কার প্রস্তাবনা

- **পৌর পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি**: পৌর পুলিশের দায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- **প্রশিক্ষণ ও আধুনিক সরঞ্জাম**: পৌর পুলিশকে অপরাধ দমনে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা প্রয়োজন। এতে তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- **স্থানীয় জনগণের সহায়তায় কমিউনিটি পুলিশিং**: কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা চালু করা গেলে পৌর পুলিশ স্থানীয় জনগণের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারবে, যা অপরাধ প্রতিরোধে সহায়তা করবে।
- **আর্থিক ও প্রশাসনিক সংস্কার**: পৌর পুলিশের জন্য আর্থিক বাজেট বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক সংস্কার আনলে তারা উন্নত সুবিধা ও প্রণোদনা পাবে, যা তাদের কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়াবে।

ফলাফল:

এসব সংস্কারের ফলে পৌর পুলিশের দক্ষতা ও কার্যক্রমের পরিধি বাড়বে, ফলে পৌর এলাকায় সাধারণ অপরাধ দমন করা সহজ হবে। জনগণের নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের চলাচল

আরও শৃঙ্খলিত হবে। তদ্ব্যতীত, কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা কার্যকর হলে জনগণের সাথে পৌর পুলিশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে, যা অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

পুলিশ সদস্যদের জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন সরলীকরণ, ঝুঁকি ভাতা/আর্থিক প্রনোদনার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা **(মূল প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬.২ দ্রষ্টব্য ২৯ পৃষ্ঠা):**

পুলিশ সদস্যরা সমাজের নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন, যা একটি অত্যন্ত চাপপূর্ণ ও ঝুকিপূর্ণ কাজ। তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের জন্য শারীরিক এবং মানিসক স্বাস্থ্য, আবাসন, পর্যাপ্ত ছুটি, পেনশন সহজীকরণ, এবং আর্থিক প্রনোদনা নিশ্চিত করা অপিরহার্য। পুলিশ সদস্যদেরর শারীরিক ও মানিসক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা প্রতিদিন বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তাদের উপযুক্ত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা নিরাপদ এবং আরামদায়ক পরিবেশে বসবাস করেত পারেন। এটি তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত ছুটি ও বিশ্রামের সুযোগ পুলিশ সদস্যদের পুনরুজ্জীবিত হতে সাহায্য করে, যা তাদের কাজের প্রতি মনোযোগ এবং নিষ্ঠা বাড়ায়। সহজ পেনশন ব্যবস্থা অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে। ঝুকিভাতা, আর্থিক প্রনোদনা পুলিশ সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে, যা তাদের সাহসী কাজের জন্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সুতরাং এই সব বিষয় নিশ্চিত করা হলে পুলিশ বাহিনী আরো কার্যকরী ও সক্ষম হয়ে উঠবে যা সমগ্র সমাজে নিরাপত্তার উন্নয়নের সহায়তা করবে।

ক) শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার করার প্রস্তাবনা

পুলিশ সদস্যরা দেশের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। তাদের দায়িত্বের ধরন বিবেচনা করে তাদের শারীরিক স্বাস্থ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুস্থ ও সক্রিয় পুলিশ বাহিনীই দক্ষতার সাথে দেশের জনগণের সেবা দিতে পারে।

প্রস্তাবনা :

১. নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা :

- নিয়িমত ব্যবধানে সকল পুলিশ সদেস্যদের শারীরিক পরীক্ষা করা।
- পরীক্ষায় শারীরিক সক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানিসক স্বাস্থের মূল্যায়ন করা।
- পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত পরামর্শ ও চিকিৎসা দেওয়া।

২। সুষম খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা :

- পুলিশ লাইন সমূহে সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা।
- পর্যাপ্ত পরিমানে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। শারীরিক প্রশিক্ষণ :

- সকল পুলিশ সদস্যের জন্য নিয়মিত শারীরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শারীরিক প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রনোদনার ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপেনর অভ্যাস গড়ে তোলা।
- বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।

৪। চিকিৎসা সুবিধা :

- পুলিশ সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যথাযথ চিকিৎসক ও ওষুধের ব্যবস্থা করা।
- দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন দেশি/বিদেশি উন্নত হাসপাতাল/ডায়াগনিস্টিক সেন্টার এর সাথে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের জন্য ডিসকাউন্ট এর ব্যবস্থা করা।

৫। স্বাস্থ্য বীমা :

- পুলিশ সদস্যদের জন্য স্থাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা।
- বীমার আওতায় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা।

খ) মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার প্রস্তাবনা

পুলিশ সদস্যদের দেশের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চাপ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুস্থ ও মানসিক ভাবে সুস্থ পুলিশ বাহিনীই দক্ষাতার সাথে দেশের সেবা করতে পারবে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা :

১। নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

- সকল পুলিশ সদস্যের নিয়মিত ব্যবধানে মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
- পরীক্ষার মাধ্যমে চাপ, উদ্বেগ, হতাশা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার উপস্থিতি নির্ণয় করা।
- পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত পরামর্শ ও চিকিৎসা দেওয়া।

২। কাউন্সেলিং সুবিধা :

- সকল বড় পুলিশ ইউনিটে কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা।
- প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা।
- চাপ, উদ্বেগ, পারিবারিক সমস্যা এবং কর্মসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পরামর্শ দেওয়া।

৩। মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি :

- পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা।

- মানসিক সমস্যা সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা।
- মানসিক সমস্যা ভোগ করলে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

৪। কর্মপরিবেশের উন্নতি :

- পুলিশ ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানবিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
- অতিরিক্ত কাজের চাপ কমানো এবং কর্মঘন্টা নিয়ন্ত্রন করা।
- পুলিশ সদস্যদের মাঝে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে সুস্মৃতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সমস্যা ও অভিযোগ নিরসনের সহায়তা করা।
- সহকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

গ) স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করার প্রস্তাবনা

১। সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ :

পুলিশ সদস্যদের মধ্যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। নিয়মিত কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা যেতে পারে, যাতে তারা স্ট্রেস সনাক্তকরণ এবং মোকাবেলার কৌশল সম্পর্কে জানতে পারেন।

২। মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং :

একটি পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সেবা চালু করা উচিত, যেখানে সদস্যরা তাদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগের জন্য সহায়তা পেতে পারবেন। কাউন্সেলরদের মাধ্যমে সদস্যদের সমস্যা শুনে এবং কার্যকরী সমাধান দেওয়া সম্ভব।

৩। চাপ প্রশমন কৌশল :

নিয়মিত চাপ প্রশমল কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত। সদস্যদের জন্য মেডিটেশন, যোগব্যায়াম এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের কার্যক্রমের আয়োজন করা উচিত। এই ধরনের কৌশলগুলি তাদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।

৪। অবসর ও বিনোদন :

পুলিশ সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন পিকনিক ও বিনোদন মূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা উচিত এই আনন্দ ও আস্থার মধ্যে তাদের মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করবে।

৫। প্রযুক্তির ব্যবহার :

প্রযুক্তির মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা যেতে পারে। মোবাইল অ্যাপ ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সদস্যরা স্ট্রেস মোকাবেলার কৌশল শিখতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সেবা নিতে পারবেন।

ঘ) কর্মপরিবেশ উন্নয়নের প্রস্তাবনা

১। অবকাঠামো উন্নয়ন :

- পুলিশ লাইন, থানা এবং অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- আধুনিক সুবিধা যেমন বিশ্রামাগার, খাবারের জায়গা, শৌচাগার ইত্যাদি নিশ্চিত করা।
- কাজের জায়গায় পর্যাপ্ত আলো, বাতাস ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- জেন্ডার সেন্সিটিভ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা (মহিলা পুলিশের জন্য বিশেষ করে ট্রাফিক এর জন্য শৌচাগার নিশ্চিত করা, ব্রেস্ট ফিডিং জোন স্থাপন)।

২। কাজের চাপ কামানো :

- পুলিশ সদস্যদের কাজের চাপ কমানো জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করা এবং সুষম কর্মবন্টান করা।
- অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া।

৩। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা :

- পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৪। মূল্যায়ন ও পদোন্নতি ব্যবস্থা :

- পুলিশ সদস্যদের কাজের মূল্যায়ন নিয়মিত করা।
- ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া ।
- পতোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। সামাজিক স্বীকৃতি :

- পুলিশ সদস্যদের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সামাজিকভাবে তাদের সম্মান করা।
- তাদের অবদানের জন্য সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি ব্যবস্থা করা।

৬। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন :

- পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি এবং পারিবারিক সংযুক্তি পুলিশ সদস্যদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বাড়ায় বিধায় পরিবারের সঙ্গে যেন তারা গুনগত ছুটি কাটাতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা।

৭। অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা :

- পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তি করা।
- অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি দেওয়া এবং নিরীহদের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় না করা।

৮। অসৌজন্যমূলক আচরন পরিহার :

- কোন জুনিয়র পুলিশ সদস্যের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরন বা শব্দ ব্যবহার পরিহার করা।

৯। ডে কেয়ার স্থাপন :

- বিভিন্ন স্টেশনে ডে কেয়ার স্থাপন করা হলে কর্মজীবি মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ডে কেয়ার এ রেখে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন যা তাদের কাজের গুনগতমান রাখিতে সহায়ক হবে।

১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন :

- প্রতিটি ইউনিটে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা যেতে পারে।

১১। পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে চ্যালেঞ্জড সন্তানের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সহায়তা :

- পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে চ্যালেঞ্জড সন্তানের শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট ইউনিট চালু করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- পুলিশ হাসপাতালসমূহে তাদের শারীরিক, মানসিক ও থেরাপির জন্য পৃথক ইউনিট চালু করা। এসব ইউনিটে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সাইক্রিয়াটিস্ট, থেরাপিস্ট নিয়োগ দেয়া।

ঙ) পুলিশ সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত ছুটি নিশ্চিত করা

১। নিয়মিত ছুটির নীতি :

পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত ছুটির নীতি প্রণয়ন করা উচিত। এই নীতির মধ্যে বার্ষিক, সাপ্তাহিক এবং বিশেষ ছুটির তালিকা থাকতে হবে, যাতে সদস্যরা বুঝতে পারেন কবে এবং কিভাবে তারা ছুটি নিতে পারবেন।

২। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির জন্য ছুটির ব্যবস্থা :

যেকোন বিপদজনক ও অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা থাকা উচিতভ উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও সদস্য একটি বিশেষ অপারেশনের পর মানসিক চাপ অনুভব করে, তবে তাকে অতিরিক্ত ছুটি প্রদান করা উচিত যাতে তিনি যথাযথ বিশ্রাম নিতে পারেন।

৩। ছুটি ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম :

একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ছুটির ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া সহজ করা যেতে পারে। সদস্যরা সহজেই অনলাইনে ছুটি আবেদন করতে পারবেন এবং তাদের আবেদন স্ট্যাটাস ট্র্যাক করতে পারবেন। এটি প্রক্রিয়াকে দ্রুত এবং স্বচ্ছ করতে পারে।

৪। ছুটি নেওয়ার কৌশল :

সদস্যদের জন্য একটি ছুটি নেওয়ার কৌশল প্রণয়ন করা উচিত, যাতে তারা সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে তাদের ছুটির পরিকল্পনা করতে পারেন। এটি তাদের কাজের চাপ কমাতে এবং ব্যক্তিগত জীবনে ব্যালেন্স বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

৫। মানসিক স্বাস্থ্য ও পুনরুদ্ধার ছুটি :

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পুলিশ সদস্যদের জন্য মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা অবসাদ অনুভব করলে তারা যে কোনো সময়ে পুনরুদ্ধারের জন্য ছুটি নিতে পারবেন।

৬। প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ছুটি :

পুলিশ সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ছুটির ব্যবস্থা রাখা উচিত। এটি তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করবে এবং তারা নতুন কৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে।

৭। রিপোর্টিং ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা :

ছুটি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমের মূল্যায়নের জন্য একটি ফিডব্যাক ব্যবস্থা চালু করা উচিত। সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন এবং প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিতে পারবেন ।

৮। বাধ্যতামূলক ছুটি :

ব্যারাকে থাকা পুলিশ সদস্যদের বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করা। UN এর মত বছরে একবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা।

৯। ছুটিতে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি :

- পুলিশ সদস্যদের ছুটিতে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।
- পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যটন স্থানে ভ্রমনের ব্যবস্থা করা।

১০। ছুটির সময় অর্থনৈতিক সহায়তা :

- ছুটিতে যাওয়ার জন্য পুলিশ সদস্যদের অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া।
- লোন সুবিধা প্রদান করা বা ভ্রমনের খরচের জন্য আংশিকভাবে সরকারি অনুদান দেওয়া।

চ) ঝুঁকি ভাতা/আর্থিক প্রনোদনা :

- শুক্রবার, শনিবার ও ছুটির দিন এবং অতিরিক্ত সময় ডিউটি করার জন্য বিশেষ ভাতা চালু করা যেতে পারে।
- ট্রাফিক জরিমানা আদায়ে এবং মাদক বা চোরাচালান জনিত উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান করা।
- বিট পুলিশিং ও কমিউনিটি পুলিশিং এর জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা।
- তদন্ত ব্যয় বিল পূর্ণনির্ধারণ করা।
- বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সকল সদস্যদের “বাৎসরিক বিশেষ ভাতাসহ বিনোদন ছুটি” প্রদান।

- কনস্টেবল থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত সকল পুলিশ সদস্যের জন্য সর্বজনীনভাবে ফ্রেসমানির ব্যবস্থা করা।

ছ) আবাসন প্রস্তাবনা:

- পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধাসহ পুলিশ সদস্যদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করা।
- পুলিশ সদস্যদের জন্য সহজলভ্য আবাসন ব্যবস্থা তাদের আর্থিক চাপ কমায়, যা তাদের কাজের মনোযোগ বৃদ্ধি করে।
- সদস্যদের পরিবারকে নিরাপদ আবাসন প্রদান করলে সদস্যরা মানসিকভাবে আরো স্বস্থিতে থাকতে পারেন, যা তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- সঠিক আবাসনের সুবিধা পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের জন্য নতুন সদস্যদের আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে।
- সঠিক আবাসন নিশ্চিত করলে পুলিশ বাহিনীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, যা জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন, ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত করার সুফল :

পুলিশ সদস্যরা দেশর নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রাক্ষায় প্রানপাত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ছুটি, পেনশন, ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত করা হলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক সুফল অর্জিত হবে।

- **শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের উন্নতি :** নিয়িমত চিকিৎসা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে পুলিশ সদস্যরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকবেন। এটি তাদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুকি কমিয়ে আনবে।
- **কাজের প্রতি নিষ্ঠা বৃদ্ধি :** যখন পুলিশ সদস্যরা নিজেদেরকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করবেন, তখন তারা কাজের প্রতি আরো নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সাথে কাজ করবেন।
- **পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ :** পর্যাপ্ত ছুটি পেয়ে পুলিশ সদস্যরা তাদের পরিবারে সাথে সময় কাটাতে পারবেন যা পারিবারিক সম্পর্কে মজবুত করবে।
- **অবসর জীবনের নিরাপত্তা :** নিশ্চিত পেনশন পেয়ে পুলিশ সদস্যরা অবসর জীবনে অথনৈতিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবেন।
- **মানসিক চাপ কমবে :** ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য ভাতা পেয়ে পুলিশ সদস্যরা মানসিক চাপ অনুভব করবেন কম।

সামাজিক স্তরে সুফল :

- **আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দক্ষাতা বৃদ্ধি :** সুস্থ ও মানসিকভাবে সুস্থ পুলিশ সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরো দক্ষ হবেন।
- **জনগণের উপর আস্থা বৃদ্ধি :** যখন জনগণ দেখবে যে পুলিশ সদস্যরা সুস্থ ও সুখী তখন তারা পুলিশে আরো বেশি আস্থা রাখবে।
- **সামাজিক সম্পর্ক উন্নতি :** পুলিশ সদস্যরা যখন মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন, তখন তারা জনগণের সাথে আরো ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন।
- **দুর্নীতি হ্রাস :** পুলিশ সদস্যরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেই দুর্নীতির দিকে কম ঝুঁকবে।
- **সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি :** একটি সুস্থ ও সুখী পুলিশ বাহিনী সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ছুটি, পেনশন, ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত করা কেবল সদস্যদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজের উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। এই সুফল গুলো পুলিশ বাহিনীকে আরো কার্যকরী, সহানুভূতিশীল এবং জনগণের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে। ফলে, একটি সুস্থ ও সক্ষম পুলিশ বাহিনী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবিত "পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস" (PMS) **(মূল প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬.২ দ্রষ্টব্য ৩২ পৃষ্ঠা):**

পটভূমিঃ-

আইন শৃঙ্খলা, জনগণের সম্পদ ও জানমালের নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ পুলিশ। গৌরবোজ্জ্বল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা এ বাহিনীর সদস্যরা স্বাধীন বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, মাদক প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদ দমনসহ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দূর্গম পাহাড়ী এলাকা, নদীপথ, প্রত্যন্ত সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় এর কার্যাবলী বিস্তৃত। কাজের ধরণ ও কর্ম পরিবেশের কারণে বাংলাদেশ পুলিশকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সহিংসতায় সরাসরি সামনে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। দুর্ঘটনা, দীর্ঘ কর্মঘন্টা ও চাপের কারণে পুলিশ সদস্যগণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশ পুলিশের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম বর্তমানে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, বিপিএ হাসপাতাল সারদা, জেলা পুলিশ হাসপাতাল ও এমআই সেন্টার সমূহের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১২ (বারো) লক্ষ সদস্যের চিকিৎসা সেবা পুলিশ হাসপাতাল হতে প্রদান করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পুলিশ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, অপরাধের বহুমাত্রিকতা ও বহুমুখীতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষায় পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ হাসপাতাল সমূহ চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ান ও যন্ত্রপাতি স্বল্পতার কারণে চিকিৎসা সেবা প্রদানে এখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি।

পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে সার্বক্ষণিক কর্মক্ষম ও সুস্থ পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে জনগণকে প্রত্যাশিত পুলিশ সেবা প্রদানের ধারাবাহিকতা অটুট রাখতে পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি আধুনিক ও মানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে পুলিশের জন্য একটি **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** অতীব জরুরি ও সময়ের দাবি।

বৈশ্বিক অবস্থাঃ- বিশ্বের অনেক দেশেই পুলিশ বাহিনীতে **র‍্যাংক-ব্যাজ-ইউনিফর্মসহ** চিকিৎসকরা সফলতার সাথে অবদান রাখছেন। নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো-

ক. পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস:
- শ্রীলংকা- Sri Lanka Police Medical Service
- নাইজেরিয়া- Nigeria Police Medical Service
- ভারত- Police Medical Service in ITBP, SSB, CRPF (Central Armed Police Forces)
- ফিলিপাইন- PNP Medical Reserve Force
- সংযুক্ত আরব আমিরাত- Abu Dhabi Police Medical Service

খ. পুলিশের কৌশলগত ইউনিটে টেকটিকাল মেডিকস হিসেবে:
- আমেরিকা- SWAT
- কানাডা- Royal Canadian Mounted Police
- ইসরাইল-MAGAV
- ফ্রান্স- RAID
- জার্মানি- GSG 9

'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস' এর যৌক্তিকতাঃ-

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, বিপিএ হাসপাতাল সারদা, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, জেলা পুলিশ হাসপাতাল ও বিভিন্ন এমআই ইউনিট সেন্টারসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও একমাত্র কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা ছাড়া বাকি হাসাপাতাল সমূহের অবকাঠামো, জনবল (চিকিৎসক, নার্স, টেকনেশিয়ান ও অন্যান্য কর্মী) ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। এছাড়া স্বাস্থ্য হতে প্রেষণে জেলা পুলিশ হাসপাতাল সমূহে চিকিৎসক পদায়ন করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসক-পুলিশের কমিউনিকেশন গ্যাপের জন্য তারা থাকতে চান

না। আবার হাসপাতাল সমূহে জনবল (চিকিৎসক, নার্স, টেকনেশিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারী) চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এক শিফটে চিকিৎসক পাওয়া গেলে বাকি শিফটে চিকিৎসক/নার্স/ওয়ার্ড বয় পাওয়া যায় না এবং জনবল সংকটের হেতু চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। আবার উপজেলা/জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ সমূহে রোগীর আধিক্যের কারণে গুরুতর জখম/অসুস্থতায় দ্রুত/সঠিক সময়ে চিকিৎসা প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। বাংলাদেশ পুলিশ হাসপাতাল সমূহের কার্যক্রম জনবল, সম্পদের সমন্বয় ও সুষ্ঠু সর্বোচ্চ ব্যবহার ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন ও দেশব্যাপি অভিন্ন ও কার্যকর, দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে পুলিশের জন্য একটি স্বতন্ত্র **মেডিকেল সার্ভিস** গঠন সময়ের দাবি।

এ প্রেক্ষিতে পুলিশ ও পুলিশ পরিবারের চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যাবলী দেশব্যাপী এই বিশেষায়িত চিকিৎসা ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আহত পুলিশ সদস্যরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকালে সাধারণ জনতার রোষানলে পড়ে। তাই বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত চিকিৎসকবৃন্দ ও পর্যাপ্ত জনবল দিয়ে স্বতন্ত্র **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** গঠন করে একটি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কাঠামোর ব্যবস্থা করা গেলে পুলিশ সদস্যদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।

এছাড়া সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক বাহিনী, সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত বিধায় চাকুরির উপযুক্ততা/কর্মক্ষমতা যাচাই, মেডিকেল কারণে ছুটি যাচাই ও পুন:যোগদানের উপযুক্ততা নির্ণয় আবশ্যক। এ সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় নিজস্ব চিকিৎসক এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই স্বতন্ত্র **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** গঠিত হলে বাংলাদেশ পুলিশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজ সমূহের মধ্যে একটি যৌক্তিক সমন্বয় হবে।

পেশাগত কারণে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ প্রতিনিয়ত যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, এ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা সীমিত বেতনে অতি কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। পেশাগত বৈচিত্র্য, অত্যন্ত ঝুঁকি এবং মানসিক চাপের মধ্যে নিয় মিত দায়িত্ব পালন করার ফলে পুলিশের রোগের ধরণও অনেক বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময়তার জন্য অসুস্থ সদস্যদের যেমন কষ্টের পরিমাণ বেড়ে যায়, তেমনি তাদের জন্য জনগণকে মানসম্মত সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে পড়ে। পুলিশের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করতে গেলে চিকিৎসকদের এই বাহিনীতে থেকেই তাদের রোগের ধরণ নিয়ে গবেষণা এবং উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে।

পুলিশ-ডাক্তারের মেলবন্ধনের উত্তম উদাহরণ হলো কোভিড মহামারি। উক্ত মহামারিতে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক এবং পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। ফলাফল স্বরূপ কোভিড মহামারি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা অর্জন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে এই সূর্যসন্তানদের অবদান কখনো ভুলবার নয়। তাই এই দুই সম্মুখ যোদ্ধার একত্রে পথচলা এখন সময়ের দাবি।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল একজন ডিআইজি, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল সমূহ একজন রেঞ্জ ডিআইজি/পুলিশ কমিশনার এবং জেলা/ইউনিট পুলিশ হাসপাতাল সমূহ জেলা পুলিশ সুপার/ইউনিট প্রধানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম অধিকতর উন্নত, গতিশীল, সুশৃঙ্খল ও কার্যকারী করার লক্ষ্যে পুলিশ হাসপাতাল সমূহের সার্বিক কার্যক্রম একটি সুবিন্যস্ত ও একক কমান্ডের আওতায় পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল ব্যতিত পুলিশিং এর দৈনন্দিন রুটিন ও জরুরি দায়িত্ব পালনের পর বিভাগীয় ও জেলা পুলিশ হাসপাতাল সমূহের তত্ত্বাবধান করা সংশ্লিষ্ট প্রধানদের পক্ষে অনেকটাই দুরুহ। হসপিটাল ম্যানেজম্যান্ট ও চিকিৎসা বিষয়ে পুলিশের জ্ঞানের স্বল্পতা থাকায় স্বাস্থ্য সেবার এই কার্যক্রম নিবিড়, ধারাবাহিক তদারকি ও প্রাত্যহিক কার্যক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** গঠন হলে তা দেশব্যাপী সকল পুলিশ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তদারকিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এতে যেমন সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে তেমনি বাহিনীর একটি ইউনিট হওয়ায় পুলিশ বিধি বিধান সাপেক্ষ্যে পরিচালিত হবে বিধায় সর্বত্র সার্বক্ষণিক চিকিৎসক/নার্স সহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য হবে। একই বাহিনীর সদস্য হওয়ায় সকল স্তরের পুলিশ সদস্যগণ অধিকতর আন্তরিকতা ও সাহসের সাথে দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করবে এবং একটি কর্মক্ষম, সুস্থ পুলিশ বাহিনী উচ্চ মনোবলে দেশের সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভাবে নিঃশংকোচিত্তে ভূমিকা রাখতে পারবে।

*যে সব ইউনিটসমূহ **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** এর অধিভুক্ত হতে পারে -*

১. পুলিশ মেডিকেল কোর

২. পুলিশ নার্সিং কোর
৩. পুলিশ মেডিকেল কলেজ
৪. পুলিশ নার্সিং ইন্সটিটিউট

‘পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’ এর কার্যাবলীঃ

১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য সম্ভাব্য যেকোনো ঝুঁকির বিষয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করা।
২. জরুরি চিকিৎসা সহায়তাঃ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে অসুস্থ ও আহতদের সরিয়ে নেওয়া এবং ইমার্জেন্সি ট্রমা ম্যানেজমেন্ট (ETM) এর মাধ্যমে গুরুতর আহত পুলিশ সদস্যদের বড় কোনো স্বাস্থ্যগত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।
৩. বিভিন্ন দুর্যোগ ও সঙ্কট মোকাবেলা করাঃ আহতদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, ট্রমা কেয়ার এবং রোগ প্রতিরোধ সেবা প্রদান করা। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে স্বাস্থ্য সংকট পরিচালনা করা।
৪. পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতা নিশ্চিত করা। এজন্য স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের উপর বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা।
৫. স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরি এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।
৬. সমস্ত ইউনিটে মেডিকেল স্টোর এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
৭. নিয়মিত ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং টিকাদান কর্মসূচি পালন।
৮. চিকিৎসা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৯. মেডিকেল রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

‘পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’ অধিভুক্ত ইউনিট সমূহঃ

নং	হাসপাতাল/ইউনিটের নাম	বিদ্যমান সংখ্যা	শয্যা সংখ্যা
১.	কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল	০১টি	৫০০ শয্যা
২.	বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল	পুরাতন-০৫টি	১০০ শয্যা
৩.	বিপিএ হাসপাতাল, সারদা	০১ টি	৭৫ শয্যা
৪.	জেলা পুলিশ হাসপাতাল	“আধুনিকায়ন” প্রকল্পের - ১৩ টি	২০ শয্যা
		পুরাতন-০৭ টি	২০ শয্যা
		পুরাতন-৩৯ টি	-
৫.	এমআই সেন্টার	পিটিসি-০৪ টি	-
		অন্যান্য-১৫ টি	-

সংলগ্নী 8 প্রস্তাবিত “পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস” (PMS)_(As received from PHQ)

<u>**প্রস্তাবিত ‘পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’ এর অর্গানোগ্রামঃ**</u> নতুন জনবলের পদ সৃজন না করে বিদ্যমান জনবল দিয়ে **‘পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’**_করা হবে বিধায় বাংলাদেশ সরকারের এতে কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই।

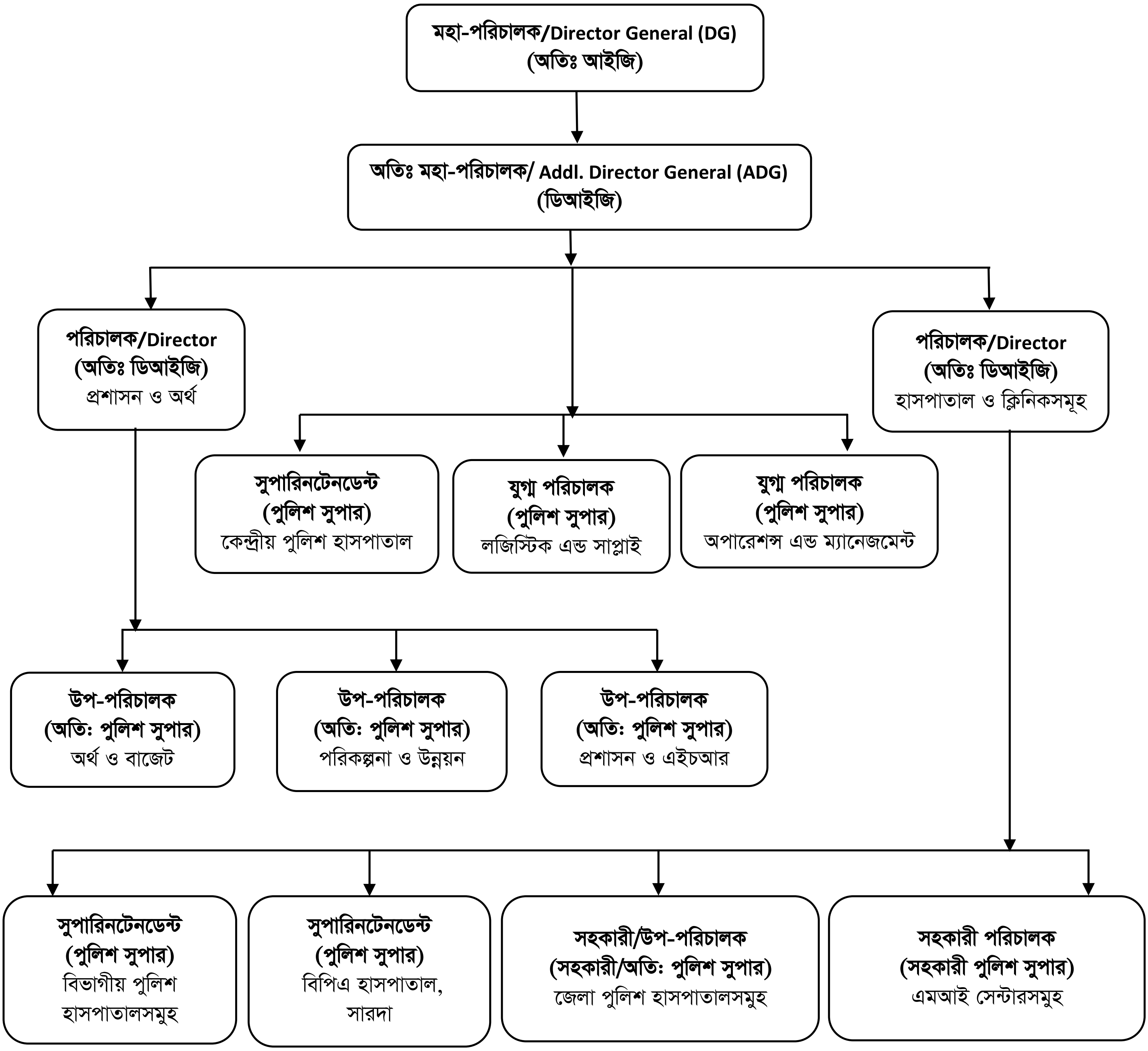

*** **‘পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’** এর আওতায় প্রশাসনিক পদের জন্য চিকিৎসকদের উচ্চতর ডিগ্রিকে প্রাধান্য না দিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্রের দক্ষতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

*** আর্মি মেডিকেল কোরের (ডিজিএমএস) মত **‘পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস’** এর পদগুলোতে চিকিৎসকরা প্রাধান্য পাবেন।

<u>নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পদায়নঃ</u> পুলিশ হাসপাতালের নিজস্ব নিয়োগ বিধিমালা, "পুলিশ বিভাগ (নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬" (সংশোধিত) অনুসারে / কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে এবং তাদের পদায়ন **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস' এর মহা-পরিচালক** করবেন। চিকিৎসক ব্যতিত সবার নিয়োগ অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) বছর। চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসার/সমমান এর জন্য অনূর্ধ্ব ৩২ (বত্রিশ) বছর, জুনিয়র কনসালটেন্ট এর জন্য অনূর্ধ্ব ৪০ (চল্লিশ) বছর। তবে শারীরিক ফিটনেসের (উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি) ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকবে।

******* উল্লেখ্য যে সুপারিনটেনডেন্ট, চীফ কনসালটেন্ট, সিনিয়র কনসালটেন্ট ও নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট ব্যতিত বাকি পদগুলোতে সরাসরি নিয়োগ হবে।

******* উল্লেখ্য যে, জুনিয়র কনসালটেন্ট মোট পদের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

চিকিৎসক: (ক) মেডিকেল অফিসার/সমমানের ক্ষেত্রে- কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমবিবিএস বা বিডিএস; বিএমডিসি কর্তৃক হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত (খ) জুনিয়র কনসালটেন্টদের ক্ষেত্রে- কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস বা এমফিল বা এমসিপিএস বা এমআরসিপি বা এমআরসিএস বা এমআরসিওজি বা এমডি বা এমএস বা ডিপ্লোমা বা বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি।

১. "বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)" কর্তৃক নিয়োগকৃত ৯ম গ্রেডের একজন চিকিৎসক (এমবিবিএস বা বিডিএস) যাহা মেডিকেল অফিসার/সমমানের তিনি বাংলাদেশ "পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস" এ "সহকারী পুলিশ সুপার" পদে যোগদান করবেন।
২. "বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)" কর্তৃক নিয়োগকৃত ৬ষ্ঠ গ্রেডের একজন চিকিৎসক (এমবিবিএস বা বিডিএস) বাংলাদেশ "পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস" এ "অতিরিক্ত পুলিশ সুপার" পদে যোগদান করবেন।

সুপারিনটেনডেন্ট: পদোন্নতির ক্ষেত্রে: (ক) বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত পোস্ট গ্রাজুয়েট বা ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাসহ জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা; এবং ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। অথবা (খ) ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে অন্যূন ১৩ (তের) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।

নার্স/মিডওয়াইফ: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নার্সিং এ স্নাতক ডিগ্রি বা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ডিপ্লোমা-ইন নার্সিং বা ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি সার্টিফিকেট এ উত্তীর্ণ; এবং (খ) বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মেডিকেল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

ফার্মাসিস্ট: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে ফার্মাসিস্ট বিষয়ে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি; এবং (খ) বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।

ওয়ার্ড মাস্টার: (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ০১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

ওয়ার্ড বয় ও আয়া: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তবে জাত সুইপার/হরিজন সম্প্রদায়দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং উক্ত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ গ্রহণযোগ্য হবে।

<u>র‍্যাংক-ব্যাজ-ইউনিফর্মঃ</u> **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** এর আওতায় পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত চিকিংসকগণ তাদের সমগ্রেডের পুলিশ কর্মকর্তার **র‍্যাংক-ব্যাজ-ইউনিফর্ম** পরিধান করবেন।

*** চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জিও তে উল্লেখিত পদেই থাকবেন কিন্তু পুলিশের সমগ্রেডের পদমর্যাদা পাবেন (সর্বোচ্চ সহকারী পুলিশ সুপার পর্যন্ত) এবং সর্বদাই জুনিয়র অফিসার হিসেবে পরিগণিত হবেন।

ধরণ	**বিবরণ**	**র‍্যাংক ব্যাজ**
গেজেটেড অফিসার	৩য় গ্রেডের চিকিৎসক	ডিআইজি
	৪র্থ গ্রেডের চিকিৎসক	অতিরিক্ত ডিআইজি
	৫ম গ্রেডের চিকিৎসক	পুলিশ সুপার
	৬ষ্ঠ গ্রেডের চিকিৎসক	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
	৭ম গ্রেডের চিকিৎসক	সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার
	৯ম গ্রেডের চিকিৎসক	সহকারী পুলিশ সুপার

প্রশিক্ষণকাল: **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** এর আওতায় পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত সকল চিকিৎসকবৃন্দ ও কর্মচারী নিম্নলিখিত মেয়াদকাল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** এর ট্রেনিং শাখা প্রশিক্ষণের কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণের আয়োজন সম্পন্ন করবে।

বিবরণ	**প্রশিক্ষণকাল**
গ্রেড ৯ম ও তদুর্ধ্ব চিকিৎসক	০৬ মাস
চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য গ্রেড ৯ম থেকে তদনিম্ন কর্মকর্তা/ কর্মচারী	০১ মাস

উচ্চতর শিক্ষার (পোস্টগ্রাজুয়েশন) নিমিত্তে প্রেষণ নীতিমালা (ডেপুটেশন)ঃ ডেপুটেশন পলিসি মোতাবেক বাংলাদেশ পুলিশে নিয়োগকৃত সকল চিকিৎসক পোস্টগ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করবে, যাতে পুলিশ হাসপাতাল সমূহে ভবিষ্যতে নিজস্ব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি হয়।

শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিঃ **'পুলিশ মেডিকেল সার্ভিস'** এর আওতায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮/১৯৮৫ এবং এতদসংক্রান্ত সরকার কর্তৃক জারিকৃত ও কমিশন কর্তক নির্ধারিত অন্যান্য বিধি/নির্দেশাবলী অনুসৃত হবে।

বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(মূল প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬.১৪ দ্রষ্টব্য ৬৭ পৃষ্ঠা):**

১) ভূমিকা

বাংলাদেশ পুলিশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকহানাদারদের নির্মম হামলার শিকার হয়েছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স। দেশের যে কোনো সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশ কখনো অর্পিত দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠাবোধ করেনি। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকালীন ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের সহিংসতায় প্রায় ২০০০ নিহত এবং ২০০০০ আহত হয়েছে মর্মে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিবেদনে জানা যায় অন্যদিকে সংঘর্ষে পুলিশেরও অনেক সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে পুলিশের প্রতি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে এক ধরণের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের পরবর্তীতে দেশের সার্বিক অবস্থার অবনতি এবং পুলিশের মধ্যে এক ধরণের বঞ্চণা ও হতাশার সৃষ্টি হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশকে একটি জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ পুলিশ সদস্যদের মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে পুলিশের আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর আন্তরিক অভিব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/দেশ, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের সভ্যবৃন্দের আলোচনায় পুলিশ সংস্কারের বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

পুলিশ সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে পুলিশের ইতিহাস, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আইনি ভিত্তি, সামগ্রিক কার্যক্রম, জনবল, বিভিন্ন ইউনিটের পরিচিতি ও সাংগঠনিক সক্ষমতা, টিওএন্ডই, যানবাহন ও সরঞ্জামাদি, অস্ত্র-গোলাবারুদ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত একটি তথ্যচিত্র এই প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো। বিস্তারিত তথ্যাদি সংলগ্নী ০৩ দ্রষ্টব্য।

২) বাংলাদেশ পুলিশের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক কালের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্নে পুলিশের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ক. ব্রিটিশ শাসনামল (১৮৬১-১৯৪৭)

বাংলাদেশ পুলিশের শেকড় ব্রিটিশ শাসনামলে প্রোথিত। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশরা বাংলা, বিহার ওড়িশা অঞ্চলের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে, ১৮৬১ সালে প্রবর্তিত পুলিশ আইন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের শাসন সহজতর করে তোলে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ বাহিনীর মূল কাজ ছিল ব্রিটিশ শাসন রক্ষা করা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের শৃঙ্খলায় রাখার জন্য কঠোর আইন প্রয়োগ করা।

খ. পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরে, পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) পৃথক পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়। এই সময়ে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করা। পাকিস্তান শাসনামলে পুলিশের ওপর সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন করার চাপ ছিল। তবে, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পুলিশের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীকে আরও কার্যকর করতে প্রশিক্ষণ ও নতুন পদ সংযোজন করা হয়।

গ. স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা (১৯৭১-অদ্যাবধি)

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে নতুনভাবে পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে পুলিশ বাহিনীর মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী দেশব্যাপী বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন স্থাপন করে এবং নতুন কৌশলগত ও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৩) পুলিশিং কার্যক্রমের আইনি ভিত্তি

বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশ সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের আলোকে স্বীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, দেশের একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে এমন এক সমাজকে উপলব্ধি করা, যে সমাজে নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক ও মানবাধিকার ও স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুরক্ষিত থাকবে। ২ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো সংবিধান ও আইন মেনে চলা, শৃঙ্খলা বাজায় রাখা, সরকারি দায়িত্ব পালন করা এবং সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

বাংলাদেশ পুলিশের আইনগত ভিত্তি মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত আইন থেকে এসেছে, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. পুলিশ আইন-১৮৬১

পুলিশ আইন-১৮৬১ হলো ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত একটি আইন, যা বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রধান আইনি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ আইনটি পুলিশ বাহিনী গঠন, দায়িত্ব, কর্তৃত্ব এবং কার্যপ্রণালির নির্দেশনা প্রদান করে। আইনটি ব্রিটিশ ভারত শাসনামলে প্রণীত হলেও স্বাধীনতার পরে এটি বাংলাদেশের পুলিশের মূল ভিত্তি হিসেবে অদ্যাবধি কার্যকর রয়েছে।

খ. ফৌজদারি কার্যবিধি-১৮৯৮

ফৌজদারি কার্যবিধি-১৮৯৮ পুলিশের তদন্ত ও মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। এ আইনটি অনুসারে পুলিশ কীভাবে গ্রেফতার করবে, তদন্ত করবে, অভিযোগ পেশ করবে এবং আদালতের সাথে তাদের সমন্বয় করবে, সে সকল বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গ. দণ্ডবিধি-১৮৬০

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি পুলিশের অপরাধ তদন্ত এবং অপরাধীদের বিচারের জন্য আইনগত নির্দেশিকা প্রদান করে। এ আইনটি পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে পুলিশ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ঘ. পুলিশ প্রবিধানমালা- ১৯৪৩

বাংলাদেশ পুলিশ, The police Regulations Bengal, 1943 অনুযায়ী মৌলিক কার্যক্রম করে থাকে। PRB, 1943 এ পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, পরিদর্শন সম্পর্কিত বিষয়, মামলার তদন্ত, কেস ডায়েরি, অভিযোগ দায়ের, গোপন রিপোর্ট, সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের আইনি কাঠামো বর্ণিত এসব মূল আইন ও বিধির ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এছাড়াও পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও বেশ কিছু মাইন অ্যাক্ট রয়েছে। পুলিশ বাহিনী এসব আইন অনুসরণ করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৪) বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। পুলিশ বাহিনীর মূল কিছু কার্যক্রম রয়েছে যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা:

বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অপরাধ প্রতিরোধ করা এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করা, সংঘর্ষ এবং সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ করা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জনগণের জানমালের সুরক্ষা করা। এছাড়াও জরুরি পরিস্থিতিতে যেমন- রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থিরতার সময় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. অপরাধ তদন্ত:

বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্তের জন্য জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট ছাড়াও বিশেষায়িত ইউনিট রয়েছে। তারা অপরাধের যথাযথ তদন্ত ও বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করে, যা অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে সাহায্য করে।

গ. সন্ত্রাস ও সহিংসতা দমন:

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং সহিংসতা প্রতিরোধে তৎপর থাকে। সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষায়িত ইউনিটগুলো এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এবং স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

ঘ. ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ:

সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ইউনিট কাজ করে। এর মধ্যে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ, সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচার এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত।

ঙ. জরুরি সেবা প্রদান:

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশ দ্রুত সাড়া দেয় এবং উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা স্থানীয় জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ হলো মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট, জেলা পুলিশ, এপিবিএন, র‍্যাব, এটিইউ, সিআইডি এবং পিবিআই, এসবি, হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, রিভার পুলিশ, এমআরটি পুলিশ ইত্যাদি। এসকল ইউনিট তাদের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অপরাধ তদন্ত ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

চ. বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের কার্যক্রম:

দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ তথা জনগণের জানমালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে নিজ নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনস্বার্থে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

মেট্রোপলিটন পুলিশ: মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ, আইন প্রয়োগ এবং শহর এলাকায় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

জেলা পুলিশ: ইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধ তদন্ত এবং গ্রাম ও উপশহর এলাকায় সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এপিবিএন: এপিবিএন বিমান/স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ও পাহাড়ি এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ক্রাউড কন্ট্রোল, মাদকবিরোধী আইনের প্রয়োগ, বিশেষ নিরাপত্তাজনিত অভিযান পরিচালনা এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাজনিত উদ্যোগগুলোকে সহায়তা করে।

র‍্যাব: র‍্যাব সন্ত্রাস দমন, মাদকবিরোধী আইন প্রয়োগ, বিশেষ অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রম করে থাকে।

অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট: অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং সন্ত্রাসী হুমকিকে মোকাবিলা করতে বিশেষ পারদর্শী।

সিআইডি এবং পিবিআই: সিআইডি এবং পিবিআই ডাকাতি, হত্যাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করে। সিআইডি ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। তারা হাই-প্রোফাইল নিরাপত্তা প্রদান করে ব্যক্তি এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ঝামেলামুক্ত অভিবাসন সহায়তা করে।

হাইওয়ে পুলিশ : হাইওয়ে পুলিশ নিরাপদ সড়কের জন্য ট্রাফিক আইন ও প্রবিধান প্রয়োগ করে এবং অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিত টহল প্রদান করে।

শিল্প পুলিশ: শিল্প পুলিশ শিল্প এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধের মধ্যস্থতা করে, চুরি ও ভাঙচুর প্রতিরোধ করে এবং শিল্প দুর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়।

রেলওয়ে পুলিশ: রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ে সম্পত্তি এবং যাত্রীদের রক্ষা করে, ট্রেনে এবং স্টেশনে অপরাধ তদন্ত করে, ভাড়া ফাঁকি রোধ করতে টিকিটিং মনিটর করে এবং ট্রেনের সাথে জড়িত ঘটনা ও দুর্ঘটনা তদন্ত করে।

ট্যুরিস্ট পুলিশ: ট্যুরিস্ট পুলিশ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ করে, সহায়তা ও তথ্য প্রদান করে এবং বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে।

নৌ-পুলিশ: নৌ-পুলিশ নদীপথে সংঘটিত অপরাধ নিবারণের জন্য নিরাপত্তা টহল প্রদান করে, চোরাচালান ও অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান করে, জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এমআরটি: এমআরটি পুলিশ ট্রানজিট সিস্টেম নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, অপরাধ প্রতিরোধ করে, জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেয় এবং যাত্রীদের সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ: পুলিশ সদস্যদের সক্ষমতা অর্থাৎ দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে বাংলাদেশ পুলিশ নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়াতে এবং পুলিশের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

৫) পুলিশের বিশেষ সাফল্য

বাংলাদেশ পুলিশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের ভূমিকা আরও দৃঢ় করেছে। এখানে কিছু প্রণিধানযোগ্য অর্জনের কথা উল্লেখ করা হলো:

ক. সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমে সফলতা

বাংলাদেশ পুলিশ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বিশেষ করে সন্ত্রাস দমন ও অপরাধ দমন ইউনিট (CTTC)-এর মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন সময় জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালানো হয়েছে, যা সন্ত্রাসী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে। এই ইউনিট ঢাকা হলি আর্টিজান হামলার তদন্তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দায়ীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে।

খ. মাদকবিরোধী অভিযান

মাদক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশ সাম্প্রতিককালে ব্যাপক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং জেলা পুলিশের সহযোগিতায় দেশে মাদক চোরাচালান ও ব্যবহার রোধে নিরলসভাবে কাজ করছে। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে মাদক পাচারকারীদের গ্রেফতার করেছে এবং প্রচুর পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। নিম্নবর্ণিত ছকে বিগত জানুয়ারি ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য মাদক উদ্ধারের তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো।

সময়	মামলার সংখ্যা	গ্রেফতারের সংখ্যা	উল্লেখযোগ্য উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য							
			হেরোইন		ইয়াবা	গাঁজা/গাঁজার গাছ			ফেনসিডিল	
			কেজি	পুরিয়া	টি	কেজি	পুরিয়া	গাছ	বোতল	লিটার
২০১৪	৪২৫০১	৫১৬৯২	৬৬.১	১৭০৬৪	৩৫০০৫৫৪	২৬৬০৩	৮৮৬০	২৭৪	২০৩২৯৯	৪৫১
২০১৫	৪৭৬৬৮	৫৯২৭৬	৯১.৭	৯৪০৩০	১৩৪২৬২৮৭	২৬৬৮০	১১৫৮৩	৮২৬	২৮৫০৯৯	৫০৭৯
২০১৬	৬২২৬৮	৭৮২১৪	২৪৯	২৮০৫৯	১৬৯৯৬০৭৭	২৭২৭৮	৬৫৭১	২৯৯	২৩৯৮৫৪	১৩১

সময়	মামলার সংখ্যা	গ্রেফতারের সংখ্যা	উল্লেখযোগ্য উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য							
			হেরোইন		ইয়াবা	গাঁজা/গাঁজার গাছ			ফেনসিডিল	
			কেজি	পুরিয়া	টি	কেজি	পুরিয়া	গাছ	বোতল	লিটার
২০১৭	৯৮৯৮৪	১২৫৬৫১	৩৫৯	৬৯৯৪৫	২৫৯৮৯০৪২	৫৬৮৭৯	৭৯৬২	৪৯৮	৩৯০১৮৭	৩৭০
২০১৮	১১২৫৫২	১৪৭৮০৩	৪১৭		৩৬৯৪৭৮২২	৪৯০১৩	৩৯৮৬	২৬৬	৩৩৯৮২৮	৯১২
২০১৯	১১১১৯২	১৫০১৭৫	৩১৯		২৪৯৩৫০৯৩	৩১৪৫৮	২৫৭৮	১০০১	৩৯০০২৯	৪৪৩
২০২০	৭৩৩৩৯	৯৯৯৮৫	১৯৮		৩০০০৬৩৪৮	৩৬২৮৭	৮৭২	২৫৯৪	৪৬৮৪৩৪	২৪৯
২০২১	৭৯৬৭৫	১০৭৮৭৫	৩১১		৪৪১৮১৩৪২	৫৮৪৩০	৫৫২	১৮৭৯৯	৩০২০৮১	১০৮
২০২২	৮২৬৭৫	১০৭০৪০	২৬০		৩৬৭৯৪৪৮২	৮৬৮৭২	৪০৬	২০১০	৩৯৯৯৮৬	১৪৮
২০২৩	৭৬৪০৩	৯৯৩২১	৩৫০		৩০২৯১৮৬০	৮৯৭১০	২০৩	৮৮৪	২৮৭৭৮৫	১০২
২০২৪	৪১৩৩০	৫৩৭৩০	১৭৪		১২২৫৭১৯১	৭৯২২৩	৯৪৪৭	২৫৫৯	২৪২১৭৪	৩৩৪
মোট	**৮২৮৫৮৭**	**১০৮০৭৪৪**			**২৭৫৩২৬০৯৮**	**৫৬৮৪৩৩**	**৫৩০২০**	**৩০০১০**	**৩৫৪৮৭৫৬**	**৮৩২৭**

গ. সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ

বাংলাদেশ পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সুরক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। সাইবার অপরাধ ইউনিটের মাধ্যমে অনলাইন প্রতারণা, সাইবার হুমকি, এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবৈধ কার্যক্রম এবং অনলাইন ভিত্তিক প্রতারণা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

ঘ. করোনা মহামারিতে মানবিক সহায়তা

কোভিড-১৯ মহামারির সময় পুলিশ বাহিনী ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসেবে কাজ করেছে। তারা স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত, লকডাউন পরিচালনা, এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহে পুলিশ বাহিনী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে। নিম্নবর্ণিত ছকে করোনাকালীন মৃত্যুবরণকারী পুলিশ সদস্যদের তালিকা উল্লেখ করা হলো।

এসপি	অতিঃএসপি	ইন্সপেক্টর	এসআই	এএসআই	নায়েক	কনস্টেবল	সিভিল	অবঃপুলিশ	র‍্যাব	মোট
১	২	১৪	১৯	৯	১	৫১	৩	১(কং)	৭	১৮

সাল	সর্বমোট	মোট	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	র‍্যাব
২০২০	১০৮	৮৫	-	-	-	৩	১৩	২২	২০	৯	৩	২	২	৫	৬
২০২১		২২	-	১	২	৬	-	২	৭	১	১	১	-	-	১
২০২২		১	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০২৩		০	-	-											

ঙ. কমিউনিটি ও বিট পুলিশিং

বাংলাদেশ পুলিশ সম্প্রতি কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে এবং সমাজে অপরাধ প্রতিরোধে জনগণের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে কমিউনিটি ও বিট পুলিশিং-এর কিছু তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

কমিউনিটি পুলিশিং হালনাগাদ কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা (২০২৩)

রেঞ্জ /মেট্রো/ইউনিটের নাম	কমিটির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
সকল মেট্রোর মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	১৫২০	২৬৩০৮
ঢাকা রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৮২৬৯	১৩৯০৪৩
চট্টগ্রাম রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৮০৩৫	১৪৩৪৭২
রাজশাহী রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৮২৮৪	১১৮৯০৯
রংপুর রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৬১২০	১১৫৫৪৯
খুলনা রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৬৩৪৭	১২৩৮৭২
সিলেট রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৩৩৩৩	৭২৫৮৪
ময়মনসিংহ রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	২৭১২	৭১৭৫৮
বরিশাল রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	৩৭১৯	৫৫৮৬৮
অন্যান্য ইউনিটের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	১১৯০	২৬৮৪৩
সর্বমোট=	**৪৯৫২৯**	**৮৯৪২০৬**

রেঞ্জ/মেট্রো/ইউনিটের নাম	কমিটির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
সকল মেট্রোর মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	১৫২০	২৬৩০৮
ঢাকা রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৮২৬৯	১৩৯০৪৩
চট্টগ্রাম রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৮০৩৫	১৪৩৪৭২
রাজশাহী রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৮২৮৪	১১৮৯০৯
রংপুর রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৬১২০	১১৫৫৪৯
খুলনা রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৬৩৪৭	১২৩৮৭২
সিলেট রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৩৩৩৩	৭২৫৮৪
ময়মনসিংহ রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	২৭১২	৭১৭৫৮
বরিশাল রেঞ্জের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	৩৭১৯	৫৫৮৬৮
অন্যান্য ইউনিটের মোট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সংখ্যা ও সদস্যদের সংখ্যা	১১৯০	২৬৮৪৩
সর্বমোট =	৪৯৫২৯	৮৯৪২০৬

মোট বিটের সংখ্যা (০৭-১১-২০২২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মেট্রো	বর্তমান বিটের সংখ্যা
১.	ডিএমপি, ঢাকা	৩০৬
২.	সিএমপি, চট্টগ্রাম	৯৫
৩.	আরএমপি, রাজশাহী	৭৮
৪.	এসএমপি, সিলেট	৬৮
৫.	কেএমপি, খুলনা	৫২

ক্রমিক নং	মেট্রো	বর্তমান বিটের সংখ্যা
৬.	বিএমপি, বরিশাল	৯৭
৭.	জিএমপি, গাজীপুর	৬০
৮.	আরপিএমপি, রংপুর	৫৫
৯.	ঢাকা রেঞ্জ	১,১৫১
১০.	চট্টগ্রাম রেঞ্জ	১,১৮৩
১১.	রাজশাহী রেঞ্জ	৭২৯
১২.	রংপুর রেঞ্জ	৬১২
১৩.	খুলনা রেঞ্জ	৬৯৩
১৪.	সিলেট রেঞ্জ	৩৬৪
১৫.	ময়মনসিংহ রেঞ্জ	৪৬৬
১৬.	বরিশাল রেঞ্জ	৪৬১
১৭.	এপিবিএন (৮,১৪,১৬)	৫৫
মোট =		৬,৫২৫

চ. ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

পুলিশের ট্রাফিক ইউনিট ঢাকা ও অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল সিস্টেমের ব্যবহার ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এতে সড়ক দুর্ঘটনা এবং যানজট কমাতে সাহায্য হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সাফল্যের কিছু তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো।

ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক যানবাহনের প্রসিকিউশন ও আদায়কৃত জরিমানার হিসাব
২০২১খ্রি. থেকে ২০২৪ খ্রি. (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বিবরণী

ক্রমিক নং	বছর	মোট প্রসিকিউশনের সংখ্যা	মোট জরিমানার পরিমাণ
১	২০২১	৯৫৫৯১২	২৫০০৬৬০৭২৮
২	২০২২	১০২২৫১২	২৮০৯৭২৫৯৫২
৩	২০২৩	১০৯২০৭৭	৩৬৮৯২২৬২৫৬
৪	২০২৪ সেপ্টে পর্যন্ত	৫৭০৮৫৮	১৮০১৩৯৫১২০
সর্বমোট		৩৬,৪১,৩৫৯ টি	১০৮০,১০,০৮,০৫৬ টাকা

ছ. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিনিধিরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন, যা দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নিম্নবর্ণিত ছকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কিছু তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

বিশ্ব শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (২৪/১০/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত)

অদ্যাবধি শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্নকারীর সংখ্যা		
	সংখ্যা	সর্বমোট
FPU/UNPOL এর সংখ্যা	৪৭৪৯	২১৬৪৩
FPU মিশন সম্পন্নকারীর সংখ্যা	১৬৮৬৬	
ইউএন জব সম্পন্নকারীর সংখ্যা	২৪	

জ. নারী পুলিশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

বাংলাদেশ পুলিশ নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং সম্প্রতি পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্যদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী পুলিশ সদস্যরা বর্তমানে সাইবার ক্রাইম ইউনিট, কমিউনিটি পুলিশিং, এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।

৬) বাংলাদেশ পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা:

ক) সাংগঠনিক কাঠামো: বাংলাদেশের পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো তিনটি স্তর অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজিক, অপরেশনাল ও টেকনিক্যাল এই তিন স্তরে বিভক্ত। কৌশলগত স্তর অর্থাৎ গতি নির্ধারণ পর্যায়ে রয়েছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স পরবর্তী ধাপে অপারেশনাল স্তর যেমন ইউনিট হেডকোয়ার্টার্স (মেট্রো, রেঞ্জ, বিশেষ ইউনিট সদর দপ্তর ইত্যাদি) এবং টেকনিক্যাল পর্যায় বলতে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ইউনিটসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এ ইউনিটসমূহে পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পুলিশের মূল কার্যক্রম অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ জননিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের সকল ইউনিট নানাভাবে সক্রিয় রয়েছে। বিশেষভাবে জঙ্গিবাদ দমন, শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান, নৌপথের নিরাপত্তা, মহাসড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পর্যটন কেন্দ্রসমূহে নিরাপদ ভ্রমণ ও অবস্থান, মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ব্যবস্থাপনা, ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত তথ্যাদি

সংগ্রহ, ইমিগ্রেশন পুলিশিং ইত্যাদি সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ পুলিশের অর্গানোগ্রাম তুলে ধরা হলো।

<u>বাংলাদেশ পুলিশের অর্গানোগ্রাম</u>

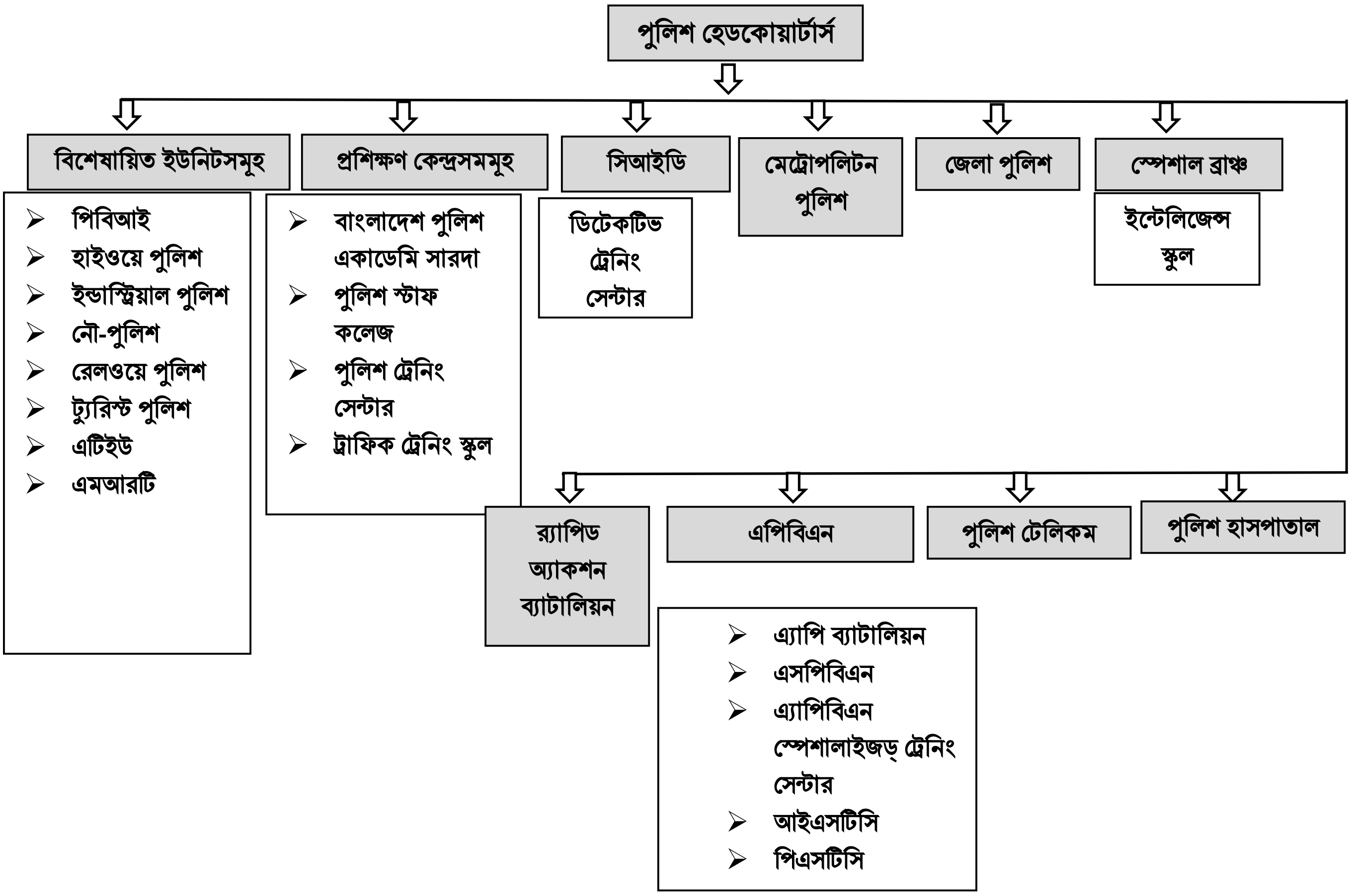

বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো ও ইউনিটের সংখ্যা সংযুক্ত করা হলো। **[পরিশিষ্ট-১]**

খ) জনবল: বাংলাদেশ পুলিশের জনবলের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জনবলের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য নিয়োজিত এ সংগঠনের মোট জনবল ২০৩৩৬৭ জন (৬/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত)। কনস্টেবল হতে আইজিপি পর্যন্ত এ জনবল দিয়ে এ দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। এ জনবলের মধ্যে এএসপি হতে আইজিপি পর্যন্ত (নবম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব) মোট ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩১৪৬ টি, ইন্সপেক্টর ৬৯২৮ টি, এসআই ২৪৪৯৩ টি এবং সার্জেন্ট, এএসআই, নায়েক, কনস্টেবল মিলিয়ে আরও ১১৬৮৮০ জনবল রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পুলিশে নন-পুলিশ (সিভিল) পদ ১০৮০৯ টি রংয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্য মিলিয়ে মোট জনবল হচ্ছে ২১৪১৭৬। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত মোট নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ১৬৮০৮ জন (০৯/১০/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত) যা মোট পুলিশ সদস্যের শতকরা মাত্র ০৮ ভাগ। বাংলাদেশের বিশাল নারী ও শিশু জনগোষ্টীর সঙ্গে নিয়মিত সম্পৃক্তকরণ, তাদের সমস্যা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। পাশাপাশি, পুলিশ ও জনগণের অনুপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতি ৮০০ জনের জন্য মাত্র ০১ জন পুলিশ রয়েছে। কিন্তু নিকটবর্তী দেশসমূহের পুলিশ জনগণের অনুপাত (মালয়েশিয়া ২৫৪:১, শ্রীলঙ্কা ২৬৭:১, নেপাল ৩৭২:১, অস্ট্রেলিয়া ৪১০:১, ভারত ৫০৯:১,

পাকিস্তান ৫২৩:১)। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় সুসংহত নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের জনবল সুস্পষ্ট বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিম্নবর্ণিত ছকে মোট জনবল ও মহিলা জনবলের তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

মোট জনবল (পুলিশ ও নন-পুলিশ সদস্য)

পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত	মন্তব্য
আইজিপি	সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার	১	
অতিরিক্ত আইজিপি	গ্রেড-১	২	
অতিরিক্ত আইজিপি	গ্রেড-২	২০	১ (টিআর)
ডিআইজি	গ্রেড-৩	৮৭	৫ (টিআর)
অতিরিক্ত ডিআইজি	গ্রেড-৪	২০১	৬ (টিআর)
এসপি	গ্রেড-৫	৫৯৬	২৫ (টিআর)
অতিরিক্ত এসপি	গ্রেড-৬	১০০৮	৫৯ (টিআর)
এএসপি	গ্রেড-৯	১২৩১	১১৪ (টিআর)
ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র/নিরস্ত্র/টিআই)	গ্রেড-৯	৬৯২৮	
এসআই (সশস্ত্র/নিরস্ত্র/সার্জেন্ট/টিএসআই)	গ্রেড-১০	২৬৬৫৮	
এএসআই (সশস্ত্র/নিরস্ত্র/এটিএসআই)	গ্রেড-১৪	২৮৫৩১	
নায়েক	গ্রেড-১৫	৭৭৯৬	
কনস্টেবল	গ্রেড-১৭	১৩০৩০৮	
নন-পুলিশ (সিভিল)	-	১০৮০৯	
মোট=		**২১৪১৭৬**	

<u>নারী পুলিশের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

পদের নাম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত
ডিআইজি	গ্রেড-৩	০	৬
অতিরিক্ত ডিআইজি	গ্রেড-৪	০	৩৮
এসপি	গ্রেড-৫	২	৭৬
অতিরিক্ত এসপি	গ্রেড-৬	৫	১১১
এএসপি	গ্রেড-৯	১০	৭৪
ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)	গ্রেড-৯	৪৪	১২৯
এসআই (নিরস্ত্র)	গ্রেড-১০	৪৩৩	৯৪৩
সার্জেন্ট	গ্রেড-১০	০	৯৩
এএসআই	গ্রেড-১৪	৫৫০	১১৬৮
এটিএসআই	গ্রেড-১৪	০	৬
এএসআই (সশস্ত্র)	গ্রেড-১৪	০	১১৬
নায়েক	গ্রেড-১৫	২৫	৩৫৬
কনস্টেবল	গ্রেড-১৭	১৭৯৭	১৩৭০৫
	মোট=	**২৮৬৬**	**১৬৮২১**

এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবলের তথ্যাদি সংযুক্ত করা হলো। **[পরিশিষ্ট-২]**

৭) বাংলাদেশ পুলিশের লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনা:

ক) যানবাহন: বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামো বা টিওএন্ডই আইনের নানাবিধ যানবাহন রয়েছে। এসব যানবাহনের মধ্যে পিকআপ, জিপ, মোটরসাইকেল, প্রিজনার্স ভ্যান, এপিসি, ওয়াটার ক্যানন, বোম্ব ডিসপোজাল, ভেহিক্যাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, এছাড়াও লঞ্চ, স্পীডবোট, পেট্রোল বোট, কান্ট্রি বোট, রেসকিউ বোট, অ্যাম্বুলেন্স বোট ইত্যাদি জলযানসমূহ বাংলাদেশ পুলিশের টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বর্তমানে টিওএন্ডইভুক্ত মোট যানবাহনের সংখ্যা ১৬১২৪ টি, যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ১০৯৪৬ টি এবং ঘাটতি রয়েছে ৫১৭৮টি। উল্লেখ্য যে, ২টি হেলিকপ্টার ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে তবে এর সরবরাহের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলযানের তথ্যচিত্র লক্ষ করলে দেখা যায় যে, টিওএন্ডইভুক্ত জলযানের সংখ্যা ৪৮২টি, বিদ্যমান ৩০২টি এবং ঘাটতি ১৯০টি।

নিম্নবর্ণিত ছকে ইউনিটওয়ারি টিওএন্ডডিভুক্ত যানবাহনের তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

ক্রমিক নং	যানবাহনের ধরন	টিওএন্ডইভুক্ত সংখ্যা
১.	জিপ	৯৮২
২.	কার	৮৫
৩.	পিকআপ	৩৩৫৭
৪.	মাইক্রোবাস	৯০
৫.	অ্যাম্বুলেন্স	১০৮

ক্রমিক নং	যানবাহনের ধরন	টিওএন্ডইভুক্ত সংখ্যা
৬.	ট্রাক (৩ টন/৫ টন)	৬৫৬
৭.	বাস	১৫১
৮.	প্রিজনার্স ভ্যান	২১১
৯.	রেকার	১৮৪
১০.	ডগ ভ্যান	২
১১.	মোটরসাইকেল	৯৭৮৬
১২.	পেট্রোল জিপ	৮০
১৩.	প্রোটেকশন জিপ	৬
১৪.	হাইওয়ে পেট্রোল কার	৭১
১৫.	ট্যাক্সি ক্যাব	১০
১৬.	মিনিবাস	৪২
১৭.	এপিসি	২১
১৮.	ওয়াটার ক্যানন/রায়ট ভ্যান	৩১
১৯.	হলার	৫১
২০	ওয়াটার ট্রেইলার	১৮
২১.	ক্রেন	২
২২.	সোয়াট ভ্যান	২
২৩.	স্যান্ড সাপোর্ট ভেহিক্যাল	৪
২৪.	বিচ রেসকিউ মোটর বাইক	১৩
২৫.	অবস্টেকল রিমুভার (বুলডোজার)	২
২৬.	স্টেরিও ক্যামেরা ইউথ মাউনটেন্ড ভেহিক্যাল	৪
২৭.	ক্যাটারিং ভ্যান	১০
২৮.	মোবাইল এভিডেন্স কালেকশন ভ্যান	৪
২৯.	বম্ব ডিসপোজাল ভেহিক্যাল	৪
৩০.	ক্রাইম সিন ম্যানেজমেন্ট ভ্যান	২
৩১.	হাইরিস্ক অপারেশন ভ্যান	১
৩২.	হেলিকপ্টার	২
৩৩.	ট্যাম্পো	৫০
৩৪.	থ্রি হুইলার	২
৩৫.	বাইসাইকেল	৭৭
৩৬.	ওয়াটার ব্রাউজার (১০০০০ লিটার)	৩
	মোট =	**১৬১২৪**

<u>বাংলাদেশ পুলিশের টিওএন্ডইভুক্ত জলযানের বিবরণ</u>

নং	জলযানের ধরন	টিওএন্ডইভুক্ত সংখ্যা
১.	লঞ্চ	২৩
২.	স্পিড বোট	১৭৭
৩.	পেট্রোল বোট	২৪

নং	জলযানের ধরন	টিওএন্ডইভুক্ত সংখ্যা
৪.	কান্ট্রি বোট	১৬৭
৫.	পোর্টেবল ফোল্ডিং বোট	২৮
৬.	ওয়াটার বাইক	১৮
৭.	রেসকিউ বোট	১০
৮.	ভেসেল	১২
৯.	নৌযান (জাহাজ/শিপ)	১
১০.	রিভারাইন পেট্রোল ভেসেল	৩
১১.	হাইস্পিড বোট (বড়)	৩
১২.	হাইস্পিড বোট (ছোট)	৩
১৩.	অ্যাম্বুলেন্স বোট	১
১৪.	অগ্নিনির্বাপণ জলযান	২
১৫.	পিএল-১৮	১
১৬.	ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট	৯
	মোট =	**৪৮২**

<u>আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় ও ছোট জেলার যানবাহনের তথ্যচিত্র</u>

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	থানার সংখ্যা	টিওএন্ডইভুক্ত সংখ্যা	রাজস্ব (অন্যান্য)	সর্বমোট
১)	চট্টগ্রাম জেলা	১৭ টি	৭৬ (পিক আপ-২০ মোটরসাইকেল-৪৫)	১১৯ (পিক আপ-৪২)	১৯৫
২)	মেহেরপুর জেলা	৩ টি	২৫ (পিক আপ-০৩ মোটরসাইকেল-১৬)	৩৩ (পিক আপ-১৩)	৫৮

খ) যন্ত্রপাতির বিবরণী: বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ও Sopuisticated যন্ত্র ক্রয় করা হয়। অত্র শাখা হতে নিয়মিত বেতের লাঠি, এক্সপেন্ডবল, ব্যাটন, টিভি, ফ্রিজ, ফটোকপি মেশিন, হ্যান্ডকাফ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ইন্টেলিজেন্স ইকুইপমেন্ট, Exclosive Storage Magazine, Rapid DNA Analizer, Surveillance Drone, Forged Document Examination System, Gas Detector, Digital Comparision Microscope ইত্যাদি Sophisticated যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশনাল ইউনিটসমূহের অপারেশনাল কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও আধুনিক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ইন্টেলিজেন্ট ইকুইপমেন্ট ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা প্রয়োজন। ডিউটিকালিন পুলিশ সদস্যদের ঝুঁকি এড়াতে প্রযুক্তির আরও ব্যবহার যেমন—বোমা নিষ্ক্রিয়করণে রোবট, প্রতিপক্ষের ড্রোন হামলা প্রতিহত করতে সার্ভিলেন্স ড্রোন, অ্যান্ট্রি ড্রোন সিস্টেম, ড্রোন ক্যাচার-এর ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে।

এছাড়া CID, SB, CTTC ATU, PBI, APBn পার্বত্য জেলাসমূহ ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত ইউনিটের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য ও মানসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কাজের ধরন অনুযায়ী যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা অতীব জরুরি।

গ) পোশাক সামগ্রী: Police Regulation, 1943 এর Regulation 955, 957, 958 এবং 562 অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ পোশাক সামগ্রী ও নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়। পুলিশ সংস্কার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক Police Regulation, 1943 এর Regulation 955, 957, 958 এবং 562 সংশোধনকল্পে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এবং Police Dress Ruls, 2004 (সংশোধনীসহ)।

পুলিশ সদস্যদের প্রাধিকার অনুযায়ী সম্পূর্ণ মালামাল (পোশাক সামগ্রী) ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করতে আনুমানিক ৮৫০,০০,০০,০০০/- (আটশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু উক্ত খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকায় রেশনিং-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পোশাক সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।

ঘ) লজিস্টিকস আইটেম: বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য (রেশন), চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও প্রতিষেধক ক্রয় করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশের মোট ১৮৩টি ইউনিটের বিভিন্ন প্রকারের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। ১৪৩টি Personal Lodger Account ধারী ইউনিটের মাধ্যমে প্রাপ্যতা অনুযায়ী রেশনসামগ্রী এবং পুলিশের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের নিমিত্তে বিভিন্ন ওষুধ সামগ্রী ক্রয় করা হয়।

ঙ) অস্ত্র-গোলাবারুদ: বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশনাল কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন ও দাঙ্গা দমনে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক মানের ও উন্নত প্রযুক্তির সামগ্রী যেমন টিয়ার গ্যাসের শেল, কালার স্মোক গ্রেনেড, সাউন্ড গ্রেনেড, পিস্তল, রাইফেল, শটগানসহ প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে আধুনিক মানের ব্যক্তিনিরাপত্তা সামগ্রী যেমন Bullet Proof Vest, Full Protection Jacket, Anti Explosive Blanket, VIP Protection Vest, Ballistic Blanket, Bomb Disposal Suit, Ballistic Suitcase, Tactical Belt ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে।

<u>পুলিশ সদস্যদের বিদ্যমান অস্ত্র নীতিমালার ভিত্তিতে প্রাধিকার অনুযায়ী ক্রয়কৃত অস্ত্রের তালিকা:</u>

ক্র: নং	ক্রয়কৃত অস্ত্রের ধরন
১.	.৩০৩ রাইফেল
২.	৭.৬২ এমএম রাইফেল
৩.	৭.৬২/৯ এমএম পিস্তল
৪.	৯ এমএম এসএমজি
৫.	.৪৫ ইঞ্চি এসএমজি

ক্র: নং	ক্রয়কৃত অস্ত্রের ধরন
৬.	১২ বোর শটগান
৭.	৩৮ এমএম টিআর গ্যাস গান/লাঞ্চার

পুলিশ সদস্যদের অপারেশনাল কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন ও দাঙ্গা দমনে ক্রয়কৃত গ্যাসসামগ্রী:

ক্র: নং	ক্রয়কৃত গ্যাসসামগ্রীর ধরন
১.	৩৮ এমএম টিয়ার গ্যাসের শেল (লং রেঞ্জ)
২.	৩৮ এমএম টিয়ার গ্যাসের শেল (শর্ট রেঞ্জ)
৩.	৩৮ এমএম টিয়ার গ্যাসের শেল (৩ মিউনিশন)
৪.	টিয়ার গ্যাস হ্যান্ড গ্রেনেড
৫.	কালার স্মোক গ্রেনেড
৬.	সাউন্ড গ্রেনেড
৭.	মাল্টি ইমপ্যাক্ট টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড
৮.	মাল্টিপেল ব্যাঙ্গা/ফ্লাশ ব্যাঙ্গা/স্টান গ্রেনেড

পুলিশ সদস্যদের জন্য ক্রয়কৃত ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রী :

ক্র: নং	ক্রয়কৃত ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রীর ধরন
১.	বুলেট প্রুফ ভেস্ট (লেভেল-৪)
২.	বুলেট প্রুফ ভেস্ট (লেভেল-৩এ)
৩.	ফুল প্রটেকশন জ্যাকেট (লেভেল-৩এ)
৪.	অ্যান্টি-এক্সপ্লোসিভ ব্লাঙ্কেট
৫.	ভিআইপি প্রটেকশন ভেস্ট (লেভেল-৩এ)
৬.	বুলেট প্রুফ ভেস্ট উইথ লাইফ জ্যাকেট
৭.	ব্যালিস্টিক ব্লাঙ্কেট
৮.	বোম ডিসপোজাল সুইট
৯.	ব্যালিস্টিক সুইটকেস
১০.	ট্যাকটিক্যাল বেল্ট

এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের ব্যবহারের নিমিত্তে UN SOP অনুযায়ী বিভিন্ন মিশন থেকে প্রাপ্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং ব্যক্তিনিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের SUR (স্টেটমেন্ট

অব ইউনিট রিকয়ারমেন্ট) অনুযায়ী Personal Weapons (Individual) হিসেবে নিম্নলিখিত অস্ত্র প্রেরণ করা হয়।

ক্র. নং	অস্ত্রের বিবরণ
১	৯ মি. মি. পিস্তল
২	৭.৬২ মি. মি. রাইফেল
৩	৭.৬২ মি. মি. এসএমজি

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের SUR (স্টেটমেন্ট অব ইউনিট রিকয়ারমেন্ট) অনুযায়ী Armaments হিসেবে নিম্নলিখিত অস্ত্র প্রেরণ করা হয়।

ক্র. নং	অস্ত্রের বিবরণ
৪	৭.৬২ মি. মি. সিএসএমজি (Crew Seved Machine Gun)

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের SUR (স্টেটমেন্ট অব ইউনিট রিকয়ারমেন্ট) অনুযায়ী Riot Cotrol Equipments হিসেবে নিম্নলিখিত রায়ট সামগ্রী প্রেরণ করা হয়।

ক্র. নং	রায়ট সামগ্রীর বিবরণ
১	ফ্লেয়ার/সিগন্যাল পিস্তল
২	টেজার গান

চ) প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি: বাংলাদেশে প্রযুক্তির প্রসারণের জন্য অপরাধ সংগঠনেও পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। তথ্যপ্রযুক্তির ফলে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ পুলিশে Criminal Database Management System (CDMS) সংযোজনের মাধ্যমে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, অনলাইন জিডি, পুলিশ সদস্যদের তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্তে গঠিত Police Information Management System (PIMS) সহ নানাবিধ IT সংক্রান্ত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সলিউশন ক্রয় করা হয়ে থাকে।

৮) বাজেট:

বাংলাদেশ পুলিশের সামগ্রিক বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমান অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) পুলিশের জন্য ১৮৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা মোট জাতীয় বাজেটের (৭৯৭০০ কোটি) ২.৩১%। ইতোপূর্বেকার দুটি অর্থবছরেও (২০২৩-২৪ এবং ২০২২-২৩) যে বাজেটের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তা মোট বাজেটের যথাক্রমে ২.৪৬% এবং ২.৪৪% ছিল। প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার জনবলের পুলিশ বাহিনীর জন্য বরাদ্দকৃত এ বাজেটের অর্ধেকের বেশি অর্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ বরাদ্দ করা হয়। বাকি অর্থ মূলত অপারেশনাল, অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয়। নিম্নে বিগত তিন অর্থবছরের বাজেট তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

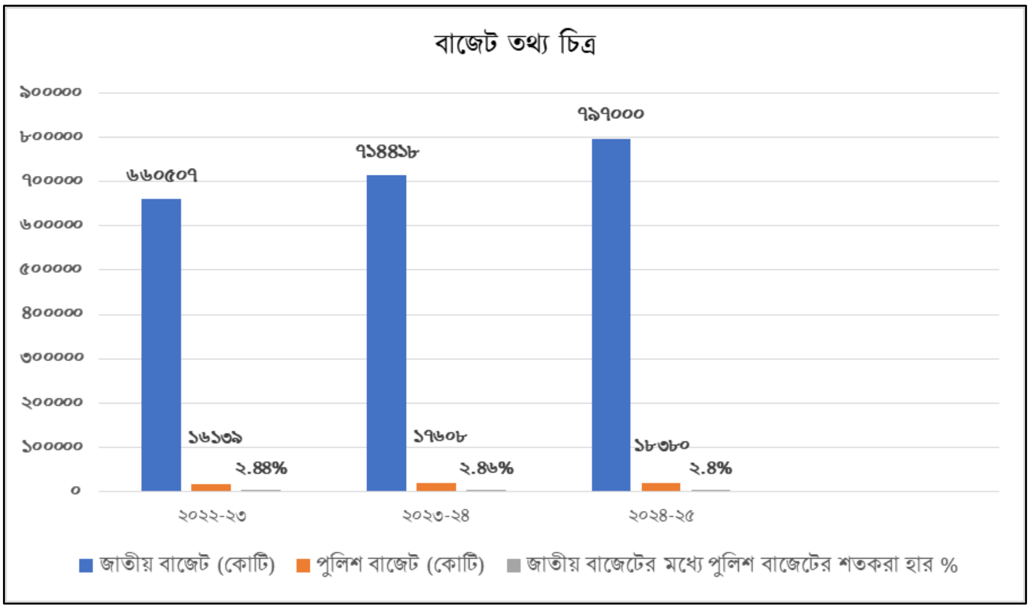

জনগণের সেবাপ্রাপ্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে থানা। এই থানায় কর্মরত জনবলকে তার দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম (যেমন: অপরাধ তদন্ত, টহল, জনসংযোগ ইত্যাদি) যথাযথভাবে করতে গেলে পর্যাপ্ত বাজেটের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ এই অর্থবছরে ৬৬৪ টি থানার বিভিন্ন খাতে (স্বাস্থ্যবিষয়ক, মনোহরি পণ্য ও অন্যান্য আইটেম) মাত্র ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যা একটি থানার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে নিরূপণের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। নিম্নে বিগত তিন অর্থবছরে থানায় বাজেট বরাদ্দ চিত্র তুলে ধরা হলো।

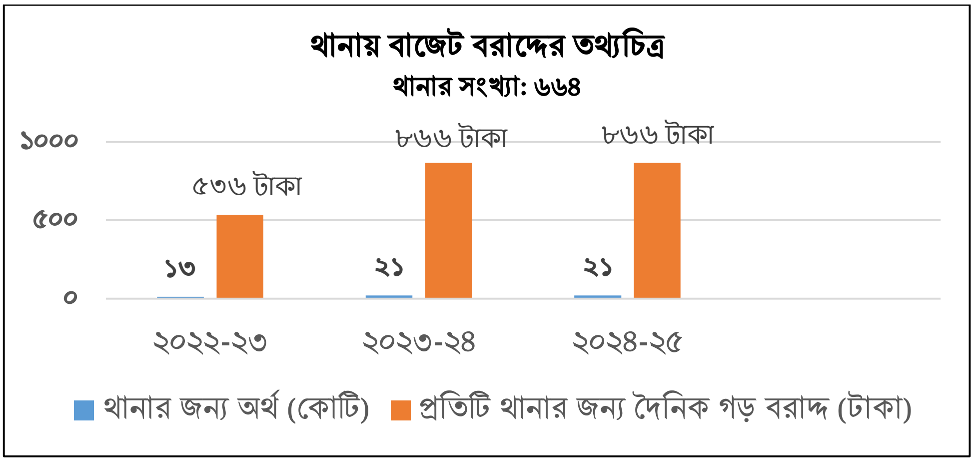

গত অর্থবছরের মামলার সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ মামলা থানায় রুজু হচ্ছে। এই মামলাগুলো তদন্তের লক্ষ্যে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে একাধিকবার ঘটনাস্থল, আসামির সমস্ত আশ্রয়স্থল, সাক্ষীর আবাসস্থলসহ বিভিন্ন জায়গায় গমন করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য সোর্স নিয়োগ করতে হয়। এসব কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যথোপযোগী আর্থিক সংশ্লেষের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মামলার তদন্ত খাতে অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। এই অর্থবছরে তদন্ত খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৪ কোটি টাকা। রুজুকৃত মামলার সংখ্যা বিচারে গড় করলে একটি মামলার জন্য গড় খরচ ৩৬০০ টাকা হয়, যা খুবই সামান্য।

পুলিশের স্বাভাবিক কার্যক্রম অধিকতর পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ হলো প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ বাবদ এ বছর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৭৪ কোটি টাকা, যা পুলিশের মোট

বাজেটের প্রায় ০.৪%। প্রশিক্ষণ বাজেটের এ অপ্রতুলতা পুলিশের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষ বাধাগ্রস্ত করে। নিম্নে বিগত তিন অর্থবছরের বাজেট চিত্র তুলে ধরা হলো।

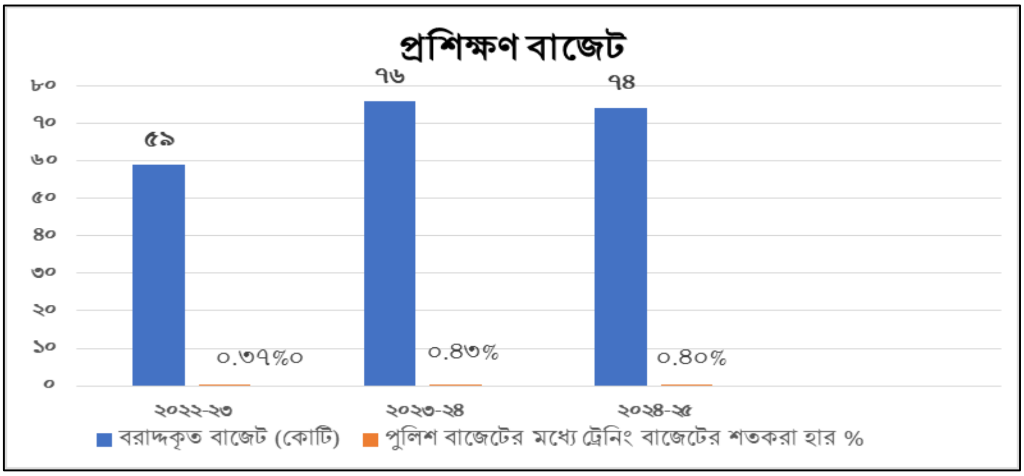

এসব ছাড়াও গত বেশ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশ পুলিশের যানবাহন ক্রয় এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সরকারের নির্দেশনার আলোকে বন্ধ রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাজেট ঘাটতির কারণে পুলিশের অপারেশনাল কার্যক্রম প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পুলিশের বাজেট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যচিত্র সংযুক্ত করা হলো। **[পরিশিষ্ট-৩]**

৯) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হচ্ছে , বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা। শতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ পুলিশ একাডেমিতে প্রবেশনার সহকারী পুলিশ সুপারসহ, সাব-ইন্সপেক্টর/সার্জেন্ট ও অন্যান্য পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি), ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, ১টি এএসটিসি, ১টি টিডিএস, ও ১টি পিএসটিসি রয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জ্ঞানগত গবেষণা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ১টি পুলিশ স্টাফ কলেজ রয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশে সহকারী পুলিশ সুপার, সাব-ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট এবং কনস্টেবল এই চারটি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসকল পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আলাদা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সিলেবাসসমূহে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ (যেমন- শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদন্ত ও তদারকি ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার সুরক্ষা, জেন্ডার বিষয়ক ইস্যু, সমসাময়িক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, জনসম্পৃক্ত পুলিশিং, জবাবদিহিমূলক পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়সমূহ) কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রশিক্ষণকালে পুলিশ সদস্যগণ আত্মস্থকরণের মাধ্যমে তার পেশাগত উৎকর্ষতা সাধন করেন।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ছাড়া কোনো পোশাকধারী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি দুরূহ বটে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু, বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ বাজেট এক্ষেত্রে অপ্রতুল। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান অর্থবছরে

(২০২৪-২০২৫) বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ বাজেট ছিল ৭৪ কোটি টাকা আর পুরো বাহিনীর বাজেট ছিল ১৮৩৮০ কোটি টাকা। গাণিতিক হিসাবে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ বাজেট পুরো বাজেটের মাত্র ০.৪%, যা যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের পথকে সংকুচিত করে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যচিত্র সংযুক্ত করা হলো। **[পরিশিষ্ট-৪]**

১০) সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ক্ষয়ক্ষতি:

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় বাংলাদেশ পুলিশের বেশ কিছু সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন এবং গুরুতর জখম হয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন----মেশিন ও স্থাপনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং যানবাহন ধ্বংস ও ভাঙচুর হয়। বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলনে মেট্রোপলিটন, এসবি, পিবিআই, ট্যুরিস্ট পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ এবং জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার মোট ৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়াও বর্ণিত সহিংসতায় গুরুতর সাধারণ জখম মিলিয়ে মোট ২৪৬৬ জন আহত হয়েছে। নিহত ও আহতদের তালিকা সংযুক্ত করা হলো। **[পরিশিষ্ট-৫]**

বাংলাদেশ পুলিশের যানবাহন ক্ষয়ক্ষতির ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট ১১৪৬টি গাড়ি ও মোটরসাইকেল ভস্মীভূত ও ভাঙচুর হয়েছে, যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৮৫ কোটি ৮০ লাখ ২৯ হাজার টাকা। সর্বমোট ৭১টি পুলিশ ইউনিটের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ডিএমপি, আরএমপি, জিএমপি, সিএমপি, হাইওয়ে, কুমিল্লা জেলা, পিবিআই, ঢাকা জেলা ও এসপিবিএন-২ উল্লেখযোগ্য।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার দলীয় পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুলিশি স্থাপনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সর্বমোট ৪৬০টি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২১৩.৫৩ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ২২৪টি স্থাপনায় অগ্নিকান্ড হয়েছে এবং ২৩৬টি স্থাপনায় ভাঙচুর করা হয়েছে। বর্তমানে পুলিশের সকল ইউনিটের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে ১৫টি থানার কার্যক্রম অন্য ভবনে স্থানান্তর করে পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের যানবাহন ও স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যচিত্র সংযুক্ত করা হলো। **[পরিশিষ্ট-৬]**

১১) সারকথা

বাংলাদেশ পুলিশ রাষ্ট্রের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য নিরলসভাবে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং কর্মের প্রকৃতি অনুসারে কখনো কখনো এ বাহিনীর সদস্যদের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু, সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে যে, পুলিশকে জবাবদিহিমূলক, জনসম্পৃক্ত ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এর সনাতনী আইনি সংস্কার, পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজেট বৃদ্ধি এবং পুলিশ সদস্যদের প্রয়োজনীয় কল্যাণের দিকে নজর দেওয়া একান্তভাবে কাম্য। এতে পুলিশ যেমন যথাযথভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হবে, তেমনি উপকৃত হবে রাষ্ট্র, নিরাপদ থাকবে দেশের জনগণ।

৬.১৭ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ: **(মূল প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬.১৭ দ্রষ্টব্য ৭৯ পৃষ্ঠা):**

বিষয়: নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা

১.০। ভূমিকা

কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ ও সফলতা সাধন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সদস্যদের মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য ন্যায়ত একটা সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা। কেননা কর্মস্থলে গতিশীলতা আনতে নতুন নিয়োগের পাশাপাশি পদোন্নতি ও পদায়নসহ প্রশিক্ষণের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতি ও পদায়নসহ প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় না। কেননা পদোন্নতি বা উপযুক্তস্থানে পদায়ন না হলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা যায়, যার নেতিবাচক প্রভাব সামগ্রিক কাজের ওপর পড়ে। কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনিয়মিত পদোন্নতি ও যোগ্য কর্মীকে অযোগ্যস্থানে পদায়নের কারণে অধিক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন কর্মীদের উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে নিরুৎসাহিত করে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ পুলিশের সুষ্ঠু ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করা হলে তা সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের মনোবল ও কর্মস্পৃহা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি জনসম্পদ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ঘটবে যা সার্বিকভাবে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে বিশ্বজুড়ে পুলিশিং ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ পুলিশেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পুলিশিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন অতীব জরুরি। তাই পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মজীবনে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে **বাংলাদেশ পুলিশের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার অতীব জরুরি।**

২.০। উদ্দেশ্য

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী পুলিশিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পুলিশের সেবা প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিপূর্বক বাংলাদেশ পুলিশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সমসাময়িক বিরাজমান অপরাধের ধরন অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম-এরূপ সর্বত গ্রহণযোগ্য পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সার্বিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করা।

৩.০। বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সংস্কার করতে অবশ্যই ১৮৬১ সালে প্রণীত সেই ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশ অ্যাক্টকে অধিক যুগোপযোগী করতে হবে। কেননা বৃটিশ আমলে রাজ্য শাসন ও শোষণের জন্যই এ আইন প্রণীত হয়েছিলো। ঐ পুলিশ আইনে সেবার চেয়ে নিয়ন্ত্রণেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই পুলিশ বাহিনীকে একটি পেশাদার, জবাবদিহিমূলক এবং দক্ষ পরিষেবাদান-এর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের শক্তিশালী ভিত্তি এনে দিতে পুলিশিং সম্পর্কিত একটি নতুন আইনি কাঠামো প্রয়োজন। এর জন্য আইনি কাঠামো থেকে শুরু করে পুলিশ কল্যাণ, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, পুলিশের সকল শ্রেণির নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং জনসম্পৃক্ত কর্মসূচির অনুশীলন পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থার সবকিছুতেই সংস্কার জরুরি। এছাড়া বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাধারণ নিয়োগের সাথে মিলিয়ে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা সমীচীন নয় মর্মে প্রতীয়মান।

যদিও ২০০৭ সালে এবং আবার ২০১৩ সালে, একটি পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের অধীনে নতুন আধুনিক একটি পুলিশ অধ্যাদেশের খসড়া বাংলাদেশ তৎকালীন সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়েছিলো। ঐ খসড়া অধ্যাদেশটিতে গণতান্ত্রিক, জনবান্ধব পুলিশিং ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে, একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থাসহ জনসাধারণের পক্ষ থেকে তদারকি এবং জবাবদিহিতা আদায়ের বিধান রাখা হয়েছিলো। কিন্তু সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ঐ খসড়া অধ্যাদেশটি রাজনৈতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্তের অভাবে থমকে যায়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পুলিশের সেবার মান বাড়াতে হলে সবার আগে নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। এমনকি পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও শৃঙ্খলার জায়গাগুলোতে শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই পুলিশের সেবার মান উন্নীত করা সম্ভব হবে। এছাড়া পুলিশে কর্মরত জুনিয়র ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার যে অভাব-তা নিরসনেও বিদ্যমান পুলিশ আইনের সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলিশ বাহিনীর মতো বিশেষায়িত সংস্থার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, মনস্তাত্ত্বিক ও বিচক্ষণতাসহ সামগ্রিক বিষয়াদি পরীক্ষণের কার্যক্রম সাধারণত একটি শৃঙ্খলা বাহিনীর নিজস্ব মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য সংস্থার সাধারণ নিয়োগের সাথে মিলিয়ে পুলিশের নিয়োগ করা সমীচীন হবে না মর্মে প্রতীয়মান।

সার্বিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ/পুলিশ আইনে **বাংলাদেশ পুলিশ কমিশন**-এর অধীন একটি স্বতন্ত্র **'বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন'** প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে **১৮৬১**

সালে প্রণীত পুলিশ আইন বাতিলপূর্বক প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ/পুলিশ আইনে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও বেতন-ভাতাদিসহ **পুলিশের আইজিপি হতে কনস্টবেল পদের সকল শ্রেণির নিয়োগ, পদায়ন, প্রশিক্ষণ, কল্যাণ ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত** করতে হবে। এক্ষেত্রে সততা, মেধা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদির ভিত্তিতে পুলিশের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি অধিক সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধনপূর্বক সমাজে কার্যকর করা হলে পুলিশের টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বাস্তবায়িত হবে, যা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করবে, নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের সুরক্ষা দেবে। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। পুলিশ জননিরাপত্তা ও মানবাধিকারের রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হবে।

৪.০। পুলিশের নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে পুলিশ সংস্কারের লক্ষ্য হবে- এমন একটি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা, যা হবে গণতান্ত্রিক, জনমুখী এবং সমাজে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানাবিধ চাহিদা পূরণে করিৎকর্মা। পুলিশকে জননিরাপত্তা ও মানবাধিকারের রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হতে হবে। এর জন্য আইনি কাঠামো থেকে শুরু করে পুলিশ কল্যাণ, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং জনসম্পৃক্ত কর্মসূচির অনুশীলন পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থার সবকিছুরই সংস্কার প্রয়োজন।

৪.১। পুলিশ নিয়োগে প্রচলিত পদ্ধতি (বিধি-বিধান):

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে **তিন স্তরে চার ক্যাটাগরিতে** পুলিশ সদস্য নিয়োগ করা হয়। তা হলো-

১ম স্তর: কনস্টেবল পদে নিয়োগ;

২য় স্তর: ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) ও সার্জেন্ট পদে নিয়োগ; ও

৩য় স্তর: সহকারী পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ।

এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশে বিভিন্ন শ্রেণি বা পদে সিভিল কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪.১.১। ১ম স্তর: ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতি (১৭তম গ্রেডের বেতনস্কেল):

পুলিশ রেগুলেশনস্, ১৯৪৩ এর প্রবিধান-৭৪৬ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলার পুলিশ সুপার নিয়োগ কার্যক্রম করে থাকেন। অধিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এ নিয়োগের তদারকি কেন্দ্রীয়ভাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স করে থাকে। সর্বশেষ ২০২১ সালে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে অধিক যোগ্য ও মেধাবী সদস্য নিয়োগকরত বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিক ও যুগোপযোগী পুলিশ বাহিনীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বর্ণিত প্রবিধান-৭৪৬ এর Method of Recruitment, Age for Recruitment, Qualifications, Physical Endurance Text (PET), Written Text, Viva-voce and Psychological Text, Medical Certificate, Verification of character and antecedents সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি গেজেটমূলে সংশোধন করা হয়েছে।

উক্ত পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সেপ্টেম্বর ২০২১ সাল হতে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ কার্যক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড্ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষায় ৪৫ নম্বর এবং মৌখিক ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ১৫ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র সংক্রান্ত পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়ে থাকে।

৪.১.২। ২য় স্তর: ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) ও পুলিশ সার্জেন্ট পদে প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতি (১০তম গ্রেডের বেতনস্কেল):

পুলিশ রেগুলেশনস্, ১৯৪৩ এর প্রবিধান-৭৪১ ও প্রবিধান-৭৩৯ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ পুলিশে ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে পুলিশ সুপার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল (এআইজি) হলেও অধিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ধাপে একাধিক কমিটির মাধ্যমে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। সর্বশেষ ২০২১ সালে ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে অধিক যোগ্য ও মেধাবী সদস্য নিয়োগকরত

বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিক ও যুগোপযোগী পুলিশ বাহিনীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে যথাক্রমে প্রবিধান-৭৪১ এবং প্রবিধান-৭৩৯ এর

Method of Recruitment, Age for Recruitment, Qualifications, Physical Endurance Text (PET), Written Text, Viva-voce and Psychological Text, Medical Certificate, Verification of character and antecedents সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি গেজেটমূলে সংশোধন করা হয়।

উক্ত পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০২১ সাল হতে যথাক্রমে ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং পুলিশের সার্জেন্ট পদে নিয়োগ কার্যক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড্ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষায় ২৫০ নম্বর এবং মৌখিক ও মনস্তত্ব বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র সংক্রান্ত পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়ে থাকে।

৪.১.৩। ৩য় স্তর: সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতি (৯ম গ্রেডের বেতনস্কেল):

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিএস পুলিশের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে প্রার্থীর Qualifications, Preliminary Text, Written Text, Viva-voce and Psychological Text, Medical Text, Verification of character and antecedents বিবেচনান্তে উক্ত পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ২০০ নম্বরের মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়ে থাকে।

৪.১.৪। নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতি:

বিদ্যমান পুলিশ রেগুলেশনস্, ১৯৪৩ এর প্রবিধান ৮০৭ এবং পুলিশ বিভাগ (নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সিভিল কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পুলিশ বাহিনীতে নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে যেমন- প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা,

আইটি শাখা, নৌ শাখা, মেডিক্যাল শাখা, প্রকৌশল শাখা, বিশেষজ্ঞ শাখা ও ট্রেড শাখা ইত্যাদি শাখায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এবং ২০তম গ্রেড হতে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত বেতনস্কেলে চাকরি করে থাকে।

৪.২। পুলিশের নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার প্রস্তাবনা:

বাংলাদেশ পুলিশকে একটি জনবান্ধব ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। এবারের সংস্কারে পুলিশে জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া পুলিশের প্রশিক্ষণে সামাজিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়গুলোকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সব সংস্কার আইন দিয়ে হয় না। অথচ আমরা সংস্কারে শুধু আইনের ওপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। অথচ প্রতিটি সংস্কারের মূল বিষয় হচ্ছে মূল্যবোধ।

এ লক্ষ্যে পুলিশের সকল স্তরের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ও পদায়ন থাকবে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশনের অধীন। সততা, মেধা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদির ভিত্তিতে পুলিশের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সকলের

জন্য সমন্বিতভাবে একক চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি) বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত বিধিমালায় বাংলাদেশ পুলিশকে অধিক স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, জনবান্ধব ও সর্বত গ্রহণযোগ্য বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য **ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে বিদ্যমান তিন স্তরের পরিবর্তে দুই স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন** করতে হবে। তা হলো-

১ম স্তর: সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে নিয়োগ; এবং
২য় স্তর: ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ।

এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ট্রেড পুলিশম্যান ও দাপ্তরিক কাজে নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নির্ধারিত পদে জনবল নিয়োগ করতে হবে।

৪.২.১। ১ম স্তর: সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার (জাতীয় বেতনস্কেল ৯ম গ্রেড):

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর অধীন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে জনবল নিয়োগ করতে হবে। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতক ডিগ্রি/সমমান, বয়স-২১ হতে ৩২ বছর, উচ্চতা-কমেপক্ষে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি (পুরুষ) ও ৫ ফুট ২ ইঞ্চি (নারী), ওয়েববেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং, শারীরিক যোগ্যতা ও

সক্ষমতা যাচাই, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক ও কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষা, পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি, পুলিশ ভেরিফিকেশন ইত্যাদি পুলিশের সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য সমন্বিত একটি স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। সার্ভিসভাবে কমিশনের নিয়ন্ত্রণে এ নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অধিক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করতে এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে পৃথক কমিটির মাধ্যমে নিম্নরূপভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ (প্রস্তাবিত)-

প্রথম ধাপ: অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

দ্বিতীয় ধাপ: ওয়েববেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং

তৃতীয় ধাপ: শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ

চর্তুথ ধাপ: ৭ ক্যাটাগরিতে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা বা Physical Endurance Test (PET)

পঞ্চম ধাপ: ওয়েববেজড আবেদনফরম পূরণ

ষষ্ঠ ধাপ: ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

সপ্তম ধাপ: ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ

অষ্টম ধাপ: নির্ধারিত নম্বরের মনস্তত্ত্ব ও কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষা

নবম ধাপ: ১০০ নম্বরের বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষা

দশম ধাপ: স্বাস্থ্য পরীক্ষা (ওয়েববেজড আবেদনফরম অনলাইনে ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা গ্রহণ)

একাদশ ধাপ: পুলিশ ভেরিফিকেশন (ওয়েববেজড আবেদনফরম পূরণ ও যাচাইকরণ)

দ্বাদশ ধাপ: সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন

অতঃপর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে নিয়োগের পর দুই বছর মেয়াদি শিক্ষানবিসকাল থাকবে। তন্মধ্যে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ছয় মাস মেয়াদি বাস্তব প্রশিক্ষণ সফলভাবে

সম্পূর্ণ করতে হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে যুগোপযোগী ও আধুনিক কারিকুলাম সমৃদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উন্নত প্রশিক্ষণের নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া নির্ধারিত নম্বরের বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অতঃপর সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদে চাকরি স্থায়ী হলে তাকে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৮ম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাদান করতে হবে।

এ লক্ষ্যে বর্তমানে বিসিএস পুলিশ সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Civil Service (Enforement: Police) Composition and Cadre Rules, 1980, Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাবলি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নকরত পুলিশের আইজিপি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য একটি সমন্বিত **বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি) বিধিমালা** প্রণয়ন করতে হবে।

৪.২.২। ২য় স্তর: ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার (জাতীয় বেতনস্কেলের ১৬তম গ্রেড):

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর অধীন বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয়ভাবে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে জনবল নিয়োগ করতে হবে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা-এইচএসসি/সমমান, বয়স-১৮ হতে ২২ বছর, উচ্চতা-কমেপক্ষে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি (পুরুষ) ও ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি (নারী), ওয়েববেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং, শারীরিক সক্ষমতা ও গঠন যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা পদ্ধতি, পুলিশ ভেরিফিকেশন ইত্যাদি পুলিশের সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য সমন্বিত একটি স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধিমালার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। এ নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অধিক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করতে এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে গঠিত পৃথক কমিটির মাধ্যমে নিম্নরূপভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ-

প্রথম ধাপ: অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

দ্বিতীয় ধাপ: ওয়েববেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং

তৃতীয় ধাপ: শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ

চর্তুথ ধাপ: শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা বা Physical Endurance Test (PET)

পঞ্চম ধাপ: ওয়েববেজড আবেদনফরম পূরণ

ষষ্ঠ ধাপ: লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ

সপ্তম ধাপ: বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষা

অষ্টম ধাপ: স্বাস্থ্য পরীক্ষা (ওয়েববেজড আবেদনফরম অনলাইনে ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা গ্রহণ)

নবম ধাপ: পুলিশ ভেরিফিকেশন (ওয়েববেজড আবেদনফরম পূরণ ও যাচাইকরণ)

দশম ধাপ: ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন

অতঃপর ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে মৌলিক প্রশিক্ষণ এক বছর মেয়াদি ও শিক্ষানবিসকাল দুই বছর মেয়াদি হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে যুগোপযোগী ও আধুনিক কারিকুলামে আবাসন সুবিধা সমন্বিত উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে মৌলিক প্রশিক্ষণকালীন কনস্টেবলের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করতে হবে। অতঃপর উক্ত পদে নিয়মিত যোগদান করার তারিখ হতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৭তম গ্রেডের স্থলে **১৬তম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি** প্রদান করতে হবে।

এ লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত অধস্তন কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশ রেগুলেশনস্, ১৯৪৩ এর প্রযোজ্য প্রবিধানসমূহ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাবলি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নকরত পুলিশের আইজিপি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য একটি সমন্বিত **বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি) বিধিমালা** প্রণয়ন করতে হবে।

৪.২.৩। ট্রেড পুলিশম্যান পদে নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার প্রস্তাবনা:

একটি শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে অন্যান্য বাহিনীর সাথে সমুন্নতভাবে কাজ করতে কিছু বিষয়কে একই প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে বিবেচনা করা সমীচীন। এ ধরন ও প্রকৃতির নিয়োগ বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীসহ আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নেও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন কেন্দ্রীয়ভাবে এ বাহিনীতে ট্রেড পুলিশম্যান নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কাজের প্রকৃতি ও ধরন (যেমন-চালক, দেহরক্ষী, অফিস আরদালি, মেকানিক, ইলিক্ট্রিশিয়ান, নাপিত, মুচি, সারেং, সুকানি, হরিজন, বাবুর্চি, দর্জি, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি) বিবেচনায় একটি স্বতন্ত্র নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সম্বনিত একক নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-খ)**। উক্ত বিধিমালায় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা-

৮ম শ্রেণি/সমমান, বয়স-১৮ হতে ২৫ বছর, শারীরিক সক্ষমতা ও গঠন, লিখিত, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মৌখিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার পদ্ধতি, পুলিশ ভেরিফিকেশন ইত্যাদির নিয়মাবলি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.২.৪। নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিভিন্ন পদে নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার প্রস্তাবনা:

পুলিশ রেগুলেশনস্, ১৯৪৩ এর প্রবিধান ৮০৭ এবং পুলিশ বিভাগ (নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে বাংলাদেশ পুলিশে সিভিল কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান সকল ইউনিটে কর্মরত নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত একক নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-খ)**। উক্ত বিধিমালায় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-পুলিশ কর্মকর্তাদের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে আন্তঃবদলির সুযোগ থাকতে হবে। এ বিধিমালায় কর্মপেশার শ্রেণিভিত্তিক নিয়োগ ও উচ্চতর ধাপে পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে। প্রণীতব্য বিধিমালায় কাজের ধরন ও পেশা বিবেচনায় নিয়োগ ও পদোন্নতির শর্তাবলি সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ কার্যক্রম প্রযুক্তিনির্ভর ও ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া বিশেষক্ষেত্রে সরকারের অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রেষণে পদায়নের সুযোগ রাখতে হবে।

৪.৩। পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা:

উপরিউক্ত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে:

১) সময়ের দাবি অনুযায়ী আধুনিক পুলিশ বাহিনী গঠন;
২) বর্তমান বাস্তবতার আলোকে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম পুলিশ বাহিনী গঠন;
৩) আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষমতা সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী; এবং
৪) যুগোপযোগী ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বাস্তবায়ন হবে।

৫.০। পুলিশের পদোন্নতি সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা

সরকারি চাকরি আইন-২০১৮ এর ৮(১) ধারায় কোনো স্থায়ী সরকারি কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদানের সময় তার সততা, মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের অর্জিত ফলাফল পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রণোদনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয় খুবই কম। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণকালে অযথা সময়ক্ষেপণ করে এবং নিজেকে দক্ষ

হিসেবে গড়ে তোলার কোনো তাগিদ অনুভব করে না। ফলে প্রশিক্ষণ খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। এক্ষেত্রে পুলিশের প্রশিক্ষণের সাথে প্রণোদনার সমন্বয়হীনতাই অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। যা গুরুত্ব দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো-

ক) প্রশিক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

খ) প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফল কে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে।

এ লক্ষ্যে পুলিশের বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং সরকার ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাবলি অধিক যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নকরত আইজিপি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য একটি সমন্বিত বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি) বিধিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। এছাড়া ট্রেড পুলিশম্যানসহ নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরবর্তী উচ্চতর ধাপে পদোন্নতি প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

৫.১। জুনিয়র ধাপ: কনস্টেবল হতে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবনা

৫.১.১। কনস্টেবল হতে নায়েক (জাতীয় বেতনস্কেলে ১৪তম গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন কেন্দ্রীয়ভাবে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। তবে কনস্টেবল পদে চাকরি স্থায়ী ও **৩ (তিন) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন হলে ব্যাচভিত্তিক নায়েক পদে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আগ্রহী প্রার্থীকে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অতঃপর নায়েক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১৪তম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণের ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে। আরো শর্ত থাকে যে, আগ্রহী প্রার্থী সর্বোচ্চ **৩/4 বার পরীক্ষায়** অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারপরও তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তার চাকরিকাল **২৫ বছর কিংবা বয়স ৪৫ বছর** হলেই (যেটি আগে ঘটে) তাকে চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে চাকরি থেকে অবসর প্রদানকালীন তাকে অফিসিয়েটিং নায়েক পদে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।

৫.১.২। নায়েক হতে এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট (জাতীয় বেতনস্কেলের ১২তম গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন কেন্দ্রীয়ভাবে ক্যাটগরিভিত্তিক শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে নায়েক পদে চাকরি স্থায়ী ও মোট **৩ (তিন) বছর চাকরিকাল সফলভাবে** সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া বিগত ৩ বছরের চাকরির রেকর্ড ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত শারীরিক সক্ষমতা যাচাই ও নির্ধারিত নম্বরের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অতঃপর বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত)/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/অন্য কোনো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অঞ্চলভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমানের **৩ (তিন) বছর মেয়াদি** প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ের অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। উক্ত প্রশিক্ষণের প্রথম দুই বছর সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রত্যেকের সততা, মেধা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি গুণাবলি যাচাইসাপেক্ষে এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট পদে ক্যাটাগরিভিত্তিক বিভাজন করা হবে। অবশিষ্ট এক বছরের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রত্যেককে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান পাশের সনদপত্র প্রদান করা হবে। অতঃপর তাকে এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদান করা হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১২তম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে। আরো শর্ত থাকে যে, আগ্রহী **প্রার্থী সর্বোচ্চ ৩/4 বার পরীক্ষায়** অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারপরও তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তার চাকরিকাল **২৮ বছর কিংবা বয়স ৪৮ বছর** হলেই (যেটি আগে ঘটে) তাকে চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে চাকরি থেকে অবসর প্রদানকালীন তাকে অফিসিয়েটিং এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদান করতে করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে থানা পুলিশ। থানা পুলিশের সেবার মান যতো সেবামুখী ও উন্নত হবে বাহিনী হিসেবে সমাজে ততই সমাদৃত হবে। সাধারণত থানা পুলিশের দায়িত্ব ও কতর্ব্য-কর্ম বিবেচনায় কর্মবণ্টনকে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। যেমন: তদন্ত ও অপরাধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা, ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রটেকশন ও প্রটোকল ব্যবস্থাপনা। থানার সামগ্রিক কাজ সমন্বয় করার জন্য একজন অফিসার ইনচার্জ পদায়ন করা হয় এবং তার অধীনে

পুলিশের কনস্টেবল হতে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নির্ধারিত সংখ্যক পুলিশ সদস্য চাকরি করে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় পুলিশের কনস্টেবল হতে ইন্সপেক্টরদের কর্মজীবন ও কর্মপরিকল্পনার একটি প্ল্যানিং থাকা খুবই আবশ্যক।

বর্তমানে পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল হতে নিরস্ত্র, সশস্ত্র ও ট্র্যাফিক বিভাগে বিভিন্ন পদে পর্যায়ক্রমে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। তবে থানায় এর প্রভাব তেমন নেই বললেই চলে। কেবল নিরস্ত্র বিভাগে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে থানা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই থানার নিয়মিত কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে

তিন স্তরবিশিষ্ট (নিরস্ত্র, সশস্ত্র ও ট্র্যাফিক) সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি তৈরী করার পাশাপাশি বর্ণিত তিনস্তরের বিপরীতে পুলিশ সদস্যদের পদায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এরই ধারাবাহিকতায় পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তাদের নিরস্ত্র, সশস্ত্র ও ট্র্যাফিক বিভাগে পদোন্নতি ও পদায়নের কর্মপরিকল্পনা করা হলে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও কর্মসম্পাদনের গুণগত পরিবর্তন আসবে।

৫.১.৩। এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট হতে এসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/পুলিশ সার্জেন্ট (জাতীয় বেতনস্কেলের ১০ম গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন কেন্দ্রীয়ভাবে ক্যাটগরিভিত্তিক শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট পদে চাকরি স্থায়ী ও ফিডার পদে **৬ (ছয়) বছর** (গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের ৩ বছরসহ) **চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া বিগত ৩ বছরের চাকরির রেকর্ড ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ এবং নির্ধারিত নম্বরের বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অতঃপর ব্যাচভিত্তিক সততা, মেধা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১০তম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে। আরো শর্ত থাকে যে, আগ্রহী **প্রার্থী সর্বোচ্চ ৩/৪ বার পরীক্ষায়** অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারপরও তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তার চাকরিকাল **৩০ বছর কিংবা বয়স ৫০ বছর** হলেই (যেটি আগে ঘটে) তাকে চাকরি হতে

অবসর প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে চাকরি থেকে অবসর প্রদানকালীন তাকে অফিসিয়েটিং এএসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সহকারী সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।

৫.১.৪। এসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/পুলিশ সার্জেন্ট হতে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র/সশস্ত্র/ট্র্যাফিক) (জাতীয় বেতনস্কেলের ৯ম গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন কেন্দ্রীয়ভাবে ক্যাটগিরিভিত্তিক শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে এসআই (নিরস্ত্র/সশস্ত্র)/সার্জেন্ট পদে চাকরি স্থায়ী ও ফিডার পদে **৬ (ছয়) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক বিয়ষক দুইটি বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ এবং নির্ধারিত নম্বরের বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বিগত ৫ পাঁচ) বছরের চাকরির রেকর্ড ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক থাকতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৯ম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে। তারপরও তিনি পদোন্নতি না পেলে তার চাকরিকাল **৩৫ বছর কিংবা বয়স ৫৫ বছর** হলেই (যেটি আগে ঘটে) তাকে

চাকরি হতে অবসর প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে চাকরি থেকে অবসর প্রদানকালীন অফিসিয়েটিং ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র/সশস্ত্র/ট্র্যাফিক) পদে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে The Police Regulations, 1943 এর প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী পুলিশের কনস্টেবল হতে এসআই/সার্জেন্ট পর্যন্ত পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও শাস্তি ইত্যাদির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে The Junior Police Officers Rules, 1969 এর বিধি-বিধান অনুযায়ী পুলিশ ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও শাস্তি ইত্যাদির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনায় পুলিশের কনস্টেবল হতে ইন্সপেক্টর পর্যন্ত সকল পদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও শাস্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি-বিধান এবং সরকার ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাবলি অধিক যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নকরত পুলিশের আইজিপি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য

একটি সমন্বিত বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি) বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫.২। সিনিয়র ধাপ: সহকারী পুলিশ সুপার হতে অতিরিক্ত আইজি পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবনা

৫.২.১। সুপরিয়র সিলেকশন বোর্ড ও বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি গঠন এবং পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়াবলি:

অতিরিক্ত ডিআইজি (৪র্থ গ্রেডের বেতনস্কেল) হতে অতিরিক্ত আইজি (২য় গ্রেডের বেতনস্কেল) পদে পদোন্নতির প্রদানের জন্য প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি)-এর অধীন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অন্যূন সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত সুপরিয়র সিলেকশন বোর্ড **এবং সহকারী পুলিশ সুপার (৯ম গ্রেডের বেতনস্কেল) হতে পুলিশ সুপার (৫ম গ্রেডের বেতনস্কেল) পদে পদোন্নতির জন্য কমিশনের তত্ত্বাবধানে** বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে অন্যূন পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি **থাকবে। উক্ত বোর্ড বা কমিটি সিনিয়ার ধাপে কর্মরত পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তাদের সততা, মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার পাশাপাশি বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা, নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা, সেবাধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইপূর্বক তাদের নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন। অতঃপর উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।**

এ লক্ষ্যে বর্তমানে বিসিএস পুলিশ সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Civil Service (Enforement: Police) Composition and Cadre Rules, 1980, Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাবলি অধিক যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নকরত পুলিশের আইজিপি হতে কনস্টেবল পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য একটি সমন্বিত বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি) বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫.২.২। ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র/সশস্ত্র/ট্র্যাফিক) হতে সহকারী পুলিশ সুপার (জাতীয় বেতনস্কেলের ৯ম গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক সহকারী পুলিশ সুপারের শূন্যপদের শতকরা তেত্রিশভাগ (৩৩%)-এর বিপরীতে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র/সশস্ত্র/ট্র্যাফিক)-এর মঞ্জুরীকৃত পদের আনুপাতিক হারে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র/সশস্ত্র/ট্র্যাফিক) পদে চাকরি স্থায়ী এবং উক্ত পদে কমপক্ষে **৫ (পাঁচ) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে ৫ (পাঁচ) বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বিগত ৫ বছরের চাকরির রেকর্ড ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৯ম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

অতঃপর একবছর মেয়াদি শিক্ষানবিসকাল সফলভাবে সম্পন্নের পর সহকারী পুলিশ সুপার পদে চাকরি স্থায়ী হবার তারিখ হতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৮ম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে।

৫.২.৩। সহকারী পুলিশ সুপার হতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জাতীয় বেতনস্কেলের ৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সহকারী পুলিশ সুপার পদে চাকরি স্থায়ী এবং উক্ত পদে কমপক্ষে **পাঁচ বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে পাঁচ বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে ৫ (পাঁচ) বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বিগত ৫ পাঁচ) বছরের চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক এবং বার্ষিক

গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ এবং সিলেকশন গ্রেড পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫-এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে।

৫.২.৪। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হতে পুলিশ সুপার (জাতীয় বেতনস্কেলের ৫ম গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অধীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক পুলিশ সুপারের শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ক্যাডার পদে **মোট চাকরিকাল ১০ (দশ) বছরসহ** অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে স্থায়ী এবং উক্ত পদে কমপক্ষে **৫ (পাঁচ) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে ৫ (পাঁচ) বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বিগত ৫ পাঁচ) বছরের চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৫ম গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে।

৫.২.৫। পুলিশ সুপার হতে অতিরিক্ত ডিআইজি (জাতীয় বেতনস্কেলের ৪র্থ গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর অধীন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে গঠিত সুপরিয়র সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক অতিরিক্ত ডিআইজি-এর শূন্যপদের

বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ক্যাডার পদে **মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বছরসহ** পুলিশ সুপার পদে স্থায়ী এবং উক্ত পদে কমপক্ষে **২ (দুই) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে দুই বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বিগত ৫ পাঁচ) বছরের চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৪র্থ গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে।

৫.২.৬। অতিরিক্ত ডিআইজি হতে ডিআইজি (জাতীয় বেতনস্কেলের ৩য় গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর অধীন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে গঠিত সুপরিয়র সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক ডিআইজি-এর শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ক্যাডার পদে **মোট চাকরিকাল ১৪ (চৌদ্দ) বছরসহ** অতিরিক্ত ডিআইজি পদে স্থায়ী এবং উক্ত পদে কমপক্ষে **২ (দুই) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে ২ (দুই) বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বিগত ৫ পাঁচ) বছরের চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক এবং বার্ষিক

গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৩য় গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে।

৫.২.৭। ডিআইজি হতে অতিরিক্ত আইজি (জাতীয় বেতনস্কেলের ২য় গ্রেড) পদে পদোন্নতিতে সংস্কার:

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর অধীন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে গঠিত সুপরিয়র সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক অতিরিক্ত আইজি-এর শূন্যপদের বিপরীতে শতভাগ (১০০%) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ক্যাডার পদে **মোট চাকরিকাল ১৭ (সতেরো) বছরসহ** ডিআইজি পদে স্থায়ী এবং উক্ত পদে কমপক্ষে **৩ (তিন) বছর চাকরিকাল** সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে কারো চাকরিকাল এক বছরের কম অবশিষ্ট থাকলে ফিডার পদে ৩ (তিন) বছর চাকরি করার শর্ত শিথিলযোগ্য করা যেতে পারে। এছাড়া বিগত ৫ পাঁচ) বছরের চাকরির রেকর্ড সন্তোষজনক এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে একটি বাধ্যতামূলক তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর তার সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইসাপেক্ষে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। তখন তিনি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ২য় গ্রেডে বেতন-ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত/অভিযোগের কারণে ব্যাচের সাথে পদোন্নতি না পেলে পরবর্তীতে তার ফিডার পদে চাকরিকাল পূর্ণ হওয়াসাপেক্ষে পদোন্নতির জন্য ব্যাচের সাথে জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবে।

৫.৩। ট্রেড পুলিশম্যান পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবনা:

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ট্রেড পুলিশম্যান নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও পদায়নের জন্য কাজের প্রকৃতি ও ধরন (যেমন-চালক, দেহরক্ষী, অফিস আরদালি, মেকানিক, ইলিক্ট্রিশিয়ান, নাপিত, মুচি, সারেং, সুকানি, হরিজন, বাবুর্চি, দর্জি, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি) বিবেচনায় একটি স্বতন্ত্র নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সম্বনিত একক নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-খ)**। উক্ত বিধিমালায় কর্মপেশার শ্রেণিভিত্তিক নিয়োগ ও উচ্চতর ধাপে পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে। প্রণীতব্য বিধিমালায় কাজের ধরন ও পেশা বিবেচনায় নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির শর্তাবলি সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। যেমন- সহায়ক ড্রাইভার থেকে ড্রাইভার, অতঃপর সিনিয়র ড্রাইভার এবং সর্বশেষ ফোরম্যান পদে পদোন্নতি ও জাতীয় বেতনস্কেলে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

৫.৪। নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবনা:

বর্তমানে পুলিশ বাহিনীতে নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে যেমন-প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, আইটি শাখা, নৌ শাখা, মেডিক্যাল শাখা, প্রকৌশল শাখা, বিশেষজ্ঞ শাখা ও ট্রেড শাখা ইত্যাদি শাখায় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ২০তম গ্রেড হতে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভিন্ন ভিন্ন পদে চাকরি করে থাকে। পুলিশ রেগুলেশনস্,

১৯৪৩ এর প্রবিধান ৮০৭ এবং পুলিশ বিভাগ (নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে বাংলাদেশ পুলিশে বর্ণিত শাখার বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান সকল ইউনিটে কর্মরত নন-পুলিশ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত একক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপঃ পরিশিষ্ট-খ)**। উক্ত বিধিমালায় কর্মপেশার শ্রেণিভিত্তিক নিয়োগ ও উচ্চতর ধাপে পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে। প্রণীতব্য বিধিমালায় কাজের ধরন ও পেশা বিবেচনায় নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির শর্তাবলি সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে।

৫.৫। পুলিশের পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা:

উপরোক্ত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে:

১) বর্তমান বাস্তবতার আলোকে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম পুলিশ বাহিনী গঠন;
২) আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষমতা সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী;
৩) দ্রুততম সময়ে সেবাগ্রহীতাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিতকরণ; এবং
৪) যুগোপযোগী পদোন্নতি নীতিমালা বাস্তবায়ন হবে।

৬.০। পুলিশের পদায়ন সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা

সরকারি চাকরি আইন-২০১৮ এর ৮(১) ধারায় কোনো স্থায়ী সরকারি কর্মচারিকে পদোন্নতি প্রদানের সময় তার সততা, মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে প্রশিক্ষণে অর্জিত ফলাফল পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রণোদনার ক্ষেত্রে তেমন বিবেচনায় নেয়া হয় না। তাই বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের গুরুত্ব বিবেচনায় একটি অভিন্ন পদায়ন নীতিমালা থাকা খুবই আবশ্যক। তবেই বাংলাদেশ পুলিশের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যাবে। এ প্রেক্ষিতে

বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান বিভিন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নরূপ নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৬.১। পদায়ন নীতিমালার জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ

(১) বর্তমান জনবলের সংখ্যা ও পদায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা;

(২) আগামীর সম্ভাবনা বিবেচনায় সম্ভাব্য জনবলের Projection সংক্রান্ত গবেষণা ও বিশ্লেষণপত্র প্রস্তুত করা;

(৩) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে Recruitment প্রক্রিয়া পরিবর্তন/সংশোধন; এবং

(৪) বিভিন্ন পদে (অপারেশনাল, স্পেশালাইজড, প্রশাসনিক, প্রশিক্ষণ, কমান্ড) পদায়ন গাইডলাইন প্রস্তুত করা।

৬.২। কনস্টেবল ও নায়েক পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিকভাবে যারা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বিরাজ করেন, তাদের বিশেষ নিরাপত্তা প্রদানের কাজটি বাংলাদেশ পুলিশকেই করতে হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা। অন্যদিকে বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ অতিথি, বিদেশী দূতাবাস ও কুটনৈতিক পাড়ায় নিরাপত্তার দায়িত্বও বাংলাদেশ পুলিশের কাঁধেই বর্তায়। সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করার মহান কাজটি পুলিশ বাহিনীই করে থাকেন। পুলিশ ২৪ ঘণ্টা জনগণের জীবন ও মালামাল হেফাজত রক্ষার্থে সর্বদা বদ্ধপরিকর। উক্ত দায়িত্ব পরিপালনে পুলিশের অধস্তন সদস্যরা সর্বত সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন।

সার্বিক বিবেচনায় পুলিশে কর্মরত কনস্টেবল ও নায়েকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা থাকা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপঃ পরিশিষ্ট-ক)**। পুলিশের সশস্ত্র বিভাগে কর্মরত কনস্টেবল ও নায়েক-এর প্রত্যেক সদস্যকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে গ্রুপভিত্তিক বিভাজনকরত পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে বদলি করতে হবে। যেমনঃ পুলিশের বিভাজনকৃত গ্রুপ-১ এ কর্মরত পুলিশ সদস্যকে নির্দিষ্ট সময়ের চাকরি করার পর গ্রুপ-২; অতঃপর গ্রুপ-২ এর নির্দিষ্ট কর্মকালের চাকরি শেষ হলে গ্রুপ-৩ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

এক্ষেত্রে কনস্টেবলদের মৌলিক প্রশিক্ষণের পর হতে চাকরির প্রথম তিন বছর গ্রুপ-১ এ পদায়ন সুনির্দিষ্ট থাকবে। তবে এপিবিএনের বিধিমালা অনুযায়ী টিআরসিদের ৬

বছরের জন্য এপিবিএন্সে (এসপিবিএনসহ) পদায়ন করা হবে। নায়েকের ক্ষেত্রে একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। কনস্টেবলের চাকরিকালের ৩ বছরের মধ্যে অর্ডার্লি, বডিগার্ড, দাপ্তরিক দায়িত্ব বা কোনো ইউনিটে প্রেষণ বা সংযুক্ত অথবা গ্রুপ-১ এর বাইরে অন্য কোনো ইউনিটে বদলি করা যাবে না। অতঃপর কোনো সংস্থা বা ইউনিটে প্রেষণ বা সংযুক্তির প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র রেঞ্জ/মহানগর পুলিশ হতে প্রেষণ বা সংযুক্ত করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রুপ-২/৩ এর কোনো ইউনিট হতে প্রেষণ বা সংযুক্ত করা যাবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত পুলিশ সদস্যকে অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে।

৬.৩। এএসআই (সশস্ত্র), এসআই (সশস্ত্র) ও ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানুষের জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব, সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে কাজ হবে। সব সময় দেশের মানুষের পাশে থাকা বা সেবা করাটাই যে পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য তা মনে রাখতে হবে। এ দায়িত্ববোধ থেকেই পুলিশের সশস্ত্র বিভাগের প্রতিটি সদস্য কাজ করে থাকে। মূলত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ লাইনস্ এবং অস্ত্র সংরক্ষণসহ ব্যবহার নীতি যথাযথভাবে পরিপালন করে থাকে পুলিশের সশস্ত্র বিভাগ। বাংলাদেশ পুলিশের সকল ক্যাটাগরির সদস্যকে মৌলিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ সশস্ত্র বিভাগই প্রদান করেন থাকেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পুলিশের সশস্ত্র বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা থাকা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপঃ পরিশিষ্ট-ক)**। এক্ষেত্রে সশস্ত্র বিভাগে কর্মরত এএসআই (সশস্ত্র) হতে ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র)-এর প্রত্যেক সদস্যকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে গ্রুপভিত্তিক বিভাজনকরত পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে বদলি করতে হবে। যেমনঃ সশস্ত্র বিভাগের গ্রুপ-১ এ কর্মরত পুলিশ সদস্যকে নির্দিষ্ট সময়কাল

পর গ্রুপ-২ এবং গ্রুপ-২ এর নির্দিষ্ট কর্মকাল শেষ হলে গ্রুপ-৩ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত পুলিশ সদস্যকে অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে।

৬.৪। সহকারী সার্জেন্ট, সার্জেন্ট ও ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ হলো একমাত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগে কর্মরত কনস্টেবল, সার্জেন্ট, ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক) ও উর্ধ্বতন পুলিশ সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে মুখ্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল রেখে আধুনিক নাগরিক জীবনে চলাচলে গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে ট্র্যাফিক পুলিশকে আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা থাকা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-ক)**। এক্ষেত্রে ট্র্যাফিক বিভাগে কর্মরত কনস্টেবল হতে ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক)-এর প্রত্যেক সদস্যকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে গ্রুপভিত্তিক বিভাজনকরত পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে বদলি করতে হবে। যেমন: ট্র্যাফিক বিভাগের গ্রুপ-১ এ কর্মরত পুলিশ সদস্যকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর গ্রুপ-২ এবং গ্রুপ-২ এর নির্দিষ্ট কর্মকাল শেষ হলে গ্রুপ-৩ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত পুলিশ সদস্যকে অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে।

৬.৫। এএসআই (নিরস্ত্র), এসআই (নিরস্ত্র) ও ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

পুলিশ সদস্যদের অভিলক্ষ্যই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, জনগণের কল্যাণ সাধন ও সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, অপরাধ প্রতিরোধ করা, অপরাধীদের গ্রেফতার করা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় তাদের সঠিকভাবে উপস্থাপন করা পুলিশের অন্যতম কাজ। এছাড়া দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সার্বিক বিবেচনায় পুলিশে কর্মরত এএসআই (নিরস্ত্র), এসআই (নিরস্ত্র) ও ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামগ্রিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা থাকা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-ক)**। পুলিশের নিরস্ত্র বিভাগে কর্মরত এএসআই (নিরস্ত্র), এসআই (নিরস্ত্র) ও ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)-এর প্রত্যেক সদস্যকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে গ্রুপভিত্তিক বিভাজনকরত পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে বদলি করতে হবে। যেমন: পুলিশের বিভাজনকৃত গ্রুপ-১ এ কর্মরত পুলিশ সদস্যকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর গ্রুপ-২, উক্ত গ্রুপ-২ এ নির্দিষ্ট কর্মকাল শেষ হলে গ্রুপ-৩ এবং অতঃপর গ্রুপ-৩ এ নির্দিষ্টকাল দায়িত্ব পালন করার পর গ্রুভ-৪-এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

অতঃপর পদায়নকৃত ইউনিটে চাকরি করার পর গ্রুপ-১/২ এ কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-৩/৪ এবং গ্রুপ-৩/৪ এ কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-১/২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে। এক্ষত্রে গ্রুপ-১/২ এর আওতাধীন জেলা/মহানগর পুলিশে কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র)দের পদায়নের পর প্রথমে তদন্তকেন্দ্র/ফাঁড়ি তারপর থানা/ডিবি অতঃপর কোর্ট/অফিস/ডিএসবি/ সিটিএসবিতে পদায়ন করতে হবে। তবে একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত পুলিশ সদস্যকে অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে।

৬.৬। অফিসার ইনচার্জ পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

পুলিশ বাহিনী দেশের আইনের শাসন বজায় রাখার অন্যতম হাতিয়ার। তারা সমাজের সকল স্তরে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে, যাতে জনগণ তাদের অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারে। যদি পুলিশ বাহিনী না থাকে, তাহলে সমাজের স্থিতিশীলতা ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং অপরাধের হার বাড়তে পারে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ দায়িত্বের প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে থানা পুলিশ। থানা পুলিশের সেবার মান যতো সেবামুখী ও উন্নত হবে বাহিনী হিসেবে ততই সমাদৃত হবে। আজ থানা পুলিশের দায়িত্ব ও কতর্ব্য-কর্ম বিবেচনায় কর্মবণ্টনকে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে- যেমন: তদন্ত ও অপরাধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা, ট্র্যাফিক ব্যবস্থা এবং প্রটেকশন ও প্রটোকল ব্যবস্থা। সার্বিক কাজ সমন্বয় করার জন্য প্রতি থানায় অফিসার ইনচার্জ পদায়ন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পুলিশে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে থানার অফিসার ইনচার্জ পদে কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশের সুবিধার্থে ফিটলিস্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত আইজিপি (প্রশাসন), বাংলাদেশ পুলিশের সভাপতিত্বে সিলেকশন বোর্ড গঠনসহ সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা থাকা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-ক)**। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা, নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা, সেবাধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহ, নির্দিষ্ট বয়স (সর্বোচ্চ ৫৪ বছর), পুরস্কার, শাস্তি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইপূর্বক তাদের নাম সুপারিশ করার জন্য পয়েন্টভিত্তিক গ্রেডিং করতে হবে। উক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে Police Station Management Course (PSMC) and Police Financial Management Course (PFMC)/লিডারশিপ কোর্সসহ গোয়েন্দা তথ্য, অপরাধ দমন ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। এছাড়া কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশের ক্ষেত্রে নিজ কর্মক্ষেত্রে থানায় ইন্সপেক্টর (তদন্ত/অপারেশনস্) কিংবা অপরাধ/গোয়েন্দা বিভাগে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং অপরাধ তদন্ত কাজে পূববর্তী সন্তোষজনক কার্যক্রমসহ সার্বিক কর্মদক্ষতা বিবেচনান্তে পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

উক্ত নীতিমালায় বিবেচনা করতে হবে-অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ফিটলিস্টভুক্তির জন্য ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে নূন্যতম ৩ বছর চাকরি সম্পন্ন করতে হবে। ফিটলিস্টভুক্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে সর্বোচ্চ ৪টি থানা বা ৮ বছর দায়িত্ব পালন করলে (যেটি আগে ঘটে) পরবর্তীতে তাকে

পুনরায় থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা যাবে না। এছাড়া কোনো কর্মকর্তা একবার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে তাকে একই থানায় দ্বিতীয়বার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়ন করা যাবে না।

একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)-কে থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত পদায়নের জন্য আরোপিত শর্তাবলি পূরণ হওয়াসাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পয়েন্টের ভিত্তিতে অফিসারে গ্রেডিং করা যেতে পারে। ফলে একজন অফিসার ইনচার্জ পদায়নে ইচ্ছুক পুলিশ ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)-এর যোগ্যতা যাচাইয়ে Subjectively যাচাই না করে Objectively যাচাই করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক	**বিষয়**	**বিবেচ্য বিষয়**	**প্রদত্ত নম্বর**
১.	চাকরিকাল	ইন্সপেক্টর হিসেবে অন্যূন ৪ বছর (প্রতি বছর-১.০ নম্বর)	৪
২.	বিগত ৫ বছরের এসিআর	অন্যূন ৮০% গড় নম্বর প্রাপ্তিসাপেক্ষে (বিরূপ মন্তব্য থাকলে অনুপযুক্ত) এসিআর-এর মোট নম্বর ২৫ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	২৫
৩.	চাকরি জীবনের কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন	**মূল্যায়নের জন্য নম্বরবণ্টন** অত্যুত্তম-৪.০, উত্তম-৩.০ চলতিমান-২.০, চলতিমানের নিম্নে-১.০	৪
৪.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪.১ এসএসসি/সমমান (প্রতি বিভাগের জন্য ১ নম্বর)	৩
		৪.২ এইচএসসি/সমমান (প্রতি বিভাগের জন্য ১ নম্বর)	৩
		৪.৩ স্নাতক/সমমান (প্রতি বিভাগ/শ্রেণির জন্য ২ নম্বর)	৬
		৪.৪ স্নাতকোত্তর/সমমান (প্রতি বিভাগ/শ্রেণির জন্য ২ নম্বর)	৬
৫.	**দক্ষতা** *(প্রতিটি যোগ্যতা ২ নম্বর হিসেবে বণ্টন হবে)* ✓ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে দক্ষতা	**প্রতিটি যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্বরবণ্টন হবে-** অত্যুত্তম-২.০, উত্তম-১.৫০ চলতিমান-১.০, চলতিমানের নিম্নে-০.৫০	১২

ক্রমিক	বিষয়	বিবেচ্য বিষয়	প্রদত্ত নম্বর
	✓ প্রশাসনিক ও পেশাদারিত্ব কাজে সক্ষমতা ✓ প্রজ্ঞা ও ভাষা জ্ঞান ✓ পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্ব ✓ বিনয়ী, গণমুখী ও সেবাধর্মী আচরণ ✓ নৈতিকতা ও সততা		
৬.	**তথ্য ও প্রযুক্তিগত সম্যক জ্ঞান** *(প্রতিটি যোগ্যতা ১ নম্বর হিসেবে বণ্টন হবে)* ✓ কম্পিউটার (ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট) ✓ ইন্টারনেট ✓ সিডিআর ও সিডিএমএস বিশ্লেষণ ✓ ফরেনসিকসহ অন্যান্য রিপোর্ট বিশ্লেষণ	**প্রতিটি যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্বরবণ্টন হবে-** অত্যুত্তম-১.০, উত্তম-০.৭৫ চলতিমান-০.৫, চলতিমানের নিম্নে-০.২৫	৪
৭.	ক্যাডেট/ডিসি এসআই (নিরস্ত্র)দের মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরের হার	প্রশিক্ষণের মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
৮.	বেসিক ইন্টেলিজেন্স কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের হার	প্রশিক্ষণের মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
৯.	উচ্চতর তদন্ত কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের হার	প্রশিক্ষণের মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
১০.	ইন্সপেক্টরশিপ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হার	পরীক্ষার মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
১১.	**পুরস্কার (চাকরিকালীন)** *(মোট প্রাপ্ত নম্বর হতে ১টি গুরুদণ্ডের জন্য ২ নম্বর এবং ৫টি লঘুদণ্ডের জন্য ০.৫ নম্বর কর্তন হবে)*	১১.১ বিপিএম (অন্যূন ১টি)	২
		১১.২ পিপিএম (অন্যূন ১টি)	১
		১১.৩ আইজিপি ব্যাচ (অন্যূন ৪টি)	০.৫
		১১.৪ অন্যান্য পুরস্কার (অন্যূন ১০টি)	০.৫
১২.	**বয়স**	প্রার্থী ৪০ বছরের কম হলে	২

ক্রমিক	বিষয়	বিবেচ্য বিষয়	প্রদত্ত নম্বর
১৩.	**সাক্ষাৎকার**	সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রদেয়	১৫
সর্বমোট			**১০০**

৬.৭। এএসপি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৬.৭.১। সহকারী পুলিশ সুপার/সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রশাসনিক ইউনিটে পদায়ন):

১) বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে সরাসরি যোগদানকৃত সহকারী পুলিশ সুপারদের মৌলিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপনান্তে এবং সদ্যপদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপারগণকে পুলিশের বিভিন্ন প্রশাসনিক (যেমন-এপিবিএন/এসপিবিএন/র‌্যাব/ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/নৌ পুলিশ/রেলওয়ে পুলিশ/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/এসবি/সিআইডি/রেঞ্জ কার্যালয়/ আরআরএফ/বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিট ইত্যাদি) ইউনিটে দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা হবে; এবং

২) পুলিশের প্রশাসনিক ইউনিটে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার কর্মকাল হবে অন্যূন দেড় বছর। উক্ত সময়কালে কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা হবে না। তবে শুধু অনিবার্য প্রশাসনিক কারণে কোনো কর্মকর্তাকে একই বিভাগ/ইউনিটের আওতাধীন অন্য কোনো জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে।

৬.৭.২। সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন):

১) সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে চাকরিকাল ৩ (তিন) বছর সম্পন্নের পর জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে সহকারী পুলিশ সুপারদের জেলা বা হাইওয়ে পুলিশে সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/মেট্রোপলিটন পুলিশে সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন) হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকায় (ফিটলিস্ট) অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে;

২) তালিকাভুক্ত একজন কর্মকর্তাকে ক্রমানুসারে জেলা বা হাইওয়ে পুলিশে সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/মেট্রোপলিটন পুলিশে সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন) হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের জন্য পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে পদায়ন করা হবে; এবং

৩) এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা তাঁর চাকরিকালে এক/দুইটি সার্কেল বা জোনে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের জন্য পদায়ন করা যেতে পারে।

৬.৭.৩। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল)/অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (জোন):

১) সদ্যপদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে অন্যূন ২ (দুই) বছরের জন্য জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল)/মেট্রোপলিটন পুলিশে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (জোন) হিসেবে পদায়ন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে যারা সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে সার্কেল বা জোনে দায়িত্ব পালন করেননি তাদেরকে আলোচ্য পদায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

২) এছাড়া সদ্যপদোন্নতিপ্রাপ্তদেরকে পুলিশের কোনো প্রশাসনিক ইউনিটে (যেমন- এপিবিএন/এসপিবিএন/ র‍্যাব/ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/নৌ পুলিশ/রেলওয়ে পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/ এসবি/সিআইডি/মেট্রোপলিটন পুলিশ সদরদফতর/রেঞ্জ কার্যালয়/আরআরএফ/বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিট ইত্যাদি) দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা যাবে; এবং

৩) এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা তাঁর চাকরিকালে এক/দুইটি সার্কেল বা জোনে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য পদায়ন করা যেতে পারে।

৬.৭.৪। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন/অপরাধ/ডিএসবি)/অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন/অপরাধ/ সিটিএসবি):

১) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে চাকরিকাল ১ (এক) বছর সম্পন্নের পর জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে জেলা বা পিবিআই-এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন/অপরাধ/ডিএসবি)/মেট্রোপলিটন পুলিশে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন/অপরাধ/ সিটিএসবি) হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকায় (ফিটলিস্ট) অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে;

২) তালিকাভুক্ত একজন কর্মকর্তাকে তাঁর চাকরিকাল ২ (দুই) বছর সম্পন্নের পর ক্রমানুসারে জেলা বা পিবিআই-এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন/অপরাধ/ডিএসবি)/ মেট্রোপলিটন পুলিশে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন/অপরাধ/ সিটিএসবি) হিসেবে অন্যূন ২ (দুই) বছরের জন্য পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে পদায়ন করা হবে; এবং

৩) এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা তাঁর চাকরিকালে এক/দুইটি জেলা বা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য পদায়ন করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি যে কোনো ইউনিটে পদায়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬.৮। জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত বিসিএস পুলিশ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জেলার পুলিশ সুপার পদে কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশের সুবিধার্থে ফিটলিস্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে সিলেকশন বোর্ড গঠনসহ সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপঃ পরিশিষ্ট-ক)**। এক্ষেত্রে জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়নের লক্ষ্যে ব্যাচভিত্তিক ফিটলিস্ট প্রণয়নের করা হবে। উক্ত ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট সদস্যদের সমন্বয়ে ‘প্রেজেন্টেশন মূল্যায়ন কমিটি’, ‘গ্রুপ ডিসকাশন মূল্যায়ন কমিটি’ এবং ‘সার্ভিস রেকর্ড কমিটি’ গঠন করতে হবে। অতঃপর সিলেকশন বোর্ড ফিটলিস্ট প্রণয়নকরত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করবেন।

এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা, নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা, সেবাধর্মী কার্যক্রমে

উৎসাহ, নির্দিষ্ট বয়স, পুরস্কার, শাস্তি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইপূর্বক তাদের নাম সুপারিশ করার জন্য পয়েন্টভিত্তিক গ্রেডিং করতে হবে।

উক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে District Police Management Certificate Course (DPMC) and Police Financial Management Certificate Course (PFMCC)/লিডারশিপ কোর্সসহ গোয়েন্দা তথ্য, অপরাধ দমন ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। ব্যাচভিত্তিক ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য আগ্রহী পুলিশ সুপারদের নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে উপযুক্ততা যাচাইকরত সিলেকশন বোর্ডের সম্মুখে ‘সাক্ষাৎকার’ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ক্রম	ক্যাটাগরি	নম্বর
১	বিগত ৫ বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন রেকর্ড	৪০
২	ডিস্ট্রিক পুলিশ ম্যানেজমেন্ট কোর্স (ডিপিএমসি)	১০
৩	ঐচ্ছিক প্রশিক্ষণের প্রতিটি ০.২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ ১০)	১০

ক্রম	ক্যাটাগরি	নম্বর
৪	সিলেকশন বোর্ড (সাক্ষাৎকার-২০, প্রেজেন্টেশন [ইংরেজি ও বাংলা]-১০ ও গ্রুপ ডিসকাশন-১০)	৪০
সর্বমোট		**১০০**

এছাড়া কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশের ক্ষেত্রে নিজ কর্মক্ষেত্রে জেলা পুলিশের সার্কেলের এএসপি/অতিরিক্ত এসপি কিংবা অপরাধ বিভাগের জোনাল এসি/এডিসি এবং বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়নের জন্য পূববর্তী সন্তোষজনক কার্যক্রমসহ সার্বিক কর্মদক্ষতা বিবেচনান্তে পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর ব্যাচভিত্তিক ফিটলিস্ট-এর ভিত্তিতে এক/দুই জেলায় সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য পদায়ন করা যাবে।

৬.৯। রেঞ্জ ডিআইজি/মহানগর পুলিশের কমিশনার পদে পদায়নের ক্ষেত্রে পয়েন্টভিত্তিক গ্রেডিংসহ অন্যান্য শর্তাবলি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা:

বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের মধ্যে অন্যতম রেঞ্জ ও মহানগর পুলিশ। পুলিশের ইউনিটসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রেঞ্জ ডিআইজি/মহানগর পুলিশের কমিশনার পদে কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশের সুবিধার্থে একটি ফিটলিস্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস কমিশন-এর অধীন সিলেকশন বোর্ড গঠনসহ সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য একটি পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন **(নমুনাস্বরূপ: পরিশিষ্ট-ক)**।

একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে রেঞ্জ/মহানগর পুলিশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটসমূহে পদায়ন করলে পুলিশ বাহিনী অধিক জনবান্ধব ও কল্যাণমুখী হিসেবে জনগণের নিকট আস্থাভাজন হবে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা, নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা, সেবাধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহ, নির্দিষ্ট বয়স, পুরস্কার, শাস্তি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইপূর্বক তাদের নাম সুপারিশ করার জন্য পয়েন্টভিত্তিক গ্রেডিং করতে হবে।

উক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে General Administration and Financial Management Certificate Course (GAFMC)/Police Financial Management Certificate Course (PFMCC)/লিডারশিপ কোর্সসহ গোয়েন্দা তথ্য, অপরাধ দমন ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক

প্রশিক্ষণ ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। এছাড়া কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশের ক্ষেত্রে নিজ কর্মক্ষেত্রে জেলার পুলিশ সপার/অপরাধ বিভাগের ডিসি এবং বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়নের জন্য পূববর্তী সন্তোষজনক কার্যক্রমসহ সার্বিক কর্মদক্ষতা বিবেচনান্তে পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর সুপারিশের ভিত্তিতে রেঞ্জ/মহানগর পুলিশে সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য পদায়ন করা যাবে।

৬.১০। নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা:

বর্তমানে পুলিশ রেগুলেশনস্, ১৯৪৩ এর প্রবিধান ৮০৭ এবং পুলিশ বিভাগ (নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসারে পুলিশ বাহিনীতে নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে যেমন-প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, আইটি শাখা, নৌ শাখা, মেডিক্যাল শাখা, প্রকৌশল শাখা, বিশেষজ্ঞ শাখা ও ট্রেড শাখা ইত্যাদি শাখায় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ২০তম গ্রেড হতে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভিন্ন ভিন্ন পদে চাকরি করে থাকে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান সকল ইউনিটে কর্মরত নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত একক পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উক্ত নীতিমালায় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-পুলিশ কর্মকর্তাদের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে আন্তঃবদলির সুযোগ রাখতে হবে। প্রণীতব্য নীতিমালায় কাজের ধরন ও পেশা বিবেচনায় পদায়নের শর্তাবলি সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া বিশেষক্ষেত্রে সরকারের অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রেষণে পদায়নের সুযোগ রাখতে হবে।

৬.১১। পুলিশের পদায়ন সংক্রান্ত সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা:

উপরোক্ত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে-

১) সময়ের দাবি অনুযায়ী আধুনিক পুলিশ বাহিনী গঠিত হবে;
২) পুলিশ সদস্যদের মধ্যে বিরাজমান হতাশা দূরীভূত হবে বিধায় তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে;
৩) পুলিশ বাহিনী ভিশন ও মিশন বাস্তবায়ন অধিকতর সহজ হবে;
৪) যুগোপযোগী পুলিশের পদায়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন হবে; এবং
৫) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশকে প্রস্তুত করা হবে।

৭.০। পুলিশের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান সময়ের অপরাধীরা অধিক কৌশলী হচ্ছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ঐ সবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদেরও আধুনিক কৌশল ও নবতর অস্ত্র ব্যবহার করতে হচ্ছে। কেননা, পুলিশ সদস্যদের অভিলক্ষ্যই হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন ও সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। নিজ নিজ দাপ্তরিক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ একটি সর্বজনীন মাধ্যম। টেকসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, দক্ষ মানব সম্পদ এবং সর্বোত্তম সেবা এক সূত্রে গাঁথা। পেশাগত দক্ষতা ও সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

৭.১। বাস্তব প্রশিক্ষণের অর্জিত ফলাফল পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবনা:

সরকারি চাকরি আইন-২০১৮ এর ৮(১) ধারায় কোনো স্থায়ী সরকারি কর্মচারিকে পদোন্নতি প্রদানের সময় তার সততা, মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রশিক্ষণের অর্জিত ফলাফল পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রণোদনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয় না। এতে করে প্রশিক্ষনার্থীরা প্রশিক্ষণের সময় অযথা সময়ক্ষেপন করে এবং নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে না। ফলে প্রশিক্ষণ খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশিক্ষণের সাথে প্রণোদনার সমন্বয়হীনতাই অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করা হয়।

ক) প্রশিক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।
খ) প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফল কে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে।

এ লক্ষ্যে বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে সর্বোচ্চ দক্ষ ও প্রশিক্ষণসম্পন্ন হিসেবে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতিমালার মাধ্যমে বিভিন্ন পদে মৌলিক, বিশেষায়িত ও ইনসার্ভিসসহ অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকাকে **পুলিশ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (পিইউবি)** নামে প্রতিষ্ঠাকরত সমন্বিতভাবে অ্যাকাডেমিক ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (মৌলিক, বিশেষায়িত ও ইনসার্ভিস) পরিচালনা করা যেতে পারে। ফলে পুলিশকে নৈতিক মূল্যবোধ ও দক্ষ জনবল হিসেবে সৃজন করা সম্ভবপর হবে।

৭.২। বিদ্যমান মৌলিক প্রশিক্ষণ:

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে তিনস্তরে চার ক্যাটাগরিতে যথা-সহকারী পুলিশ সুপার, ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর, পুলিশ সার্জেন্ট ও ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে জনবল নিয়োগ হয়ে থাকে। অতঃপর সহকারী পুলিশ সুপার, ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর ও

পুলিশ সার্জেন্ট পদে একবছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় এবং ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে ছয়মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ পুলিশ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত হয়ে থাকে। চার ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগকরত মৌলিক প্রশিক্ষণ করানো একদিকে সরকারের অর্থের অপচয় অন্যদিকে গুণগত মান বজায়

রাখাও কষ্টসাধ্য বিষয়। অথচ টেকসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, দক্ষ মানব সম্পদ এবং সর্বোত্তম সেবা এক সূত্রে গাঁথা।

৭.৩। ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে দুইস্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পদ্ধতিতে মৌলিক প্রশিক্ষণের সংস্কার প্রস্তাবনা:

বাংলাদেশ পুলিশে ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে দুইস্তরে জনবল নিয়োগ করা হলে তাদের টেকসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একদিকে সরকারের অর্থ অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে অন্যদিকে প্রশিক্ষণের গুণগত মান বজায় রাখা সহজতর হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে যুগোপযোগী ও আধুনিক কারিকুলাম সমৃদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উন্নত প্রশিক্ষণের নিশ্চিত করতে হবে। ফলে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশের পেশাগত দক্ষতা ও সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন হবে।

৭.৩.১। এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ: শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি)

প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা

সময়কাল: ১ বছর মেয়াদি

প্রশিক্ষণের ধরণ: ইনসার্ভিস

৭.৩.২। এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ: ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি)

প্রতিষ্ঠান: পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি)/মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান

সময়কাল: ১ বছর মেয়াদি

প্রশিক্ষণের ধরণ: ট্রেইনি

৭.৪। ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের সংস্কার প্রস্তাবনা:

নিজ নিজ দাপ্তরিক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ একটি সর্বজনীন মাধ্যম। টেকসই ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, দক্ষ মানব সম্পদ এবং সর্বোত্তম সেবা এক সূত্রে গাঁথা। পেশাগত দক্ষতা ও সেবার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৪১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৮টি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, খুলনা, রংপুর, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা, স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, উত্তরা, ঢাকা, ট্র্যাফিক ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি, এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি এবং ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ৮টি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে রয়েছে মৌলিক প্রশিক্ষণ, বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, পদোন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, বাধ্যতামূলক ইন-সার্ভিস ট্রেনিং, নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ (কনস্টেবল হতে অ্যাডিশনাল আইজিপি), বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ।

এক্ষেত্রে ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধার্থে কর্মকর্তাদেরকে নিম্নরূপ দুই শ্রেণিতে বিভাজন করা যেতে পারে-

১) সহকারী পুলিশ সুপার হতে তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তা; এবং
২) নায়েক হতে ইন্সপেক্টর

৭.৫। বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবনা:

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রযুক্তির প্রভূত প্রসারের ফলে অপরাধের প্রকৃতি ও ধরণেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাদক, চোরাচালান, সন্ত্রাস, শ্রমিক অসন্তোষ, সাইবার অপরাধ, ট্রান্স-ন্যাশনাল ক্রাইম ও মানিলন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে এবং বহুমুখী দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে দক্ষ ও পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে:

৭.৫.১। বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ:

এসবি/সিআইডি/এপিবিএন/পিবিআই/ট্যুরিস্ট পুলিশ/নৌ-পুলিশ/রেলওয়ে পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ/শিল্প পুলিশ/এন্টি টেররিজম/এমআরটি পুলিশ/ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম/অর্গানাইজড ক্রাইম/সাইবার অপরাধ/ মানিলন্ডারিং/অগ্রবাদ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণসমূহ।

৭.৫.২। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান:

বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন-ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল (ডিটিএস), সিআইডি, ঢাকা, স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স (এসওআই), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, উত্তরা, ঢাকা, ট্র্যাফিক ড্রাইভিং স্কুল (টিডিএস), ঢাকা, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি, এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার (এএসটিসি), খাগড়াছড়ি অথবা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান (এক্ষেত্রে ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার হতে নির্ধারিত কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সকল লজিস্টিকস্ সরবরাহ করতে হবে)।

পরিশিষ্ট-ক

১। কনস্টেবল পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

১.১। টিআরসিদের চাকরির শুরু হতে ৩ বছর পর্যন্ত গ্রুপ-১ এ পদায়ন নির্দিষ্ট থাকবে। তবে এপিবিএনের বিধিমালা অনুযায়ী টিআরসিদের ৬ বছরের জন্য এপিবিএন্সে (এসপিবিএনসহ) পদায়ন করা হবে।

১.২। কনস্টেবলের চাকরিকালের ৩ বছরের মধ্যে অর্ডার্লি, বডিগার্ড, দাপ্তরিক দায়িত্ব বা কোনো ইউনিটে প্রেষণ বা সংযুক্ত অথবা গ্রুপ-১ এর বাইরে অন্য কোনো ইউনিটে বদলি করা যাবে না। অতঃপর কোনো সংস্থা বা ইউনিটে প্রেষণ বা সংযুক্তির প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র রেঞ্জ/মহানগর পুলিশ হতে প্রেষণ বা সংযুক্ত করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রুপ-২/৩ এর কোনো ইউনিট হতে প্রেষণ বা সংযুক্ত করা যাবে না।

১.৩। গ্রুপ-১ এর অধীন জেলা/মহানগর পুলিশে কর্মরত কনস্টেবলদের ওআর (অর্ডিনারি রিজার্ভ) ঘোষণার পর প্রথমে তদন্তকেন্দ্র/ফাঁড়ি তারপর থানা/ট্র্যাফিক/ ডিবি অতঃপর কোর্ট/ডিএসবি/সিটিএসবিতে পদায়ন করতে হবে। তবে চাকরির যে কোনো পর্যায়ে অফিসে দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক অফিসে চাকরি করতে পারবে না। পরবর্তীতে উল্লিখিত চক্রাকার অনুযায়ী প্রযোজ্য ইউনিটে পদায়ন করতে হবে।

১.৪। কনস্টেবলের চাকরিকাল ৩ বছর পূর্ণ হলে গ্রুপ-২ এ পদায়ন করা যাবে।

১.৫। কনস্টেবলের চাকরিকাল ৫ বছর পূর্ণ হলে গ্রুপ-৩ পদায়ন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কনস্টেবলের শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এইচএসসি/সমমান পাশ থাকতে হবে।

১.৬। চাকরির নির্দিষ্ট মেয়াদকালের উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে একই গ্রুপের এক ইউনিট হতে অন্য ইউনিটে অথবা এক গ্রুপ হতে অন্য গ্রুপের কোনো ইউনিটে বদলি করা যাবে।

১.৭। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব/টেলিকম ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

১.৮। ড্রাইভারসহ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে কোনো কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটের চাকরিকাল অথবা ক্রমিক-৩ এ উল্লিখিত চক্রাকারভিত্তিতে পদায়নের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে।

১.৯। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

১.১০। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত কনস্টবল অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ১৭টি ইউনিট		**গ্রুপ-২ মোট ১৭টি ইউনিট**		**গ্রুপ-৩ মোট ৩টি ইউনিট**	
ক্রম	**ইউনিট**	**ক্রম**	**ইউনিট**	**ক্রম**	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ	১	পিএইচকিউ	১	এসবি
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ	২	ট্যুরিস্ট	২	সিআইডি
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ	৩	হাইওয়ে	৩	টেলিকম
৪	রাজশাহী রেঞ্জ	৪	পিবিআই		
৫	খুলনা রেঞ্জ	৫	নৌ পুলিশ		
৬	রংপুর রেঞ্জ	৬	রেলওয়ে পুলিশ		
৭	বরিশাল রেঞ্জ	৭	আইপি		
৮	সিলেট রেঞ্জ	৮	এটিইউ		
৯	ডিএমপি	৯	র‍্যাব		

গ্রুপ-১ মোট ১৭টি ইউনিট		**গ্রুপ-২ মোট ১৭টি ইউনিট**		**গ্রুপ-৩ মোট ৩টি ইউনিট**	
ক্রম	**ইউনিট**	**ক্রম**	**ইউনিট**	**ক্রম**	**ইউনিট**
১০	সিএমপি	১০	বিপিএ, সারদা		
১১	কেএমপি	১১	পিটিসি, টাংগাইল		
১২	আরএমপি	১২	পিটিসি, খুলনা		
১৩	বিএমপি	১৩	পিটিসি, নোয়াখালী		
১৪	এসএমপি	১৪	পিটিসি, রংপুর		
১৫	জিএমপি	১৫	টিডিএস		
১৬	আরপিএমপি	১৬	পিএসসি		
১৭	এপিবিএন	১৭	এমআরটি		

২। নায়েক পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

২.১। নায়েককে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে শিক্ষানবিশকাল সম্পন্ন করতে হবে।

২.২। সফলভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপনান্তে গ্রুপ-১ কর্মরত নায়েককে গ্রুপ-৩, গ্রুপ-২ কর্মরত নায়েককে গ্রুপ-৩ একং গ্রুপ-৩ কর্মরত নায়েককে গ্রুপ-২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

২.৩। এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-৩ এ নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

২.৪। নায়েক পদে একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

২.৫। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২.৬। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‌্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

২.৭। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

২.৮। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত নায়েক অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ২০টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ

সংলগ্নী-৬ As received from PHQ

১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	পিএইচকিউ
১৬	এসবি
১৭	সিআইডি
১৮	পিবিআই
১৯	এটিইউ
২০	এমআরটি

৩। এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৩.১। এএসআই (সশস্ত্র)কে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে শিক্ষানবিশকাল সম্পন্ন করতে হবে।

৩.২। সফলভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপনান্তে গ্রুপ-১ কর্মরত এএসআই (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-৩, গ্রুপ-২ কর্মরত এএসআই (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-৩ একং গ্রুপ-৩ কর্মরত এএসআই ((সশস্ত্র)কে গ্রুপ-২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৩.৩। এসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-৩ এ নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

৩.৪। এএসআই (সশস্ত্র) পদে একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

৩.৫। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩.৬। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৩.৭। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

৩.৮। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত এএসআই (সশস্ত্র) অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ২০টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	পিএইচকিউ

১৬	এসবি
১৭	সিআইডি
১৮	পিবিআই
১৯	এটিইউ
২০	এমআরটি

৪। এসআই (সশস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৪.১। এসআই (সশস্ত্র)কে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে শিক্ষানবিশকাল সম্পন্ন করতে হবে।

৪.২। সফলভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপনান্তে গ্রুপ-১ কর্মরত এসআই (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-৩, গ্রুপ-২ কর্মরত এসআই (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-৩ একং গ্রুপ-৩ কর্মরত এসআই (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৪.৩। ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-৩ এ নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

৪.৪। এসআই ((সশস্ত্র) পদে একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

৪.৫। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৬। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদরদফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৪.৭। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে না।

৪.৮। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত এসআই (সশস্ত্র) অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ

গ্রুপ-৩ মোট ২০টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	পিএইচকিউ

৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

১৬	এসবি
১৭	সিআইডি
১৮	পিবিআই
১৯	এটিইউ
২০	এমআরটি

৫। ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৫.১। ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র)কে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে চাকরি করতে হবে।

৫.২। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে চাকরির পর গ্রুপ-১ কর্মরত ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-৩, গ্রুপ-২ কর্মরত ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-৩ এবং গ্রুপ-৩ কর্মরত ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র)কে গ্রুপ-২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৫.৩। ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) পদে একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

৫.৪। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.৫। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‌্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৫.৬। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে না।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ

গ্রুপ-৩ মোট ২০টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‌্যাব
১৫	পিএইচকিউ

৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

১৬	এসবি
১৭	সিআইডি
১৮	পিবিআই
১৯	এটিইউ
২০	এমআরটি

৬। সহকারী সার্জেন্ট পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৬.১। সহকারী সার্জেন্টকে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে শিক্ষানবিশকাল সম্পন্ন করতে হবে।

৬.২। সফলভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপনান্তে গ্রুপ-১ কর্মরত সহকারী সার্জেন্টকে গ্রুপ-৩, গ্রুপ-২ কর্মরত সহকারী সার্জেন্টকে গ্রুপ-৩ এবং গ্রুপ-৩ কর্মরত সহকারী সার্জেন্টকে গ্রুপ-২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৬.৩। জেলা/মহানগর/ইউনিটের অভ্যন্তরে প্রথমে ট্র্যাফিক তারপরে ফাঁড়ি অতঃপর কোর্টে চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৬.৪। সহকারী সার্জেন্ট পদে একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

৬.৫। সার্জেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-৩ এ নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

৬.৬। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৬.৭। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

৬.৮। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত এটিএসআই অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ২০টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	পিএইচকিউ
১৬	এসবি
১৭	সিআইডি
১৮	পিবিআই
১৯	এটিইউ
২০	এমআরটি

৭। সার্জেন্ট পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৭.১। সার্জেন্ট সদ্যযোগদানকৃত ইউনিটে শিক্ষানবিশকাল সম্পন্ন করতে হবে।

৭.২। সফলভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপনান্তে গ্রুপ-১ কর্মরত সার্জেন্টকে গ্রুপ-২ এবং গ্রুপ-২ কর্মরত সার্জেন্টকে গ্রুপ-১ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ-৩ এর বিপরীতে কোনো মঞ্জুরীকৃত শূন্যপদ নেই।

৭.৩। জেলা/মহানগর/ইউনিটের অভ্যন্তরে প্রথমে ট্র্যাফিক তারপর ফাঁড়ি অতঃপর পেট্রোল/অফিসে চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৭.৪। ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক) পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-১/২-এর কোনো একটিতে নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

৭.৬। সার্জেন্ট পদে একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

৭.৭। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই

জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৭.৮। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

৭.৯। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত সার্জেন্ট অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১
মোট ৮টি ইউনিট

ক্রম	ইউনিট
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-১
মোট ৮টি ইউনিট

ক্রম	ইউনিট
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ
১০	টিডিএস
১১	রেলওয়ে
১২	আইপি
১৩	ট্যুরিস্ট
১৪	এপিবিএন
১৫	এসপিবিএন
১৬	পিএইচকিউ
১৭	এসবি
১৮	পিবিআই
১৯	বিপিএ
২০	এমআরটি

গ্রুপ-৩
মোট ৯টি ইউনিট

ক্রম	ইউনিট
১	পিএসসি
২	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৩	পিটিসি, খুলনা
৪	পিটিসি, নোয়াখালী
৫	পিটিসি, রংপুর
৬	নৌ পুলিশ
৭	র‍্যাব
৮	সিআইডি
৯	এটিইউ

৮। ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৮.১। ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক)-কে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে চাকরি করতে হবে।

৮.২। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে চাকরির পর গ্রুপ-১ কর্মরত ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক)-কে গ্রুপ-৩, গ্রুপ-২ কর্মরত ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক)কে গ্রুপ-৩ এবং গ্রুপ-৩ কর্মরত ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক)কে গ্রুপ-২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৮.৩। জেলা/মহানগর/অন্য ইউনিটের অভ্যন্তরে প্রথমে ট্র্যাফিক তারপর পেট্রোল/অফিসে চক্রাকারভাবে পদায়ন করতে হবে।

৮.৪। ইন্সপেক্টর (ট্র্যাফিক)-এর একটি ইউনিটের কর্মকাল গণনায় অন্যূন ১ বছর ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে।

৮.৫। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৮.৬। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে না।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ২০টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	পিএইচকিউ
২	এসবি
৩	সিআইডি
৪	পিবিআই
৫	এটিইউ
৬	পিএসসি
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	বিপিএ
১৬	পিটিসি, টাঙ্গাইল

১৭	পিটিসি, খুলনা
১৮	পিটিসি, নোয়াখালী
১৯	পিটিসি, রংপুর
২০	এমআরটি

৯। এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

৯.১। এএসআই (নিরস্ত্র)কে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে শিক্ষানবিশকাল সম্পন্ন করতে হবে।

৯.২। সফলভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপনান্তে গ্রুপ-১/২ এ কর্মরত এএসআই (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-৩/৪ এবং গ্রুপ-৩/৪ এর এএসআই (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-১/২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

৯.৩। গ্রুপ-১/২ এর আওতাধীন জেলা/মহানগর পুলিশে কর্মরত এএসআই (নিরস্ত্র)দের পদায়নের পর প্রথমে তদন্তকেন্দ্র/ফাঁড়ি তারপর থানা/ট্র্যাফিক/ডিবি অতঃপর কোর্ট/ডিএসবি/সিটিএসবিতে পদায়ন করতে হবে। তবে চাকরির যে কোনো পর্যায়ে অফিসে দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক অফিসে চাকরি করতে পারবে না। পরবর্তীতে উল্লিখিত চক্রাকার অনুযায়ী প্রযোজ্য ইউনিটে পদায়ন করতে হবে।

৯.৪। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

৯.৫। এসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-৩ এর নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

৯.৬। কারিগরি ও দাপ্তরিক কর্মদক্ষতাসম্পন্ন এএসআই (নিরস্ত্র)দের ক্ষেত্রে কোনো কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটের চাকরিকাল অথবা ক্রমিক-৩ এ উল্লিখিত চক্রাকারভিত্তিতে পদায়নের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে।

৯.৭। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

৯.৮। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত এএসআই (নিরস্ত্র) অনূ্যন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ১৫টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	এমআরটি

গ্রুপ-৪ মোট ৫টি ইউনিট	
ক্রম	ইউনিট
১	পিএইচকিউ
২	এসবি
৩	সিআইডি
৪	পিবিআই
৫	এটিইউ

১০। এসআই (নিরস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

১০.১। সদ্যনিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতিপ্রাপ্ত এসআই (নিরস্ত্র)কে প্রথমে পদায়রকৃত স্ব স্ব ইউনিটে চাকরি করতে হবে।

১০.২। পদায়নকৃত ইউনিটে চাকরি করার পর গ্রুপ-১/২ এ কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-৩/৪ এবং গ্রুপ-৩/৪ এ কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-১/২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে

১০.৩। গ্রুপ-১/২ এর আওতাধীন জেলা/মহানগর পুলিশে কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র)দের পদায়নের পর প্রথমে তদন্তকেন্দ্র/ফাঁড়ি তারপর থানা/ডিবি অতঃপর কোর্ট/অফিস/ডিএসবি/সিটিএসবিতে পদায়ন করতে হবে।

১০.৪। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই

জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

১০.৫। ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতির জন্য গ্রুপ-৩ এর নূন্যতম ১ বছর চাকরি করতে হবে।

১০.৬। কারিগরি ও দাপ্তরিক কর্মদক্ষতাসম্পন্ন এসআই (নিরস্ত্র)দের ক্ষেত্রে কোনো কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটের চাকরিকাল অথবা ক্রমিক-৩ এ উল্লিখিত চক্রাকারভিত্তিতে পদায়নের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে।

১০.৭। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে না।

১০.৮। পার্বত্য জেলায় বদলিকৃত এসআই (নিরস্ত্র) অন্যূন ২ বছর চাকরি করার পর সমতল জেলা/ইউনিটে তাকে বদলি করা যাবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ১৫টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন
১৪	র‍্যাব
১৫	এমআরটি

গ্রুপ-৪ মোট ৫টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	পিএইচকিউ
২	এসবি
৩	সিআইডি
৪	পিবিআই
৫	এটিইউ

১১। ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

১১.১। ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)কে প্রথমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে চাকরি করতে হবে।

১১.২। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউনিটে চাকরি করার পর গ্রুপ-১/২ এ কর্মরত ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-৩/৪ এবং গ্রুপ-৩/৪ এ কর্মরত ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-১/২ এ চক্রাকারে বদলি করতে হবে।

১১.৩। গ্রুপ-১/২ এর আওতাধীন জেলা/মহানগর পুলিশে কর্মরত ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)দের প্রথমে তদন্তকেন্দ্র/ফাঁড়ি তারপর থানা/ ডিবি অতঃপর কোর্ট/অফিস/ডিএসবি/সিটিএসবিতে পদায়ন করতে হবে। তবে এর কোনো পর্যায়ে অফিসার ইনচার্জ পদে প্রদত্ত শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে ওসি হিসেবে পদায়ন করা যাবে।

১১.৪। একটি কর্মস্থল/ইউনিটে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে একই জেলা/ ইউনিটের অভ্যন্তরের কোনো কর্মস্থলে (দাপ্তরিক কাজে পদায়ন ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না। এছাড়া একই জেলা/ইউনিটে (পুলিশ সদর দফতর/র‍্যাব ব্যতীত) ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৬ বছরের অধিক চাকরি করতে পারবে না।

১১.৫। অফিসার ইনচার্জ পদায়নের ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)-এর গ্রুপ-৩ এ নূন্যতম ৬ মাস চাকরি করতে হবে।

১১.৬। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে না।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি
২	সিএমপি
৩	কেএমপি
৪	আরএমপি
৫	বিএমপি
৬	এসএমপি
৭	জিএমপি
৮	আরপিএমপি

গ্রুপ-২ মোট ৯টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ
৪	রাজশাহী রেঞ্জ
৫	খুলনা রেঞ্জ
৬	রংপুর রেঞ্জ
৭	বরিশাল রেঞ্জ
৮	সিলেট রেঞ্জ
৯	হাইওয়ে পুলিশ

গ্রুপ-৩ মোট ১৫টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	বিপিএ
২	পিএসসি
৩	পিটিসি, টাঙ্গাইল
৪	পিটিসি, খুলনা
৫	পিটিসি, নোয়াখালী
৬	পিটিসি, রংপুর
৭	টিডিএস
৮	রেলওয়ে
৯	আইপি
১০	ট্যুরিস্ট
১১	নৌ পুলিশ
১২	এপিবিএন
১৩	এসপিবিএন

গ্রুপ-৪ মোট ৫টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	পিএইচকিউ
২	এসবি
৩	সিআইডি
৪	পিবিআই
৫	এটিইউ

১৪	র‍্যাব
১৫	এমআরটি

১২। অফিসার ইনচার্জ পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

১২.১। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ফিটলিস্টভুক্তির জন্য ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদে নূন্যতম ৩ বছর চাকরি সম্পন্ন করতে হবে।

১২.২। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়নের জন্য ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) পদের নির্ধারিত গ্রুপ-৩ এ নূন্যতম ৬ মাস চাকরি সম্পন্ন করতে হবে। তবে নারী কর্তকর্তাদের ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিলযোগ্য হবে।

১২.৩। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে চাকরি করার সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫৪ (চুয়ান্ন) বছর মধ্যে হতে হবে।

১২.৪। কোনো কর্মকর্তা একবার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে তাকে একই থানায় দ্বিতীয়বার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়ন করা যাবে না।

১২.৫। একজন ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)কে গ্রুপ-১/২ এর কোনো একটিতে সর্বোচ্চ ৩টি থানায় ওসি হিসেবে পদায়ন করা যাবে।

১২.৬। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে সর্বোচ্চ ৪টি থানা বা ৮ বছর দায়িত্ব পালন করলে (যেটি আগে ঘটে) পরবর্তীতে তাকে পুনরায় থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা যাবে না।

১২.৭। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ২ বছর চাকরি করার পর সাধারণত অন্যত্র বদলি করা হবে। এক্ষেত্রে একই থানায় ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৩ বছরের বেশি কর্মকাল হবে না।

১২.৮। কোনো অফিসার ইনচার্জকে ১৮ মাসের পূর্বে বদলি/প্রত্যাহার/সংযুক্তি করার প্রয়োজন হলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে অনুমতি নিতে হবে।

১২.৯। ইন্সপেক্টর (তদন্ত/অপারেশনস্) দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাকে ধারাবাহিকভাবে একই থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়ন করা যাবে না। তবে অন্য থানা/ইউনিটে চাকরি করার পর পদায়ন করা যাবে।

১২.১০। একটি থানার কর্মকাল গণনায় নূন্যতম ৬ মাস ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে। তবে অভিযোগ/বিচ্যুতির কারণে ৬ মাসের পূর্বে প্রত্যাহার হলে ৪টি থানা হিসাবের ক্ষেত্রে উক্ত থানা গণনার জন্য বিবেচিত হবে।

১২.১১। থানায় পদায়নকৃত ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)দের মধ্যে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে সিনিয়র ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)কে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়ন করা হবে।

১২.১২। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অন্যুন ৬ (ছয়) মাস কর্মরত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১২.১৩। ইন্সপেক্টর পদে ২ বা ততোধিক এবং সমগ্র চাকরিকালে ৩ বা ততোধিক গুরুদণ্ড থাকলে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়ন করা যাবে না। তবে সর্বশেষ গুরুদণ্ডপ্রাপ্তির পরবর্তী ২ বছর ওসি হিসেবে পদায়ন করা যাবে না।

১২.১৪। আর্থিক অনিয়ম/নৈতিক স্খলনজনিত কারণে সমগ্র চাকরিজীবনে ১টি গুরুদণ্ড থাকলেও অফিসার ইনচার্জ হিসেবে করা যাবে না।

১২.১৫। অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল/জেলা/ইউনিটে ওসি হিসেবে পদায়ন/বদলি করা যাবে না।

১২.১৬। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়নের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এইচএসসি/সমমান থাকতে হবে।

১২.১৭। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়নের জন্য ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)দের ফিটলিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে প্রণয়ন করা হবে এবং উক্ত ফিটলিস্টের ভিত্তিতে থানার ওসি পদায়ন করা হবে।

১২.১৮। ওসিদের ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে একটি কমিটি গঠিত হবে-

সভাপতি: অ্যাডিশনাল আইজি (প্রশাসন), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
সদস্য: (১) পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা, (২) অ্যাডিশনাল আইজি (এসবি), (৩) ডিআইজি (প্রশাসন), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, (৪) অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিঅ্যান্ডপিএস), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, (৫) এআইজি (আরঅ্যান্ডসিপি-২), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
সদস্য সচিব: এআইজি (পিএম-২), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
এছাড়া কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১২.১৯। ওসিদের ফিটলিস্ট প্রণয়নের সময় পিএএল-এর অনুরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

১২.২০। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাগণকে তালিকাভুক্তির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

১২.২১। ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)দের বিগত ৫ বছরের এসিআর রেকর্ড সন্তোষজনক হতে হবে।

১২.২২। ফিটলিস্টভুক্তকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং তা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে

১২.২৩। ফিটলিস্টভুক্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে ওসি হিসেবে পদায়ন করা হবে।

১২.২৪। ফিটলিস্টভুক্ত কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে থানায় (নিজ ও স্পাউজ এর জেলা ব্যতীত) ওসি হিসেবে পদায়ন করা হবে।

গ্রুপ-১ মোট ৮টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ডিএমপি-৫০
২	সিএমপি-১৬
৩	কেএমপি-৮
৪	আরএমপি-১২
৫	বিএমপি-৪
৬	এসএমপি-৬
৭	জিএমপি-৮
৮	আরপিএমপি-৬

গ্রুপ-২ মোট ১০টি ইউনিট	
ক্রম	**ইউনিট**
১	ঢাকা রেঞ্জ-৯৮
২	ময়মনসিংহ রেঞ্জ-৩৭
৩	চট্টগ্রাম রেঞ্জ-১০৯
৪	রাজশাহী রেঞ্জ-৭১
৫	খুলনা রেঞ্জ-৬৪
৬	রংপুর রেঞ্জ-৬১
৭	বরিশাল রেঞ্জ-৪৬
৮	সিলেট রেঞ্জ-৩৯
৯	হাইওয়ে পুলিশ-১
১০	রেলওয়ে পুলিশ-২৪

১২.২৫। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ফিটলিস্ট প্রণয়নে প্রযোজ্য নম্বরবণ্টন (প্রস্তাবনা)

একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)-কে থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত পদায়নের পূর্ব শর্তাবলি পূরণ হওয়া সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পয়েন্টের ভিত্তিতে অফিসাওে গ্রেডিং করা যেতে পারে। এর ফলে একজন অফিসার ইনচার্জ পদায়নে ইচ্ছুক পুলিশ ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)-এর যোগ্যতা যাচাইয়ে Subjectively যাচাই না করে Objectively যাচাই করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক	**বিষয়**	**বিবেচ্য বিষয়**	**প্রদত্ত নম্বর**
১.	চাকরিকাল	ইন্সপেক্টর হিসেবে অন্যূন ৪ বছর (প্রতি বছর-১.০ নম্বর)	৪
২.	বিগত ৫ বছরের এসিআর	অন্যূন ৮০% গড় নম্বর প্রাপ্তিসাপেক্ষে (বিরূপ মন্তব্য থাকলে অনুপযুক্ত) এসিআর-এর মোট নম্বর ২৫ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	২৫
৩.	চাকরি জীবনের কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন	**মূল্যায়নের জন্য নম্বরবণ্টন** অত্যুত্তম-৪.০, উত্তম-৩.০	৪

ক্রমিক	বিষয়	বিবেচ্য বিষয়	প্রদত্ত নম্বর
		চলতিমান-২.০, চলতিমানের নিম্নে-১.০	
৪.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪.১ এসএসসি/সমমান (প্রতি বিভাগের জন্য ১ নম্বর)	৩
		৪.২ এইচএসসি/সমমান (প্রতি বিভাগের জন্য ১ নম্বর)	৩
		৪.৩ স্নাতক/সমমান (প্রতি বিভাগ/শ্রেণির জন্য ২ নম্বর)	৬
		৪.৪ স্নাতকোত্তর/সমমান (প্রতি বিভাগ/শ্রেণির জন্য ২ নম্বর)	৬
৫.	**দক্ষতা** *(প্রতিটি যোগ্যতা ২ নম্বর হিসেবে বন্টন হবে)* ✓ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে দক্ষতা ✓ প্রশাসনিক ও পেশাদারিত্ব কাজে সক্ষমতা ✓ প্রজ্ঞা ও ভাষা জ্ঞান ✓ পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্ব ✓ বিনয়ী, গণমুখী ও সেবাধর্মী আচরণ ✓ নৈতিকতা ও সততা	**প্রতিটি যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্বরবন্টন হবে-** অত্যুত্তম-২.০, উত্তম-১.৫০ চলতিমান-১.০, চলতিমানের নিম্নে-০.৫০	১২
৬.	**তথ্য ও প্রযুক্তিগত সম্যক জ্ঞান** *(প্রতিটি যোগ্যতা ১ নম্বর হিসেবে বন্টন হবে)* ✓ কম্পিউটার (ওয়ার্ড, এক্সেল ও পিপি) ✓ ইন্টারনেট ✓ সিডিআর ও সিডিএমএস বিশ্লেষণ ✓ ফরেনসিকসহ অন্যান্য রিপোর্ট বিশ্লেষণ	**প্রতিটি যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্বরবন্টন হবে-** অত্যুত্তম-১.০, উত্তম-০.৭৫ চলতিমান-০.৫, চলতিমানের নিম্নে-০.২৫	৪

৭.	আউটসাইড ক্যাডেট (ওসি)/ডিসি এসআই (নিরস্ত্র)দের মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরের হার	প্রশিক্ষণের মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
৮.	বেসিক ইন্টেলিজেন্স কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের হার	প্রশিক্ষণের মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
৯.	উচ্চতর তদন্ত কোর্সে প্রাপ্ত নম্বরের হার	প্রশিক্ষণের মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
১০.	ইন্সপেক্টরশিপ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হার	পরীক্ষার মোট নম্বর ৩ বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বর আনুপাতিক হারে যোগ হবে	৩
১১.	পুরস্কার (চাকরিকালীন) (মোট প্রাপ্ত নম্বর হতে ১টি গুরুদণ্ডের জন্য ২ নম্বর এবং ৫টি লঘুদণ্ডের জন্য ০.৫ নম্বর কর্তন হবে)	১১.১ বিপিএম (অন্যূন ১টি)	২
১২.		১১.২ পিপিএম (অন্যূন ১টি)	১
১৩.		১১.৩ আইজিপি ব্যাচ (অন্যূন ৪টি)	০.৫
১৪.		১১.৪ অন্যান্য পুরস্কার (অন্যূন ১০টি)	০.৫
১৫.	বয়স	প্রার্থী ৪০ বছরের কম হলে	২
১৬.	সাক্ষাৎকার	সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রদেয়	১৫
সর্বমোট	**১০০**		

১৩। এএসপি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

১৩.১। সহকারী পুলিশ সুপার/সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রশাসনিক ইউনিটে পদায়ন):

৩) বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে সরাসরি যোগদানকৃত সহকারী পুলিশ সুপারদের মৌলিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপনান্তে এবং সদ্যপদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপারগণকে পুলিশের বিভিন্ন প্রশাসনিক (যেমন-এপিবিএন/এসপিবিএন/র‍্যাব/ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/নৌ পুলিশ/রেলওয়ে পুলিশ/ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/এসবি/সিআইডি/রেঞ্জ কার্যালয়/ আরআরএফ/বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিট ইত্যাদি) ইউনিটে দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা হবে;

৪) পুলিশের প্রশাসনিক ইউনিটে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার কর্মকাল হবে অন্যূন দেড় বছর। উক্ত সময়কালে কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা হবে না।

তবে শুধু অনিবার্য প্রশাসনিক কারণে কোনো কর্মকর্তাকে একই বিভাগ/ইউনিটের আওতাধীন অন্য কোনো জেলা/ইউনিটে বদলি করা যাবে।

১৩.২। সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন):

৪) সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে চাকরিকাল ৩ (তিন) বছর সম্পন্নের পর জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে সহকারী পুলিশ সুপারদের জেলা বা হাইওয়ে পুলিশে সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/মেট্রোপলিটন পুলিশে সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন) হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকায় (ফিটলিস্ট) অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে;

৫) তালিকাভুক্ত একজন কর্মকর্তাকে ক্রমানুসারে জেলা বা হাইওয়ে পুলিশে সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/মেট্রোপলিটন পুলিশে সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন) হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের জন্য পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে পদায়ন করা হবে;

৬) এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা তাঁর চাকরিকালে এক/দুইটি সার্কেল বা জোনে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের জন্য পদায়ন করা যেতে পারে।

১৩.৩। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল)/অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (জোন):

৪) সদ্যপদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে অন্যূন ২ (দুই) বছরের জন্য জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল)/মেট্রোপলিটন পুলিশে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (জোন) হিসেবে পদায়ন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে যারা সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে সার্কেল বা জোনে দায়িত্ব পালন করেননি তাদেরকে আলোচ্য পদায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৫) এছাড়া সদ্যপদোন্নতিপ্রাপ্তদেরকে পুলিশের কোনো প্রশাসনিক ইউনিটে (যেমন-এপিবিএন/এসপিবিএন/ র‍্যাব/ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ/ট্যুরিস্ট পুলিশ/নৌ পুলিশ/রেলওয়ে পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স/ এসবি/সিআইডি/মেট্রোপলিটন পুলিশ সদরদফতর/রেঞ্জ কার্যালয়/আরআরএফ/বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিট ইত্যাদি) দায়িত্ব পালনের জন্য পদায়ন করা যাবে;

৬) এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা তাঁর চাকরিকালে এক/দুইটি সার্কেল বা জোনে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য পদায়ন করা যেতে পারে।

১৩.৪। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন/অপরাধ/ডিএসবি)/অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন/অপরাধ/ সিটিএসবি):

৪) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে চাকরিকাল ১ (এক) বছর সম্পন্নের পর জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে জেলা বা পিবিআই-এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন/অপরাধ/ডিএসবি)/মেট্রোপলিটন পুলিশে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার

(প্রশাসন/অপরাধ/ সিটিএসবি) হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকায় (ফিটলিস্ট) অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে;

৫) তালিকাভুক্ত একজন কর্মকর্তাকে তাঁর চাকরিকাল ২ (দুই) বছর সম্পন্নের পর ক্রমানুসারে জেলা বা পিবিআই-এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন/অপরাধ/ডিএসবি)/ মেট্রোপলিটন পুলিশে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন/অপরাধ/ সিটিএসবি) হিসেবে অন্যূন ২ (দুই) বছরের জন্য পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে পদায়ন করা হবে;

৬) এক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তা তাঁর চাকরিকালে এক/দুইটি জেলা বা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য পদায়ন করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি যে কোনো ইউনিটে পদায়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১৪। জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন নীতিমালার প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান জেলা পুলিশে অধিকতর দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে জনসেবার মান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে জেলার পুলিশ সুপার পদে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে-

১) ৫২ (বায়ান্ন) বছরের ঊর্ধ্বের কোনো কর্মকর্তাকে জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন করা যাবে না;

২) জেলা পুলিশের সার্কেল (ঈরৎপষব)/মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগের জোন (Zone)-এ কমপক্ষে ২ (দুই) বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৩) চাকরি জীবনে গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত হলে পুলিশ সুপার পদে কোনো জেলায় পদায়ন করা যাবে না। এ ছাড়া কোনো জেলায় পুলিশ সুপার পদায়নের অব্যবহিত পূর্বের ১ (এক) বছরের মধ্যে লঘুদণ্ডপ্রাপ্ত হলে তাকেও জেলায় পদায়ন করা যাবে না;

৪) বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারি মামলা চলমান থাকলে জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন করা যাবে না;

৫) জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ ম্যানেজমেন্ট কোর্স (ডিপিএমসি) সম্পন্ন করতে হবে;

৬) জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বশেষ পিইটিতে উত্তীর্ণ হতে হবে;

৭) জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়নের ক্ষেত্রে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের এসিআর-এ গড়ে নূন্যতম ৮০ (আশি) নম্বর থাকতে হবে;

৮) কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম/নৈতিক স্খলনজনিত প্রবণতার প্রমাণকসহ প্রতিবেদন থাকলে কিংবা উক্ত প্রমাণিত অভিযোগ মানবিক কারণে/নবীন কমকর্তা

হিসেবে/ভবিষ্যতে অধিকর সতর্কতা হয়ে দায়িত্ব পালন করার শর্তে অভিযোগ নথিভুক্ত হলে তাকে জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন করা যাবে না;

৯) ব্যাচভিত্তিক ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য আগ্রহী পুলিশ সুপারদের নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে উপযুক্ততা যাচাইকরত সিলেকশন বোর্ডের সম্মুখে 'সাক্ষাৎকার' পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

ক্রম	ক্যাটাগরি	নম্বর
১	বিগত ৫ বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন রেকর্ড	৪০
২	ডিস্ট্রিক পুলিশ ম্যানেজমেন্ট কোর্স (ডিপিএমসি)	১০
৩	ঐচ্ছিক প্রশিক্ষণের প্রতিটি ০.২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ ১০)	১০
৪	সিলেকশন বোর্ড (সাক্ষাৎকার-২০, প্রেজেন্টেশন [ইংরেজি ও বাংলা]-১০ ও গ্রুপ ডিসকাশন-১০)	৪০
সর্বমোট		**১০০**

১০) জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়নের লক্ষ্যে ব্যাচভিত্তিক ফিটলিস্ট প্রণয়নের করা হবে। উক্ত ফিটলিস্ট প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে 'সিলেকশন বোর্ড', 'প্রেজেন্টেশন মূল্যায়নকমিটি', 'গ্রুপ ডিসকাশন মূল্যায়নকমিটি' এবং 'সার্ভিস রেকর্ড কমিটি' গঠন করা হলো। এক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ড ফিটলিস্ট প্রণয়নকরত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করবেন-

ক। সিলেকশন বোর্ড-

ক্রম	পদবি	দায়িত্ব
১.	ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি), বাংলাদেশ	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত আইজি (অপারেশনস্), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত আইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা	সদস্য
৪.	আইজিপি মনোনীত অতিরিক্ত আইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	ডিআইজি (প্রশাসন), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য-সচিব

খ। প্রেজেন্টেশন মূল্যায়নকমিটি

ক্রম	পদবি	দায়িত্ব
১.	অতিরিক্ত আইজি (এইচআরএম), বাংলাদেশ পুলিশ	সভাপতি

ক্রম	পদবি	দায়িত্ব
২.	ডিআইজি (এইচআর), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৩.	আইজিপি মনোনীত ডিআইজি/অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত ডিআইজি (আরঅ্যান্ডসিপি-১), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য-সচিব

গ। গ্রুপ ডিসকাশন মূল্যায়নকমিটি

ক্রম	পদবি	দায়িত্ব
১.	রেক্টর, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা	সভাপতি
২.	ডিআইজি (অপারেশনস্), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৩.	আইজিপি মনোনীত ডিআইজি/অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত ডিআইজি (ট্রেনিং-১), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য-সচিব

ঘ। সার্ভিস রেকর্ড মূল্যায়নকমিটি

ক্রম	পদবি	দায়িত্ব
১.	অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন), বাংলাদেশ পুলিশ	সভাপতি
২.	ডিআইজি (প্রশাসন), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৩.	আইজিপি মনোনীত ডিআইজি/অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত ডিআইজি (পিএম-১), বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য-সচিব
৫.		

১১) সিলেকশন বোর্ড আগ্রহী পুলিশ সুপারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে কর্মকর্তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, সদাচার, বিনয়, স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা, কর্ম-উদ্যম, পেশাদারিত্ব, ভাষাজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা, নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা, সেবাধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইপূর্বক তাদের নাম সুপারিশ করবেন;

১২) ডিআইজি (প্রশাসন), বাংলাদেশ পুলিশ উক্ত সিলেকশন বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন;

১৩) কোনো কর্মকর্তাকে পুলিশ সুপার হিসেবে সর্বোচ্চ দুই জেলা কিংবা ৪ (চার) বছরের জন্য পদায়ন করা যাবে; এক্ষেত্রে একটি জেলার কর্মকাল গণনায় নূন্যতম ৩ (তিন) মাস

ধারাবাহিকভাবে চাকরি করতে হবে। তবে অভিযোগ/বিচ্যুতির কারণে ৩ (তিন) মাসের পূর্বে প্রত্যাহার হলে তা ২টি জেলা গণনায় বিবেচিত হবে;

১৪) কোনো কর্মকর্তাকে একই জেলায় কোনোক্রমেই ২য় বার পুলিশ সুপার পদে পদায়ন করা যাবে না; এবং

১৫) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সপরিবারে কর্মস্থলে অবস্থানের আগ্রহ জেলার পুলিশ সুপার পদে পদায়নের জন্য কর্মকর্তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৫। রেঞ্জ ডিআইজি পদে পদায়নের নিমিত্ত পয়েন্টভিত্তিতে গ্রেডিংসহ প্রযোজ্য শর্তাবলি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা:

ক্রম	বিবরণ	পয়েন্ট
১।	নবম গ্রেড বা তার উপরের গ্রেডে কমপক্ষে ১৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা	১০
২।	অতিরিক্ত ডিআইজি বা সমমানের পদে কমপক্ষে ০৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা	১০
৩।	জেলা পুলিশ সুপার হিসাবে কমপক্ষে ০২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতাসহ পুলিশ সুপার/সমমানের পদে কমপক্ষে ০৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা	১০
৪।	আর্থিক ও নৈতিক সততা	১০
৫।	পুলিশ বিভাগের উন্নয়নের জন্য পূর্ববর্তী সন্তোষজনক কার্যক্রম ও সার্বিক কর্মদক্ষতা	১০
৬।	কৃতিত্বপূণ অর্জন (বিপিএম/পিপিএম/পুলিশ ফোর্স এক্সেমপ্ল্যারি গুড সার্ভিসেস ব্যাজ)	১০
৭।	মতাদর্শগত অবস্থান	১০
৮।	General Administration and Financial Management Certificate Course (GAFMC)/Police Financial Management Certificate Course (PFMCC)/লিডারশীপ কোর্সসহ অপরাধ দমন সংক্রান্ত দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ।	১০
৯।	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণে মেধাক্রম	১০
১০।	মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনে দক্ষতা।	১০

১৬। পুলিশ কমিশনার পদে পদায়নের নিমিত্ত পয়েন্ট ভিত্তিতে গ্রেডিংসহ প্রযোজ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবনা:

ক্রম	বিবরণ	পয়েন্ট
১।	ডিআইজি বা সমমানের পদে কমপক্ষে ০৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা	১০
২।	নবম গ্রেড বা তার উপরের গ্রেডে কমপক্ষে ১৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা	১০
৩।	মেট্রোপলিটন পুলিশে ডিসি পদে কমপক্ষে ০২ বছর ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদে কমপক্ষে ০১ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা	১০
৪।	আর্থিক ও নৈতিক সততা	১০
৫।	পুলিশ বিভাগের উন্নয়নের জন্য পূর্ববর্তী সন্তোষজনক কার্যক্রম ও সার্বিক কর্মদক্ষতা	১০

ক্রম	বিবরণ	পয়েন্ট
৬।	কৃতিত্বপূণ অর্জন (বিপিএম/পিপিএম/পুলিশ ফোর্স এক্সেমপ্ল্যারি গুড সার্ভিসেস ব্যাজ)	১০
৭।	মতাদর্শগত অবস্থান	১০
৮।	General Administration and Financial Management Certificate Course (GAFMC)/Police Financial Management Certificate Course (PFMCC)/লিডারশীপ কোর্সসহ অপরাধ দমন সংক্রান্ত দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ।	১০
৯।	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণে মেধাক্রম	১০
১০।	মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনে দক্ষতা।	১০

১৭। পদায়ন নীতিমালার সাধারণ নির্দেশাবলির প্রস্তাবনা

১৭.১। কোনো কর্মকর্তাকে একই জেলায় একাধিকবার পদায়ন করা যাবে না। তবে শিক্ষানবিশকালে পদায়নকে নিয়মিত পদায়ন হিসেবে গণ্য করা হবে না;

১৭.২। কোনো কর্মকর্তার স্ত্রী/স্বামী উভয়ই চাকরিজীবী হলে যথাসম্ভব একই কর্মস্থলে কিংবা নিকটবর্তী জেলা/মেট্রোপলিটন পুলিশের অধিক্ষেত্রে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে;

১৭.৩। কোনো জেলা/হাইওয়ে পুলিশ/পিবিআই কিংবা মেট্রোপলিটন পুলিশে যথাক্রমে সার্কেল, জোন ও অপরাধ বিভাগে সহকারী পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ক্রমধারা যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে।

১৭.৪। কোনো জেলা/হাইওয়ে পুলিশ/পিবিআই কিংবা মেট্রোপলিটন পুলিশের যথাক্রমে সার্কেল, জোন ও অপরাধ বিভাগে পদায়ন পূর্ববর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে কোনো বিধিমালার অধীনে যে কোনো দণ্ড প্রাপ্ত হলে কিংবা দাখিলকৃত এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য, চলতিমান থাকলে তা কোনো কর্মকর্তাকে পদায়নের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা মর্মে বিবেচিত হবে। এছাড়া কোনো সতর্ক/আইজিপি মহোদয়ের অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন একইভাবে পদায়নের ক্ষেত্রে 'বিরূপ মন্তব্য' হিসেবে গণ্য হবে;

১৭.৫। কোনো কর্মকর্তাকে নিজ জেলা ব্যতীত পুলিশের যে কোনো ইউনিটে পদায়ন করা হবে। কোনো কর্মকর্তাকে তাঁর স্বামী বা স্ত্রীর জেলায় পদায়ন করা যাবে না;

১৭.৬। কোনো কর্মকর্তার নিজের অথবা স্ত্রী/স্বামী/সন্তানের দুরারোগ্য ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে সুবিধাজনক স্থানে পদায়ন করা যাবে;

১৭.৭। নিয়োগ/পদায়নের প্রজ্ঞাপনে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হবে। যৌক্তিককারণ ব্যতীত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোনো কর্মকর্তা তাঁর বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে; এবং

১৭.৮। মেট্রোপলিটন পুলিশের অধিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে আইজিপি মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-খ

নন-পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ট্রেড পুলিশম্যান পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির সংস্কার প্রস্তাবনা

ক্রমি	পদের নাম	বয়স	নিয়োগের মাধ্যম	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**সুপারেন্ট্যান্ডেট অব হসপিটাল/ চিপ কনসাল্ট্যান্ট/ সিনিয়র কনসাল্ট্যান্ট (বেতন গ্রেড-৫)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেডিক্যালের উচ্চতর ডিগ্রিসহ এমবিবিএস/সমমানের মেডিক্যাল ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কনসাল্ট্যান্ট/অ্যাডিশনাল সুপারেন্ট্যান্ডেট অব হসপিটাল/বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** কনসাল্ট্যান্ট/অ্যাডিশনাল সুপারেন্ট্যান্ডেট অব হসপিটাল/বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরসহ মোট চাকরিকাল ১০ (দশ) বৎসর।
২.	**কনসাল্ট্যান্ট/ অ্যাডিশনাল সুপারেন্ট্যান্ডেট অব হসপিটাল/ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (বেতন গ্রেড-৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৪০ (চল্লিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেডিক্যালের উচ্চতর ডিগ্রিসহ এমবিবিএস/সমমানের মেডিক্যাল ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল অফিসার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** মেডিক্যালের উচ্চতর ডিগ্রিসহ সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি।

ক্রমি	পদের নাম	বয়স	নিয়োগের মাধ্যম	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
৩.	**সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার/ আরএমও/জুনিয়র কনসাল্ট্যান্ট (বেতন গ্রেড-৭)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমবিবিএস/সমমানের মেডিক্যাল ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল অফিসার পদে ২ (দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** মেডিক্যাল অফিসার পদে ২ (দুই) বৎসরের চাকরি।
৪.	**মেডিক্যাল অফিসার (বেতন গ্রেড-৯)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শতভাগ।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমবিবিএস/সমমানের মেডিক্যাল ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) বাংলাদেশের নাগরিক।
৫.	**চিপ সিস্টেম এনালিস্ট/চিপ সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স (বেতন গ্রেড-৫)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইইই/সমমানের বিষয়ে ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স পদে ৫ (পাঁচ)সহ ১০ (দশ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স পদে ৫ (পাঁচ)সহ মোট ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।

ক্রমি	পদের নাম	বয়স	নিয়োগের মাধ্যম	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
৬.	**সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স (বেতন গ্রেড-৭)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শতভাগ।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১)) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইইই/সমমানের বিষয়ে ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সিস্টেম এনালিস্ট/সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** সিস্টেম এনালিস্ট/সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।

৭.	**সিস্টেম এনালিস্ট/ সফটওয়ার ম্যানটেইনেন্স (বেতন গ্রেড-৯)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কম্পিউটার সায়েন্স/ইইই/সমমানের বিষয়ে ডিগ্রি। (২) সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ প্রাপ্ত। (৩) বাংলাদেশের নাগরিক।
৮.	**পরিচালক (বেতন গ্রেড-৫)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিচারক পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৯ (নয়) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** অতিরিক্ত পরিচালক/সমপদে ৩ (তিন) বৎসরসহ মোট চাকরিকাল ১২ (নয়) বৎসর।

৯.	**অতিরিক্ত পরিচালক (বেতন গ্রেড-৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে উপপরিচালক পদে ৪ (চার) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৯ (নয়) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** উপপরিচালক/সমপদে ৪ (চার) বৎসরসহ মোট চাকরিকাল ৯ (নয়) বৎসর।
১০.	**উপ-পরিচালক (বেতন গ্রেড-৭)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সহকারী পরিচালক পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সহকারী পরিচালক/সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর।
১১.	**সহকারী পরিচালক (বেতন গ্রেড-৯)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	২৫% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৭৫% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সহকারী পরিচালক পদে ২ (দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:**

				হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা অফিস সুপার পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১৬ (ষোলো) বৎসর।
১২.	**হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (বেতন গ্রেড-১০)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র হিসাবরক্ষক বা সমপদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১৩ (তেরো) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** সিনিয়র হিসাবরক্ষক বা সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১৩ (তেরো) বৎসর।
১৩.	**সিনিয়র হিসাবরক্ষক/ সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (বেতন গ্রেড-১২)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৮ (আট) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** হিসাবরক্ষক পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৮ (আট) বৎসর।
১৪.	**হিসাবরক্ষক (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা।

				(৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাবরক্ষক বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** সহকারী হিসাবরক্ষক পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
১৫.	**সহকারী হিসাবরক্ষক (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার পাইবে।
১৬.	**অফিস সুপার (বেতন গ্রেড-১০)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চমান সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১৩ (তেরো) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** উচ্চমান সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১৩ (তেরো) বৎসর।
১৭.	**উচ্চমান সহকারী (বেতন গ্রেড-১২)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতক ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা।

		বয়স শিথিলযোগ্য।		(৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৮ (আট) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (১) অফিস সহকারী পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৮ (আট) বৎসর। (২) প্রার্থীদের ইংরেজি, বাংলা, গণিত, প্রযুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ১০০ (একশত) নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ২০ (বিশ) নম্বরের বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষায় পাশ নম্বর শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ।
১৮.	**অফিস সহকারী (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতক ডিগ্রি। (২) কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা। (৩) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে অফিস সহায়ক বা ডেলিভারিম্যান পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (১) অফিস সহায়ক বা ডেলিভারিম্যান পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (২) প্রার্থীদের ইংরেজি, বাংলা, গণিত, প্রযুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ১০০ (একশত) নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ২০ (বিশ) নম্বরের বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষায় পাশ নম্বর শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ।
১৯.	**অফিস সহায়ক (বেতন গ্রেড-১৮)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) এসএসসি বা সমমান। (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান।
২০.	**চিফ কম্পিউটার অপারেটর (বেতন গ্রেড-১২)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতক ডিগ্রি।

		প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৬ (ছয়) মাসের সনদপত্র। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটর বা সমপদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর।
২১.	**সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতক ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৬ (ছয়) মাসের সনদপত্র। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটর বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** কম্পিউটার অপারেটর বা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
২২.	**কম্পিউটার অপারেটর/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ২য় (দ্বিতীয়) শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতক ডিগ্রি। (২) শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে ৩য় (তৃতীয়) শ্রেণি বা বিভাগ বা জিপিএ বা সমমানের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৬ (ছয়) মাসের সনদপত্র। (৪) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
২৩.	**চিফ ইলেক্ট্রিশিয়ান (বেতন গ্রেড-১২)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০%	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা,

		(ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	(পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইলেক্ট্রিশিয়ান বা সমপদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সিনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর।
২৪.	**সিনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইলেক্ট্রিশিয়ান বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ইলেক্ট্রিশিয়ান পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
২৫.	**ইলেক্ট্রিশিয়ান (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায়

		বয়স শিথিলযোগ্য।		উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
২৬.	**সিনিয়র ড্রাইভার (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) এসএসসি বা সমমান পাশ। (২) ভারী যানবাহন চালনার বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত। (৩) ড্রাইভার হিসেবে চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (৪) ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** (১) ড্রাইভার হিসেবে চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (২) ভারী যানবাহন চালনার বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত। (৩) ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৭.	**ড্রাইভার (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) এসএসসি বা সমমান পাশ। (২) হালকা বা ভারী যানবাহন চালনার বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত। (৩) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান। (৪) ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** (১) ড্রাইভার সহায়ক পদে মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (২) হালকা বা ভারী যানবাহন চালনার বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত। (৩) ড্রাইভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২৮.	**ড্রাইভার সহায়ক (বেতন গ্রেড-১৮)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) ৮ম (অষ্টম) শ্রেণি বা সমমান পাশ। (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান।

২৯.	**সিনিয়র প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বোর্ড হইতে প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা ভোকেশনাল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (২) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর বা সমপদে মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর।
৩০.	**প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বোর্ড হইতে প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা ভোকেশনাল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (২) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর বা সমপদে মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** জুনিয়র প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর পদে মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
৩১.	**জুনিয়র প্লাম্বার-কাম-পাম্প অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৮)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) স্বীকৃত বোর্ড হইতে প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা ভোকেশনাল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
৩২.	**সিনিয়র টেকনিশিয়ান (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়

			নিয়োগের মাধ্যমে।	উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে টেকনিশিয়ান বা সমপদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** টেকনিশিয়ান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর।
৩৩.	**টেকনিশিয়ান (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র টেকনিশিয়ান বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
৩৪.	**জুনিয়র টেকনিশিয়ান (বেতন গ্রেড-১৮)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

				(৪) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
৩৫.	**সিনিয়র ডিজাইনার (বেতন গ্রেড-১০)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ডিজাইনার বা সমপদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ডিজাইনার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর।
৩৬.	**ডিজাইনার (বেতন গ্রেড-১৪)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সহকারী ডিজাইনার বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:**

				সহকারী ডিজাইনার পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
৩৭.	**সহকারী ডিজাইনার (বেতন গ্রেড-১৬)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
৩৮.	**সিনিয়র মেশিন অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৫)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০(ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	১০০% (শতভাগ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে মেশিন অপারেটর বা সমপদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** মেশিন অপারেটর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ১২ (বারো) বৎসর।
৩৯.	**মেশিন অপারেটর**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:**

	(বেতন গ্রেড-১৬)	বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে সহকারী মেশিন অপারেটর বা সমপদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর। (৫) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** সহকারী মেশিন অপারেটর পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বৎসর।
৪০.	**সহকারী মেশিন অপারেটর (বেতন গ্রেড-১৮)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (১) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অথবা, (২) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোক) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা, (৩) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (৪) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

৪১.	**সিনিয়র বাবুর্চি (বেতন গ্রেড-১৬) এবং বাবুর্চি (বেতন গ্রেড-১৮)/সহায়ক বাবুর্চি (বেতন গ্রেড-২০)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) ৮ম (অষ্টম) শ্রেণি বা সমমান। (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
৪২.	**সিনিয়র ক্লিনার (বেতন গ্রেড-১৬) এবং ক্লিনার (বেতন গ্রেড-১৮)/সহায়ক ক্লিনার (বেতন গ্রেড-২০)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য	৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সরাসরি নিয়োগ বা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) পদোন্নতি, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(১) ৮ম (অষ্টম) শ্রেণি বা সমমান। (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
৪৩.	**সিনিয়র-মুচি/হরিজন/ নাপিত (বেতন গ্রেড-১৬) এবং মুচি/হরিজন/ নাপিত (বেতন গ্রেড-১৮)/ মুচি/হরিজন/ নাপিত (বেতন গ্রেড-২০)**	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বয়স শিথিলযোগ্য।	আউটসোর্সিং	(১) ৮ম (অষ্টম) শ্রেণি বা সমমান। (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স শাখা
www.police.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.১১২.২২.২২.২০২৪-৬৭৪ (২)

তারিখ: ০৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ২০০৭ সনে প্রণীত খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশটি প্রস্তাবিত নতুন পুলিশ আইনের ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-ডিও/এআইজিপি/১১৬/২০০৭, তারিখ:-১২/০৮/২০০৭ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোল্লিখিত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, একটি ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি অনুগত পুলিশ বাহিনী তৈরীর জন্য ১৮৬১ সনে পুলিশ এ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছিল যাতে জনগণের প্রতি পুলিশের কোন দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং কর্তব্য নিরূপন করা হয়নি।

বর্ণিত কারণ বিবেচনায় এবং পুলিশ বাহিনীকে জনবান্ধব, জবাবদিহি, দক্ষ ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিনিধির সমন্বয়ে পুলিশ অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী (পিআরপি) কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-ডিও/এআইজিপি/১১৬/২০০৭, তারিখ:-১২/০৮/২০০৭ খ্রি. মূলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

পরবর্তীতে ১৪/০৭/২০০৮খ্রি. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ অধিশাখা-২ হতে প্রাপ্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ এর উপর বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি কনসালটেশনের মাধ্যমে সকল স্টেক হোল্ডার তথা সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত মতামত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ও কাগজাদি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে ৩১/০৮/২০০৮খ্রি. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ অধিশাখা-২ এ প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, তৎকালীন নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের নিকট খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশটি অগ্রাধিকার না পাওয়ায় প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং অতি সম্প্রতি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় রেখে একটি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে "পুলিশ সংস্কার কমিশন" গঠন করা হয়েছে

এমতাবস্থায়, "পুলিশ সংস্কার কমিশন" এর সহায়তায় যুগোপযোগী ও পেশাদার পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রস্তাবিত পুলিশ আইন প্রস্তুতের লক্ষ্যে পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭-কে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সংস্কারের সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশের কপি আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

23/10/2024

সংযুক্তি:
খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ এর কপি

(মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, পিপিএম)
বিপি-৭৬০২১১৬৫৬৮
অতিরিক্ত ডিআইজি
পক্ষে/ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
ফোন: ০১৩২০-০০০২০৩
ই-মেইল: aigla@police.gov.bd

প্রাপক:
জনাব সফর রাজ হোসেন
কমিশন প্রধান
পুলিশ সংস্কার কমিশন
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জ্ঞাতার্থে:
সিনিয়র সচিব,
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CamScanner
Scanned with CamScanner

পুলিশ অর্ডিন্যান্স- ২০০৭

Scanned with CamScanner

CamScanner

Bangla Draft (04.10.2007)

খসড়া

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭

সূচীপত্র

শিরোনাম	অধ্যায়	ধারা	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা			
প্রারম্ভিক	প্রথম	১-২	৩-৫
পুলিশের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য	দ্বিতীয়	৩-৫	৬-৮
পুলিশ সংগঠন	তৃতীয়	৬-৩৬	৯-১৭
জাতীয় পুলিশ কমিশন	চতুর্থ	৩৭-৪৮	১৮-২১
মেট্রোপলিটন ও নগর পুলিশ	পঞ্চম	৪৯-৫৭	২২-২৩
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জন শৃঙ্খলা সমস্যা	ষষ্ঠ	৫৮-৬৬	২৪-২৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন	সপ্তম	৬৭-৭০	২৬
পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ	অষ্টম	৭১-৮১	২৭-৩০
আচরণ ও শৃঙ্খলা	নবম	৮২-৯৬	৩১-৩৪
কল্যাণ	দশম	৯৭-৯৯	৩৫-৩৬
পুলিশ পলিসি গ্রুপ	একাদশ	১০০-১০৩	৩৭
জনসভা, শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা	দ্বাদশ	১০৪-১১১	৩৮-৪০
জন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি	ত্রয়োদশ	১১২-১২১	৪১-৪২
অপরাধ ও দন্ড	চতুর্দশ	১২২-১৪০	৪৩-৪৫
বিবিধ	পঞ্চদশ	১৪১-১৬৩	৪৬-৫০
তফসীল			

চলমান পাতা...২

CamScanner

ঢাকা ..../২০০৭

নং-.................... গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ...../....../২০০৭ ইং তারিখে জারিকৃত নিম্নলিখিত অধ্যাদেশটি জনসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্বারা প্রকাশিত হইল।

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭
(২০০৭ সনের .... নম্বর অধ্যাদেশ)

বাংলাদেশ পুলিশ পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি অধ্যাদেশ।

যেহেতু মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, সংবিধান ও আইন অনুসারে কর্মপরিচালন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণে পুলিশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্তরূপ কর্মপরিচালনায় পুলিশকে পেশাগতভাবে দক্ষ, সেবা-নিবেদিত, জনগণের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন, বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত এবং আইন, আদালত ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হইতে হইবে;

এবং যেহেতু পুলিশী ব্যবস্থার নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ, আইনের শাসন ও সুশাসনের নীতিসমূহ বিবেচনা করিয়া পুলিশের ভূমিকা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পুনঃসংজ্ঞায়িত করা সমীচীন;

এবং যেহেতু দক্ষতার সহিত অপরাধ প্রতিরোধ, উদঘাটন ও দমন, জনশৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য পুলিশ পুনর্গঠন প্রয়োজন;

এবং যেহেতু বর্তমানে সংসদ নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আশু ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু এক্ষনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনু" ছদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন।

চলমান পাতা...৩

Scanned with CamScanner

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ**

(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহঃ** (১) বিষয়ে ও প্রসংগে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে -

(১) 'বাংলাদেশ পুলিশ' বা 'পুলিশ সার্ভিস' বলিতে ধারা ৬ এ বর্ণিত পুলিশ সার্ভিসের সকল সদস্যসহ

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীনে নিযুক্ত সকল বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা, এবং

(খ) অন্যান্য সকল পুলিশ কর্মচারী বুঝাইবে।

(২) 'বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী' বলিতে যে পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেখানে সহকারী পুলিশ সুপারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহা বুঝাইবে।

(৩) 'কোড' বলিতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি কোড, ১৮৯৮ বুঝাইবে।

(৪) 'পরামর্শ' বলিতে সম্মতিতে সমাপ্ত মতামতের আদান প্রদান বুঝাইবে (এবং মত বিরোধের ক্ষেত্রে তাহা পুলিশ কমিশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত হইবে)।

(৫) 'পুলিশ কমিশন' বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ অনুসারে সংগঠিত জাতীয় পুলিশ কমিশন বুঝাইবে।

(৬) 'অভিযোগ কর্তৃপক্ষ' বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৭১ অনুসারে গঠিত পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বুঝাইবে।

(৭) 'ডিজি র‍্যাব' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের প্রধানকে বুঝাইবে।

(৮) 'ডিজি এপিবিএন' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রধানকে বুঝাইবে।

(৯) 'ডিজি এসবি' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত স্পে শাল ব্রাঞ্চের প্রধান বুঝাইবে।

(১০) 'ডিজি সিআইডি' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত অপরাধ তদন্ত বিভাগের প্রধান বুঝাইবে।

(১১) 'ডিজি প্রোটোকল এন্ড প্রোটেকশন' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত প্রোটোকল ও প্রোটেকশন বিভাগের প্রধান বুঝাইবে।

(১২) 'জিলা' বলিতে ১৮৩৬ সনের জিলা আইনে সংজ্ঞায়িত জিলা বুঝাইবে।

(১৩) 'জিলা পুলিশ প্রধান' বলিতে ধারা ১৬ অনুসারে নিযুক্ত কোন জিলা পুলিশ প্রধান যিনি পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদমর্যাদার হইবেন এবং এই অধ্যাদেশের অধীন জিলা পুলিশ প্রধানের কার্য সম্পাদনের জন্য সরকারের বিশেষ বা সাধারণ আদেশবলে নিযুক্ত যে কোন পুলিশ অফিসারকে বুঝাইবে।

(১৪) 'সাধারণ পুলিশ এলাকা' বলিতে যে কোন মেট্রোপলিটন এলাকা বা জিলা বা বাংলাদেশের যে কোন অংশ বুঝাইবে।

(১৫) 'সরকার' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বুঝাইবে। চলমান পাতা...৪

Scanned with CamScanner

(১৬) 'জিলা পুলিশ প্রধান' বলিতে জিলা পুলিশ অফিসার বুঝাইবে।

(১৭) 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা' বলিতে জাতীয় স্বার্থ, শান্তি, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বুঝাইবে।

(১৮) ইনসার্জেন্সী (Insurgency) বলিতে জনসমষ্টির কোন একটি গ্র" প বা অংশ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বা ইহার কোন অংগ বা জনসমষ্টির কোন এক অংশের বা গ্র" পের বির" দ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বুঝাইবে।

(১৯) 'জুনিয়র র‍্যাংকস' বলিতে প্রথম তফসীলের বর্ণনামতে ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন পদের সকল পুলিশ অফিসারকে বুঝাইবে।

(২০) 'ইউনিট প্রধান' বলিতে পুলিশের বিশেষ শাখা (স্পে• শাল ব্রাঞ্চ), অপরাধ তদন্ত বিভাগ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, প্রোটেকশন ও প্রোটোকল বিভাগ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ রেঞ্জ, হাইওয়ে পুলিশ, মেরিন পুলিশ, জিলা পুলিশ, থানা বা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত যে কোন পুলিশ ইউনিটের প্রধানকে বুঝাইবে।

(২১) 'ব্যবস্থাপনা' বলিতে প্রশাসন, মানব সম্• দ, অপারেশনাল ও অর্থ সম্• র্কিত কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২২) 'পুলিশ কমিশনার' বলিতে যে কোন মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনের অধীনে নিযুক্ত পুলিশ কমিশনার বুঝাইবে।

(২৩) 'ব্যক্তি' বলিতে যে কোন ব্যক্তি, কোম্• ানী, কর্পোরেশন বা অন্যান্য আইনী সত্ত্বাকে বুঝাইবে।

(২৪) 'স্থান বা জায়গা' বলিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাড়ী, দালান, তাঁবু, অন্যান্য স্থাপনা এবং বেষ্টনীবদ্ধ বা উন্মুক্ত যে কোন জায়গা/স্থান বুঝাইবে।

(২৫) 'জনসাধারণের বিনোদন স্থান' বলিতে খাদ্য ও আবাসিক ব্যবস্থাসহ বা ব্যতীত সংগীত, গান, নৃত্য বা অন্যান্য বিনোদনের ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাদি সম্বলিত যে কোন স্থান বুঝাইবে যেখানে নগদ বা পরে আদায়যোগ্য অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে।

(২৬) 'পুলিশ বা পুলিশ অফিসার' বলিতে ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহারা -

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন;

(খ) যে কোন অনুমোদিত পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

(গ) পুলিশ সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহন করিয়াছেন; এবং

(ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে নিয়োগপত্র লাভ করিয়াছেন।

(২৭) 'নির্ধারিত' (Prescribed) অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট।

(২৮) 'পুলিশ ইউনিট' বলিতে স্পে• শাল ব্রাঞ্চ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, প্রোটেকশন ও প্রোটোকল বিভাগ, পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ রেঞ্জ, হাইওয়ে পুলিশ, মেরিন পুলিশ, জিলা পুলিশ, থানা ও সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত অন্যান্য পুলিশ ইউনিট বুঝাইবে।

চলমান পাতা...৫

Scanned with CamScanner
CamScanner

(২৯) 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স' বলিতে পুলিশ প্রধানের অফিস বুঝাইবে।

(৩০) 'পুলিশ জিলা' বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৫ অনুযায়ী ঘোষিত বা সংজ্ঞায়িত পুলিশ জিলা বুঝাইবে।

(৩১) 'সম্ং দ' বলিতে যে কোন অস্থায়ী সম্ং দ, অর্থ, মূল্যবান সিকিউরিটি বা দলিল বুঝাইবে।

(৩২) 'জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান' বলিতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে এমন স্থান বা জায়গা বুঝাইবে।

(৩৩) 'রেঞ্জ পুলিশ অফিসার' বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত সাধারণ পুলিশ এলাকা প্রধান যিনি অন্যূন পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক পদ মর্যাদার হইবেন বুঝাইবে।

(৩৪) 'বিধিমালা' অর্থ ধারা ১৫৬ অনুযায়ী প্রণীত বিধিসমূহ।

(৩৫) 'প্রবিধানমালা' অর্থ ধারা ১৫৭ অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধানসমূহ।

(৩৬) 'তফসীল' অর্থ এই অধ্যাদেশে সংযুক্ত তফসীল।

(৩৭) উর্ধতন কর্মকর্তা (সিনিয়র র‍্যাংকস) বলিতে প্রথম তফসীলে বর্ণিত সহকারী পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদমর্যাদা সম্ং ন্ন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দকে বুঝাইবে।

(৩৮) 'স্ট্রীট বা রাস্তা' অর্থ যে কোন জনপথ, সড়ক, রাস্তা, গলি, ফুটপাথ, সেতু, পুল, তোরণ, পায়েচলা পথ, মাঠ বা খোলা জায়গা যাহাতে সর্বসাধারণের স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রবেশাধিকার আছে।

(৩৯) 'সার্ভিস' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৬ অনুযায়ী গঠিত পুলিশ সার্ভিস।

(৪০) 'সন্ত্রাসী কর্মকান্ড' বলিতে আইন সংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ভীত বা বিচলিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং সমাজে বা উহার কোন অংশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবার মানসে কোন ব্যক্তি বা দল কর্তৃক বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ, প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষতিকারক গ্যাস বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য এবং বিপজ্জনক প্রকৃতির অন্য কোন পদার্থ, ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বুঝাইবে যাহার মধ্যে অর্থায়ন এবং প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪১) 'যানবাহন' বলিতে যান্ত্রিক বা অন্যভাবে পরিচালিত যে কোন ধরণের যানবাহনকে বুঝাইবে।

২। বিদ্যমান যে কোন আইনে উল্লেখিত পুলিশের মহাপরিদর্শক, জিলা পুলিশ সুপার ও সাব-ইন্সপেক্টর বলিতে এই অধ্যাদেশের তৃতীয় অধ্যায় অনুসারে নিযুক্ত পুলিশ প্রধান, জিলা পুলিশ প্রধান ও সহকারী ইন্সপেক্টর বুঝাইবে।

৩। এই অধ্যাদেশে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নাই এমন কোন শব্দ বা শব্দাবলী ১৮৯৭ সনের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট, ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও ১৮৬০ সনের দন্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত অর্থ বহন করিবে।

৪। এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত একই শব্দ বিষয় বা প্রসংগ অনুযায়ী একবচন বা বহুবচন এবং পুংলিংগ বা স্ত্রীলিংগ যে কোন অর্থ বহন করিবে।

চলমান পাতা...৬

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩। **জনগণের প্রতি পুলিশের দায়িত্ব** - প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব হইবে -

(ক) জনসাধারণের সহিত সম্মান ও সৌজন্যের সহিত আচরণ করা;

(খ) অপরাধ, শোষণ, বঞ্চনা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(গ) জনগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া দরিদ্র, অক্ষম, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত করা;

(ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমুহের নিশ্চয়তা বিধান করা;

(ঙ) মহিলা ও শিশুদের প্রতি হয়রানি বা উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা;

(চ) পুলিশী ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

৪। **পুলিশের কর্তব্য** - (১) আইনী বিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হইবে -

(ক) ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতিসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখা;

(খ) নাগরিকদের জীবন, সম্• দ ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা;

(গ) জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন;

(ঘ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার ও সুবিধাদি রক্ষা করা;

(ঙ) অপরাধ এবং গণ-উপদ্রব সংঘটন প্রতিরোধ করা;

(চ) সামাজিক শান্তি, অপরাধ ও জাতীয় স্বার্থ সম্• র্কিত জ্ঞান সংগ্রহ ও বিতরণ করা;

(ছ) অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(জ) সড়ক, জনপথ, রাস্তাঘাট, মেলা, উন্মুক্ত স্থান ও পথ, জনগণের প্রবেশাধিকার সম্বলিত স্বাস্থ্য ও বিনোদন কেন্দ্র, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য গণউপাসনালয় ইত্যাদিতে শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং যে কোন প্রকার উপদ্রব ও প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করা;

(ঝ) সড়ক, জনপথ, রেলপথ, পানিপথ ও রাস্তাঘাটে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়ন;

(ঞ) দাবীদার বিহীন সম্• দের হেফাজত, তালিকা প্রস্তুতকরণ, প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া উহা ফেরৎ প্রদানের প্রচেষ্টা বিফল হইলে উক্ত সম্• ত্তি বা উহার মুল্য সরকারী কোষাগারে জমা করা;

(ট) অপরাধ প্রতিরোধ ও উদঘাটন;

(ঠ) অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা;

(ড) ঐ সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাহাদের গ্রেফতারের ক্ষমতা পুলিশ অফিসারের আছে এবং যাহাদের গ্রেফতার করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে;

চলমান পাতা...৭

Scanned with CamScanner CamScanner

(ঢ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির গ্রেফতারের খবর তাহার মনোনীত লোকদের নিকট যথাশীঘ্র প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

(ণ) যে কোন দোকানপাট, জুয়া খেলার ঘর বা যেখানে মদ, গাঁজা বা অন্য মাদক দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় অথবা অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য রাখা হয় এবং যেখানে উশৃঙ্খল ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের সমাগম হয় এমন আনন্দ বিনোদন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে বিনা পরোয়ানায় প্রবেশ ও পরিদর্শন;

(ত) আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সকল আইনসংগত আদেশ মান্য করা ও সত্বর কার্যকর করা;

(থ) অপরাধ ও অবিচারের শিকার মহিলা ও শিশুদের যথেষ্ট সাহায্য প্রদান এবং তাহাদের অধিকার সম্• র্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যথোপযুক্ত পরামর্শ প্রদান;

(দ) সহিংসতা, অগ্নিকান্ড ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জনগণের সম্• দ বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থাকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমম্বয় করা;

(ধ) কোন ব্যক্তি বা সংগঠিত গ্র" পের শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণা হইতে জনগণকে রক্ষা করা এবং উক্তরূপ শোষণ বঞ্চনা প্রতিরোধ করা;

(ন) তাহার নিজের বা জনগণের বা তাহাদের সম্• দের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া; এবং

(প) এই অধ্যাদেশ, কোড বা বলবৎ অন্য কোন আইনে প্রদত্ত অন্য যে কোন কর্তব্য সম্• াদন এবং ক্ষমতার প্রয়োগ করণ।

(ফ) মাপে কম দেওয়া, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় প্রভৃতি প্রতিরোধ করণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) **নিম্নরূপ কাজ করিতে প্রত্যেক পুলিশ অফিসার সকল উদ্যোগ গ্রহন করিবেন -**

(ক) দুর্গত অবস্থায় পতিত জনগণকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান;

(খ) অপরাধ ও দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান;

(গ) দুর্ঘটনা ও অপরাধের শিকার ব্যক্তিগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারী ও নির্ভরশীলদের সহায়তা প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও দলিলাদি দিয়া সাহায্য করা; এবং

(ঘ) অপরাধ ও দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাদের অধিকার ও বিশেষ সুবিধাসমুহ সম্• র্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৩) **প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের ইহা কর্তব্য হইবে যে -**

অপরাধ করিতেছে এইরূপ সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তির বির" দ্ধে সমন, গ্রেফতারী পরোয়ানা, তল্লাসী পরোয়ানা বা এইরূপ অন্য কোন আইনী প্রসেস/আদেশ জারী করার জন্য তিনি উপযুক্ত আদালতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করিবেন।

চলমান পাতা...৮

Scanned with CamScanner

(৪) একজন পুলিশ অফিসারের কর্তব্য ইহাও হইবে যে তিনি অপরাধ ও দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তাকারী সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ (যেমন-সেইফ হোম, এসিড সার্ভাইভর্স ইউনিট, ভিকটিম সাপোর্ট ইউনিট, পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি) এবং অন্যান্য আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কে উক্ত অপরাধ ও দুঘটনার শিকার ব্যক্তিদেরকে অবহিত করিবেন যেন তাঁহারা এইগুলির সর্বোত্তম সুযোগ গ্রহন করিতে পারেন।

(৫) **উর্ধতন পুলিশ অফিসার কর্তৃক অধঃস্তন পুলিশ অফিসারের কর্তব্য সম্পাদন-** আইনের কোন বিধান সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করিতে বা উহার লংঘন পরিহার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ও সমীচীন প্রতীয়মান হইলে কোন সিনিয়র পুলিশ অফিসার তাঁহার অধঃস্তন কোন অফিসারকে আইনে বা আইনসংগত আদেশবলে প্রদত্ত কর্তব্য নিজে সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং তিনি স্বীয় কাজ দ্বারা অথবা আইনসংগতভাবে তাঁহার অধীনে কর্মরত কোন অফিসারের কাজ দ্বারা প্রথমোক্ত অধঃস্তন অফিসারের কাজের সহায়ক, সম্পূরক, অপসারক বা বাতিলকারক বা প্রতিরোধক কাজ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

চলমান পাতা...৯

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

পুলিশ সংগঠন

৬। **বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস-**

সরকার কতৃক গঠিত পুলিশ প্রতিষ্ঠানসমুহকে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে একটি পুলিশ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা অনুযায়ী পুলিশ সার্ভিসের সদস্যগণকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যে কোন পদে বা স্থানে বদলী করা যাইবে।

৭। পুলিশ প্রধান নিয়োগ-

(১) ধারা ৩৭ অনুযায়ী গঠিত জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত তিন জন পুলিশ অফিসারের সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একজনকে সরকার পুলিশ প্রধান হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(২) তাঁহার স্বাভাবিক অবসরের তারিখ যাহাই হউক না কেন নিযুক্ত পুলিশ প্রধানের অফিসের মেয়াদ অন্যন দুই বছর এবং অনুর্ধ তিন বছর হইবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত পুলিশ প্রধান পদাধিকারবলে বিভিন্ন আইন বা বিধিমতে সরকারের সচিবকে প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ এই অধ্যাদেশ ও অন্য আইনে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও তদুর্ধ পদসমুহে পুলিশ অফিসার নিয়োগ বা বদলী করিবেন।

(৫) সরকার পুলিশ প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক, সিনিয়র পুলিশ সুপার ও পুলিশ সুপার পদে পুলিশ অফিসার নিয়োগ বা বদলী করিবেন।

(৬) পুলিশ প্রধানের সাময়িক অনুপস্থিতিকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম পুলিশ অফিসার পুলিশ প্রধানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগসহ তাঁহার সকল কর্তব্য, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম• াদন করিতে পারিবেন।

(৭) জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক পুলিশ প্রধান পদের জন্য তালিকা প্রণয়ন এই অধ্যাদেশের চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী করা হইবে।

(৮) নিম্ন বর্ণিত যে কোন ক্ষেত্রে সরকার জাতীয় পুলিশ কমিশনের সম্মতিক্রমে কারণ সম্বলিত লিখিত আদেশবলে পুলিশ প্রধানকে তাঁহার মেয়াদ পুর্ণ হওয়ার পুর্বে বদলী বা অপসারণ করিতে পারিবেন-

(ক) ব্যক্তিগত কারণে প্রদত্ত তাঁহার স্বে" ছাপ্রণোদিত দরখাস্তের ভিত্তিতে; অথবা

(খ) আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হইলে; অথবা

(গ) সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বা অন্য কোন প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী তাঁহার বরখাস্ত, অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর বা পদাবনতি হইলে।

চলমান পাতা...১০

Scanned with CamScanner

৮। (১) সরকার কর্তৃক পুলিশ প্রধানের সহিত সুপারিশক্রমে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন পদে নির্ধারিত সংখ্যক পুলিশ সদস্য সমন্বয়ে পুলিশ সার্ভিস গঠিত হইবে এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত সংগঠন, ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুলিশ সার্ভিসের অন্তর্গত হইবে। সরকার কর্তৃক সৃজিত পুলিশ সার্ভিসের পদসমূহ স্থায়ী পদ হিসাবে গন্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ জারীর এক বৎসরের মধ্যে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার পুলিশ সার্ভিসের জন্য বিশেষ ভাতাদি নির্ধারণ করিবেন।

(৩) কনস্টেবল, সার্জেন্ট ও সহকারী পুলিশ সুপার এই তিন পদে পুলিশ সার্ভিসে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।

(৪) সহকারী পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে হইবে। সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গঠিত প্রাক-নিয়োগ নির্বাচনী পরিষদের সম্মুখে প্রার্থীদের সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের সময় পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসারকে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রন জানানো হইবে।

(৫) সংশিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী স্ব" ছ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামুলক নির্বাচনী/বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কনস্টেবল ও সার্জেন্ট পদে লোক নিয়োগ করা হইবে।

৯। **কর্মের ভিত্তিতে পুলিশ সংগঠিত হইবে-**

ধারা ৬ অনুসারে গঠিত পুলিশ সার্ভিস পুলিশ প্রধানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাসম্ভব কর্মের ভিত্তিতে ডিভিশন, বিভাগ, অধিদপ্তর, ব্যুরো, শাখা, ইউনিট, সেকশন ইত্যাদি হিসাবে সংগঠিত হইবে।

১০। **পুলিশের তত্ত্বাবধান-**

(১) পুলিশ সার্ভিসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। তবে এই অধ্যাদেশের বিধানের সহিত সংগতিহীনভাবে সরকার কোন ব্যক্তি, কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ বা আদালতকে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ন্ত্রন করিবার ক্ষমতা দিবে না।

(২) পুলিশী তদন্ত ও অন্যান্য আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কর্মকান্ড, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, পদায়ন বা অন্য কোন পুলিশী কর্মকান্ডে বেআইনীভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) পুলিশ সার্ভিস কঠোরভাবে সংবিধান ও আইন মোতাবেক তাহাদের কর্তব্য সম্॰ াদন করিতেছে কেবল ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য উপধারা (১) এ প্রদত্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে।

(৪) কোন সরকারী সংস্থা বা কর্মকর্তা কর্তৃক পুলিশের প্রতি কৃত অনুরোধ আইনসম্মত কিনা তাহা দেখার দায়িত্বও উপধারা (১) এ প্রদত্ত তত্ত্বাবধান কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চলমান পাতা...১১

Scanned with CamScanner
CamScanner

১১। পুলিশ প্রশাসন-

(১) এ অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে পুলিশ সার্ভিসের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসন, অর্থ, মানব সম্• দ, বদলী, দেশের ভিতরে বা বাহিরে প্রেষণে নিয়োগ, বৈদেশিক সহযোগিতা ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কর্মকান্ডের সহিত সম্• র্কিত বিষয়াবলী পুলিশ প্রধানের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) বলবৎ যে কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানে যাহাই থাকুক না কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, প্রোটোকল ও প্রোটেকশন ডিপার্টমেন্ট বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ইউনিটের জন্য সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে উক্ত প্রতিটি ইউনিটের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৩) পুলিশ প্রধান, পুলিশের মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, উপ-মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক, সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ ও বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধান মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্ম সম্• াদন করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) এ উল্লেখিত পুলিশ অফিসারগণ দক্ষভাবে পুলিশের কাজকর্ম সম্• াদনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ অথবা ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নয় এমন স্থায়ী (Standing) আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

১২। **ইউনিট প্রধানের অফিসের মেয়াদ-** এই অধ্যাদেশে সংজ্ঞায়িত বিভিন্ন ইউনিট, রেঞ্জ, জোন এবং অন্যান্য সাংগঠনিক বা এলাকাভিত্তিক ইউনিট প্রধান এবং ধারা ৭, ১১, ১৪, ১৬, ২১ ও ২৪ এর অধীনে পোষ্টিং প্রাপ্তদের অফিসের মেয়াদ পদে যোগদানের তারিখ হইতে অন্যূন দুই বৎসর এবং অনুর্ধ তিন বৎসর হইবে।

তবে উপরোক্ত যে কোন অফিসারকে তাঁহার নিম্নতম মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে নিম্নরূপ ক্ষেত্রে বদলী করা যাইবে-

(ক) স্বে" ছা প্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত কারণে প্রদত্ত তাঁহার দরখাস্তের ভিত্তিতে; অথবা

(খ) উ" চতর পদে পদায়ন বা পদোন্নতি হইলে; অথবা

(গ) আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হইলে; অথবা

(ঘ) সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বা অন্য কোন প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী তাঁহার বরখাস্ত, অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর বা পদাবনতি হইলে; অথবা

(ঙ) উপরোক্ত বিধি অনুসারে সাময়িক বরখাস্ত হইলে; অথবা

(চ) শারীরিক, মানসিক রোগ বা অন্য কোন কারণে তিনি কর্তব্যকর্ম পালনে অসমর্থ হইলে।

১৩। **আইন উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ-**

(১) পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে, পুলিশ প্রধান বা কোন ইউনিট প্রধানকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য, সরকার এক বা একাধিক আইন উপদেষ্টা (প্যানেল আইনজ্ঞ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত) এবং অর্থ উপদেষ্টা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিবেন।

Scanned with CamScanner
CamScanner

(২) সরকার, পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে, পুলিশ প্রধান বা কোন ইউনিট প্রধানকে সাংগঠনিক, পরিচালন ও তদন্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের ভিতর বা বাহির হইতে যে কোন বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, উপযুক্ততা ও চাকুরীর শর্তাবলী এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

১৪। **পুলিশ রেঞ্জ ইত্যাদিঃ-**

পুলিশের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসার রেঞ্জ প্রধান হইবেন। তিনি রেঞ্জের প্রশাসন তদারকি করিবেন এবং পুলিশ প্রধান অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিবেন।

১৫। **জিলা পুলিশ প্রধান-**

প্রতিটি জিলার পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব জিলা পুলিশ প্রধান এর উপর ন্যস্ত হইবে এবং তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা / কর্মচারী থাকিবে। জিলা পুলিশ প্রধান ন্যূনতম পুলিশ সুপার পদমর্যাদার হইবেন।

১৬। **জিলা পুলিশ প্রধানের পোষ্টিং-**

(১) সরকার সাধারণতঃ পুলিশ প্রধানের সুপারিশ মোতাবেক জিলা পুলিশ প্রধান পদে বদলী করিবেন। তবে পুলিশ প্রধানের সুপারিশের সহিত একমত পোষণ না করিলে সরকার উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিশ প্রধানের নিকট আরেকটি মনোনয়ন চাইবেন।

(২) পর পর তিনটি মনোনয়ন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত দ্বিমত পোষণ করিলে উহা জাতীয় পুলিশ কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য সরকার বা পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রেরিত হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

CamScanner

১৭। **জিলা পুলিশ প্রশাসন-**

(১) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে ধারা ১৬ অনুসারে নিযুক্ত জিলা পুলিশ প্রধান একটি জিলার সার্বিক পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে থাকিবেন।

(২) জিলা পুলিশ প্রধান তাঁহার যে কোন ক্ষমতা বা কাজ একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ সুপারকে অর্পন করিতে পারিবেন।

১৮। **মেট্রোপলিটন এলাকা, বৃহৎ নগর এলাকা ও অন্যান্য প্রজ্ঞাপিত এলাকার পুলিশ প্রশাসন-**

মেট্রোপলিটন এলাকা, বৃহৎ নগর এলাকা ও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য এলাকার পুলিশ প্রশাসন এই অধ্যাদেশের পঞ্চম অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুসারে পরিচালিত হইবে।

১৯। **তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধানের পোষ্টিং-**

(১) কোন জিলার তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধান ন্যুনপক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার হইবেন এবং তিনি জিলা পুলিশ প্রধানের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবেন।

(২) বলবৎ যে কোন আইনে ৭ (সাত) বৎসরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য এমন অপরাধ সম্পর্কিত সকল মামলার তদন্ত জিলার তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধানের তত্ত্বাবধানে তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা কর্তৃক করা হইবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্ত বিভাগের মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধান এইরূপ তদন্ত পরিচালনা করিবেন।

২০। **তদন্ত খরচ এবং পুল, ফেরী ও রাস্তার টোল বা পথশুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি-**

(১) প্রতিটি তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যয়িত খরচ মিটানোর জন্য সরকার কর্তৃক পুলিশ প্রধানকে পর্যাপ্ত ফান্ড/অর্থ সরবরাহ করা হইবে।

(২) বলবৎ অন্যান্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক কোন পুল, ব্রিজ, ফেরী বা রাস্তা ব্যবহারের জন্য আরোপিত ও আদায়যোগ্য টোল বা পথশুল্ক হইতে পুলিশের যানবাহনসমূহ অব্যাহতি পাইবে।

২১। **স্পেশাল ব্রাঞ্চ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ ইত্যাদি-**

(১) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের সকল প্রকার নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, গবেষণা, তুলনামুলক বিশ্লেষন ও উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্পেশাল ব্রাঞ্চ নামে একটি গোয়েন্দা বিভাগ সরকার কর্তৃক সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা হইবে। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে স্পেশাল ব্রাঞ্চ সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(২) সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের মহাপরিচালক বা প্রধান হিসাবে এবং তাঁহাকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্য নিয়োগ করিবে।

চলমান পাতা...১৪

Scanned with CamScanner

(১) সরকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ/সিআইডি নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিবে,যাহা আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, গুর" তর অপরাধ, বিশেষায়িত তদন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে এমন সব অপরাধ এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপিত/ঘোষিত অন্যান্য গুর" তর অপরাধ এবং আদালত এবং পুলিশ প্রধান কর্তৃক বিশেষভাবে নির্দেশিত অপরাধসমূহ তদন্ত করিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি এর প্রধান হিসাবে এবং তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে।

(৫) বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন সিআইডি বা অপরাধ তদন্ত বিভাগের নিম্নবর্ণিত বিশেষ অপরাধ সমূহের তদন্ত করিবার কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকিবে এবং এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগে বিভিন্ন বিশেষ ইউনিট থাকিবে:

ক) ইন্টারনেট বা সাইবার অপরাধ, (খ) সংঘবদ্ধ (Organised) অপরাধ, (গ) সন্ত্রাসমূলক অপরাধ, (ঘ) নরহত্যা সম্পর্কিত অপরাধ, (ঙ) মানব পাচার সংক্রান্ত অপরাধ, (চ) অর্থ-সংক্রান্ত অপরাধ, (ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত অপরাধ এবং (জ) সরকার বা পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নুতন ধরণের বা অন্য কোন প্রকার অপরাধ যাহা তদন্ত করিতে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন।

(২) অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি এর মহাপরিচালক ও তদন্তকারী অফিসারদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন উপদেষ্টা, অপরাধ বিশ্লেষক ও প্রাসংগিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইবে।

২২। **পুলিশের চিকিৎসা সুবিধা-** পুলিশ সদস্যগণ ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে ।

২৩। **কারিগরী ও সহায়ক সার্ভিস-**

পুলিশ সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার পুলিশ প্রধানের সার্বিক নিয়ন্ত্রনে পৃথক তথ্য, যোগাযোগ ও টেলিকম সার্ভিস সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিবে।

চলমান পাতা...১৫

Scanned with CamScanner
CamScanner

২৪। **পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানের পোষ্টিং-**

(১) সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শ ও জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে পুলিশ ষ্টাফ কলেজের রেক্টর হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(২) পুলিশ প্রধানের পরামর্শ ও জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির মহাপরিচালক পদে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করিবে।

(৩) সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত আলোচনা পূর্বক পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজ, স্কুল বা কেন্দ্রের পরিচালক পদে অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ প্রদান করিবে।

২৫। **অন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে বদলী-** এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে যে কোন পুলিশ অফিসারকে অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে বদলী করিতে পারিবে। সরকার ও পুলিশ প্রধানের মধ্যে দ্বিমত হইলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি জাতীয় পুলিশ কমিশনে প্রেরিত হইবে।

২৬। **জুনিয়র র‍্যাংকে নিয়োগ-**

(১) জিলার ক্ষেত্রে জিলা পুলিশ প্রধান এবং অন্যান্য ইউনিটের ক্ষেত্রে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ সহকারী ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হইবেন।

(২) পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক হইবেন ইন্সপেক্টর পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

২৭। **শপথ-** নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক পুলিশ সদস্য পুলিশ প্রধান বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পুলিশ প্রধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পুলিশ অফিসারের সম্মুখে দ্বিতীয় তফসীলে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে শপথ বাক্য পাঠ ও স্বাক্ষর করিবেন।

২৮। **নিয়োগ পত্র -**

(১) জুনিয়র পদের প্রত্যেক পুলিশ সদস্য নিয়োগের সময় তৃতীয় তফসীলে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে একটি নিয়োগ পত্র পাইবেন, যাহা পুলিশ প্রধানের সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের সহিমোহরে ইস্যু হইবে।

(২) সার্টিফিকেটে উল্লেখিত নামের পুলিশ অফিসার যখন আইনগতভাবে পুলিশ সার্ভিসের সদস্যপদ হারাইবেন তখন হইতে তাঁহার নিয়োগ পত্রটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চলমান পাতা...১৬

Scanned with CamScanner

২৯। পুলিশ অফিসারগণের পদোন্নতি পদ্ধতি-

(১) মেধা, জ্যেষ্ঠতা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের গ্রেডিং, সুনাম, সততা, দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা ও চতুর্থ তফসীলে বর্ণিত অন্যান্য বিষয় পুলিশ সার্ভিসের সিনিয়র পদ সমূহে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) পঞ্চম তফসীলে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাছাই বা পদোন্নতি বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে বিবেচিত হওয়া ব্যতীত সিনিয়র পদে নিয়োগ বা পদোন্নতি দেওয়া যাইবে না।

(৩) প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসারে জুনিয়র পদসমূহে পদোন্নতি দেওয়া হইবে।

৩০। পুলিশের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা পলিসি-

(১) জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে সকল র‍্যাংক বা পদের পুলিশ সদস্যের জন্য একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা হইবে। সকল পুলিশ সদস্য যেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ডের ভিত্তিতে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই নীতি যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং সদস্যদের চাকুরী জীবনের উন্নতির পরিকল্পনা ও ধারাক্রমের সহিত এই নীতির সং্যুক্ততা থাকিবে।

(২) চাকুরী জীবনে অগ্রগতির সাথে সাথে যথোপযুক্ত শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে একটি চাকুরী সংস্কৃতি বিনির্মাণ এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে।

(৩) পুলিশ প্রধান বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে পুলিশ কর্মকর্তা/সদস্যগন উ" চতর ডিগ্রী অর্জন করিতে পারিবে।

৩১। সাসপেনশন বা সাময়িক বরখাস্ত-

(১) প্রযোজ্য বিধি সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের তাঁহার অধীনস্ত কোন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোনো পুলিশ অফিসার সাময়িক বরখাস্ত হইলে তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা অকার্যকর থাকিবে।

প্রকাশ থাকে যে সাময়িক বরখাস্তকৃত পুলিশ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে না, বরং তিনি বরখাস্ত না হইলে যে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকিতেন সাময়িক বরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই কর্তৃপক্ষেরই নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

৩২। পুলিশ প্রধানের সাধারন ক্ষমতা-

এই অধ্যাদেশ ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে পুলিশ প্রধান, ইউনিট প্রধান ও জিলা পুলিশ প্রধান তাহাদের স্বীয় কর্তৃত্বাধীন ক্ষেত্রে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, বদলী, পদোন্নতি, অস্ত্রশস্ত্র, ব্যায়াম, শৃঙ্খলা, পোষাক পরি" ছদ, কর্ম-বন্টন এবং তাহদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ সদস্যদের দক্ষতার সহিত কর্তব্য সং পাদন সং র্কিত অন্য কোন বিষয় পরিচালনা, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

চলমান পাতা...১৭

Scanned with CamScanner

৩৩। **পুলিশ প্রধান ও ইউনিট প্রধানগণের "পুলিশ হিসাব" সম্পর্কিত ক্ষমতা-**

(১) পুলিশ ইউনিটগুলির সহিত সম্পৃক্ত হিসাব সম্পর্কিত সকল বিষয় তদন্ত ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা পুলিশ প্রধান ও ইউনিট প্রধানগণের থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি উক্ত তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের আদেশ নির্দেশ মানা করিতে এবং যুক্তিযুক্ত সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(২) পুলিশ প্রধান ও ইউনিট প্রধানগণের হিসাব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও মহাহিসাব নিরীক্ষকের পুলিশ হিসাব নিরীক্ষা করিবার ক্ষমতা অটুট থাকিবে।

৩৪। **স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ-**

(১) অপর্যাপ্ত জনবলের ক্ষেত্রে বিশেষ সময়ের জন্য জিলা পুলিশ প্রধান বা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত যে কোন পুলিশ অফিসার স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত একজন স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগকালে (ক) নির্ধারিত ফরমে একটি সার্টিফিকেট পাইবেন; এবং (খ) তিনি তাঁহার সম পদমর্যাদার সাধারণ পুলিশ অফিসারের মত সকল সুযোগ সুবিধা, দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন এবং একই কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকিবেন।

৩৫। **অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ-**

(১) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে জিলা পুলিশ প্রধান তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে নির্দিষ্ট র‍্যাংক/পদে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং কি উদ্দেশ্যে তাহাদের নিয়োগ করা হইল তাহা তাহাদের নিয়োগ আদেশে উল্লেখ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার (ক) পুলিশ প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে একটি ছাড়পত্র পাইবেন, (খ) একই পদের পুলিশ অফিসারের মত সকল সুযোগ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং (গ) জিলা পুলিশ প্রধানের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তির অনুরোধে তাহার যুক্তিগ্রাহ্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ ও উহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে এই নিয়োগের খরচ আদায়যোগ্য হইবে।

৩৬। **প্রশিক্ষণ রিজার্ভ-**

বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালানো এবং যে কোন প্রাণঘাতি দুর্ঘটনার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিচালন ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে পুলিশ সার্ভিসে সর্বদা সকল পদে অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত ১০% জনবল থাকিবে।

চলমান পাতা...১৮

Scanned with CamScanner
CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় পুলিশ কমিশন

৩৭। **প্রতিষ্ঠা-** পদাধিকারবলে নিযুক্ত চেয়ারপারসনসহ ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৩৮। **সদস্য নির্বাচন/মনোনয়ন -** (১) জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্যগণ নিম্নরূপে মনোনীত/নির্বাচিত/নিযুক্ত হইবেন-

(ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার সহিত পরামর্শক্রমে ৪ (চার) জন সংসদ সদস্য মনোনীত করিবেন । তন্মধ্যে ২ (দুই) জন সরকারী দলের ও ২ (দুই) জন বিরোধী দলের হইবেন।

(খ) রাষ্ট্রপতি জাতীয় সিলেকশন প্যানেল কর্তৃক সুপারিশকৃত ৬ (ছয়) জনের তালিকা হইতে ৪ (চার) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মনোনীত করিবেন (পরবর্তীতে নিরপেক্ষ সদস্য হিসাবে অভিহিত)। মনোনীত উক্ত ৪(চার) জনের মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা এবং ১ (এক) জন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা হইবেন ।

(গ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং

(ঘ) পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব।

(২) উপধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন জাতীয় সংসদ না থাকা অবস্থায় নিরপেক্ষ সদস্যগণ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও পুলিশ প্রধান সমন্বয়ে জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠিত হইবে।

(৩) জাতীয় পুলিশ কমিশন সদস্যদের নিয়োগ প্রজ্ঞাপন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

৩৯। **চেয়ারপারসন নিয়োগ-**

(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পদাধিকারবলে জাতীয় পুলিশ কমিশনের চেয়ারপারসন হইবেন।

(২) কমিশনের সকল সভায় চেয়ারপারসন সভাপতিত্ব করিবেন।

৪০। **চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতি-**

চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে জাতীয় পুলিশ কমিশন ইহার সদস্যদের মধ্য হইত একজনকে কমিশনের সভার সভাপতি নির্বাচন করিবে।

৪১। **নিরপেক্ষ সদস্য নির্বাচন-**

(১) কমিশনের ৪ (চার) জন নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে নামের তালিকা প্রণয়নের নিমিত্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় সিলেকশন প্যানেল থাকিবে, যাহার চেয়ারপারসন হইবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল হইবেন অন্য দুইজন সদস্য।

চলমান পাতা...১৯

Scanned with CamScanner

(২) ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সদস্যের নামের তালিকা প্রণীত হইবে।

(৩) জাতীয় সিলেকশন প্যানেল কর্তৃক নির্বাচনী বা বাছাই প্রক্রিয়া শুর" র ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা সম্• ন্ন করিতে হইবে।

(৪) নিরপেক্ষ সদস্যগণ নিখুঁত চরিত্র, সততা ও প্রমাণিত/প্রতিষ্ঠিত পেশাগত দক্ষতার অধিকারী হইবেন।

৪২। **সিলেকশন প্যাণেলের কর্মপদ্ধতি-**

স্ব" ছ পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সদস্য বাছাই করিবার জন্য সিলেকশন প্যাণেল ইহার নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করিবে। নির্বাচন/ মনোনয়ন করিবার পর প্যাণেল নামগুলি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। **নিরপেক্ষ সদস্যদের নির্বাচন/বাছাই করিবার মাপকাঠি-**

কোন ব্যক্তি জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন যদি -

(ক) তিনি নিয়োগপূর্ব ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রতিনিধি বা জনসেবক থাকেন; বা

খ) তিনি দেওলিয়া, ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হন; বা

(গ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন; বা

(ঘ) তিনি বাংলাদেশের সেবায়/চাকুরীতে (শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ব্যতীত) একটি লাভজনক পদে থাকেন; বা

(ঙ) তিনি চাকুরীরত থাকেন কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় বা সরকারী মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থায় বা যাহাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশ বা স্বার্থ আছে এমন কোন সংস্থায় (শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ব্যতীত);

(চ) তিনি দুর্নীতি বা অন্য কোন অসদাচরণের কারণে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হন; বা

(ছ) তিনি ফৌজদারী অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হন; বা

(জ) ইহাতে তাহার কোন স্বার্থের সংঘাত ঘটে বা থাকে।

৪৪। **জাতীয় পুলিশ কমিশনের কার্যাবলী-**

(১) জাতীয় পুলিশ কমিশন এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে ইহার কর্তব্য সম্• াদনের মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিবে এবং পুলিশি ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহনে সহায়তা করিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত ভূমিকা কোনরূপ ক্ষুন্ন না করিয়া জাতীয় পুলিশ কমিশন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্• াদন করিবেঃ

(ক) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পুলিশ প্রধান হিসাবে নিয়োগের জন্য অতিঃ আইজিপির নিম্ন পদস্থ নয় এমন পাঁচজন কর্মকর্তার মধ্যে সরকারের নিকট তিনজন পুলিশ অফিসারের একটি প্যাণেল সুপারিশ করা;

চলমান পাতা...২০

Scanned with CamScanner
CamScanner

(খ) ধারা ৭ ও ১২ তে বর্ণিত কারণ ব্যতীত পুলিশ প্রধান ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের দুই বৎসরের স্বাভাবিক মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে সরকারের নিকট কারণ উল্লেখ পূর্বক তাঁহাদের বদলীর সুপারিশ করা; উল্লেখ্য যে এইরূপ সুপারিশ করিবারপূর্বে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হইবে;

(গ) বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তদারকি করা;

(ঘ) প্রকাশনার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসের মধ্যে প্রত্যেক পুলিশ ইউনিট হইতে নির্ধারিতভাবে একটি সাধারণ প্রতিবেদন জাতীয় পুলিশ কমিশনে প্রেরণ করণ নিশ্চিত করা;

(ঙ) নিম্নরূপ তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকার ও সংসদের নিকট পেশ করা

(অ) কমিশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ;
(আ) ইউনিটগুলির কর্মকান্ডের একটি প্রতিবেদন;
(ই) দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর একটি প্রতিবেদন।

(চ) পুলিশ, ফৌজদারী মামলা র" জুকরণ, কারাগার এবং প্রবেশন বিষয়ক আইন ও কার্যবিধির, আধুনিকায়ন ও সংস্কারের সুপারিশ করা;

(ছ) পুলিশ নীতি নির্ধারনী গ্র" পের প্রস্তাবাবলী বিবেচনা করিয়া সরকার সমীপে সুপারিশ পেশ করা।

৪৫। জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্যের মেয়াদ-

(১) একজন সদস্যের সদস্যপদের মেয়াদ হইবে ৪ বৎসর যদি না তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ইস্তফা প্রদান করেন বা পদ হইতে অপসারিত হন।

(২) কোন সদস্যই দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) কমিশনের সভায় উপস্থিতির জন্য বিধিমতে সদস্যদের ভ্রমনভাতা ও মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৪) বিধি অনুযায়ী নিরপেক্ষ সদস্যদের সম্মানী প্রদান করা হইবে।

(৫) এই অধ্যাদেশে যাহা বর্ণিত আছে তাহার অতিরিক্ত কোন ভাতা, সুযোগ সুবিধা বা সেবা পুলিশ কমিশন সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। পুলিশ কমিশনের সদস্যগণ এই অধ্যাদেশ বা এতদসংক্রান্তে প্রণীত বিধিতে বর্ণিত সুবিধাদি ব্যতীত কোনো গাড়ী বা সুবিধাদি পুলিশ সার্ভিস হইতে গ্রহন করিবেন না।

(৬) বিধি সাপেক্ষে কোন বিশেষ কাজের জন্য বা পুলিশ ব্যবস্থাপনায় বা পুলিশী ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কমিশনের যে কোনো সদস্যকে বিশেষ ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

৪৬। সদস্যদের অপসারণ-

নিম্ন বর্ণিত কারণে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সিদ্ধান্তানুযায়ী জাতীয় পুলিশ কমিশনের কোন সদস্যকে অপসারণ করা যাইবেঃ

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব না থাকিলে;
খ) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা অসুস্থতায় ভুগিলে;
(গ) অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে;
(ঘ) কমিশনে উপস্থাপিত কোন বিষয়ে তাঁহার স্বার্থ থাকার বিষয় গোপণ করিলে;

চলমান পাতা...২১

Scanned with CamScanner
CamScanner

(ঙ) ফৌজদারী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হইলে;

(চ) দেউলিয়া বা ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হইলে;

(ছ) কমিশনের সুখ্যাতি নষ্ট করিলে বা দুর্নাম করিলে;

(জ) কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে।

৪৭। **সভার মাধ্যমে কার্য পরিচালনা-**

(১) জাতীয় পুলিশ কমিশনের কাজকর্ম সভার মাধ্যমে পরিচালনা করা হইবে।

(২) চেয়ারপারসন কর্তৃক অথবা তিন জন সদস্যের তলবানায় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৩) কমিশনের অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতি সভার কোরাম পুর্ণ করিবে।

(৪) কার্যসূচীসহ অন্ততঃপক্ষে এক সপ্তাহের নোটিশ দিয়া প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন সময় আহ্বানকৃত সভায় সদস্যগণ উপস্থিত থাকিবেন। তবে প্রতি তিন মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি সভা হইতে হইবে এবং ন্যূনপক্ষে ২৪ ঘন্টার স্বল্প নোটিশে জর" রী সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৫) কোন বিষয়ে সদস্যদের ভোট সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইলেই কেবল চেয়ারপারসন স্বীয় ভোট প্রয়োগ করিবেন, অন্যথায় নয়।

(৬) কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহমেজরিটি (Majority) ভোটেই গৃহীত হইবে।

(৭) পুলিশ কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী জনগণের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে।

(৮) বিশেষ কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য কমিশন যে কোন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৯) স্বীয় কার্যাদি পরিচালনার জন্য পুলিশ কমিশন ইহার কার্যবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৮। ধারা ৬৯ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ গবেষণা ব্যুরো জাতীয় পুলিশ কমিশনের সচিবালয় হিসাবে কাজ করিবে।

চলমান পাতা...২২

Scanned with CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

মেট্রোপলিটন ও নগর (Urban) পুলিশি ব্যবস্থা

৪৯। মেট্রোপলিটন পুলিশ সংগঠন প্রতিষ্ঠা-

সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন মেট্রোপলিটন এলাকা বা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে গুর" ত্বপুর্ণ বৃহৎ নগর এলাকার জন্য বিদ্যমান মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনের মত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫০। আইন ও অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ-

সরকার প্রত্যেক পুলিশ কমিশনারকে অর্থ ও আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অর্থ উপদেষ্টা এবং এক বা একাধিক আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫১। জন জীবন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আসন্ন বিপদ বা ভয়ভীতি প্রতিরোধ-

জন জীবন ও সম্‌ দ এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি আসন্ন বিপদ বা ভয়ভীতি প্রতিরোধকল্পে কমিশনার বা অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার কোন পুলিশ অফিসার জীবানুভিত্তিক (Biological), রাসায়নিক বা অন্য কোন বিপজ্জনক দ্রব্যের দখলদার বা নিয়ন্ত্রনকারী ব্যক্তিকে স্‌ ষ্টভাবে বর্ণিত কোন কাজ করা বা না করার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

৫২। বিশেষ আমর্ড পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা- সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত আলোচনা-পরামর্শক্রমে দাঙ্গা বা উশৃঙ্খল জনতা নিয়ন্ত্রন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রয়োজনে দাঙ্গা পুলিশ স্কোয়াডসহ বিভিন্ন আমর্ড পুলিশ ইউনিট গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদানসহ মানবাধিকারের প্রতি সম্মান সুচক ও আইন সংগত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৫৩। রাস্তায় সন্দেহজনক ব্যক্তি বা যানবাহন তলাশী করার ক্ষমতা-

যখন কোন পুলিশ অফিসার এইরূপ সন্দেহ করিবে যে কোন রাস্তায় বা গণবিনোদনস্থলে কোন ব্যক্তি বা যানবাহন এমন কোন দ্রব্য বহন করিতেছে যাহা বেআইনীভাবে প্রাপ্ত বা দখলকৃত অথবা যাহা কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইতে পারে তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বা যানবাহনে তল্লাশী করিতে পারিবেন, এবং যদি ঐ ব্যক্তি বা ঐ যানবাহন দখলকারীর বক্তব্য তাহার নিকট মিথ্যা বা সন্দেহজনক মনে হয় তবে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ দ্রব্য আটক করিয়া নির্ধারিত ফরমে একটি রশিদ ইস্যু করিবেন এবং ঐ ঘটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাইবেন যিনি ঐ ব্যক্তির বির" দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করিবেন।

চলমান পাতা...২৩

Scanned with CamScanner

৫৪। **জর" রী সাড়া প্রদান ব্যবস্থা-** ধারা ৪৯ এর অধীনে ঘোষিত প্রত্যেক এলাকার জন্য সরকার যথেষ্ট যোগাযোগ সুবিধা, টহল গাড়ীর নেটওয়ার্ক ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নে সুসজ্জিত একটি নিয়ন্ত্রন কক্ষ স্থাপন করিবে, যাহা দ্র" ততম গতি ও সর্বো" চ দক্ষতার সহিত যে কোন জর" রী অবস্থা মোকাবেলা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিবে।

৫৫। **দাঙ্গা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কীম-** সরকার বা পুলিশ প্রধানের নির্দেশনায় পুলিশ কমিশনার দাঙ্গা নিয়ন্ত্রন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক স্কীম প্রণয়ন করিবেন এবং নিয়মিতভাবে উহা হালনাগাদ করিবেন।

৫৬। **পুলিশী ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহন-**

(১) পুলিশী ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করিবার জন্য পুলিশ কমিশনার প্রতি এলাকা বা এলাকাসমূহ, কলোনী বা বস্তিসমূহের জন্য নির্ধারিত সময়ের জন্য "নাগরিক পুলিশী কমিটি" গঠন করিবেন। এই কমিটিতে ঐ এলাকার অধিবাসীদের মধ্য হইতে সকল স্তর, পেশা ও নারী প্রতিনিধিত্বকারী উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য থাকিবে। সদস্যগণ প্রশ্নাতীত সততা ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হিসাবে এলাকায় সুপরিচিত থাকিবেন এবং জন নিরাপত্তার প্রতি তাঁহাদের অবিচল আগ্রহ, প্রতিশ্র" তি ও দায়বদ্ধতা থাকিবে। এই কমিটির উদ্দেশ্য হইবে জনগণের জীবন, সম্• দ, মান সম্মান রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ ও ইহার উন্নতি বিধান।

(২) নাগরিক পুলিশী কমিটির সহায়তায় পুলিশ ঐ এলাকায় বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সমস্যাবলী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করিবে এবং পুলিশী কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং এইরূপ অন্য কোন নির্ধারিত কার্য্য সম্• াদনে কমিটির সম্• ৃক্ততা ও সহায়তা নিশ্চিত করিবে।

(৩) নাগরিক কমিটির মাধ্যমে পুলিশ নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিতভাবে পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্• র্কে জনগণকে অবহিত করিবে এবং এই দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে পুলিশী ব্যবস্থা সম্• র্কে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(৪) অন্ততঃপক্ষে তিন মাসে একবার এবং প্রয়োজনে আরো ঘন ঘন এই নাগরিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাগন ও এই সভাগুলিতে উপস্থিত থাকিবেন।

৫৭। **উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুলিশের পরামর্শ-**

কোন এলাকায় বড় ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা (যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা রাস্তাঘাট, ব্রিজ নির্মাণ(ট্যুরিষ্ট রিসর্ট) গ্রহনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই পুলিশ কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিবেন । পুলিশ কমিশনার এলাকার নিরাপত্তা বিধান, চলাচল ব্যবস্থা ও অন্যান্য পুলিশী কর্মকান্ডের উপর ঐ সকল উন্নয়ন কাজের প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল ও প্রভাব নিরূপন করিবেন । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পুলিশ কমিশনারের এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহকে যথাযথ বিবেচনান্তে পরিকল্পনাসমূহ চূড়ান্ত করিবে।

চলমান পাতা...২৪

Scanned with CamScanner
CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ সমুহ

৫৮। পুলিশ প্রধান, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য জনশৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ সমহ্য মোকাবেলায় সাধারণ নির্দেশাবলী ও দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করিবেন।

৫৯। পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ইউনিট প্রধানগণ স্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনা (SOP) প্রণয়ন করিবেন।

৬০। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত স্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করা যাইবে।

৬১। **বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা গঠন-**

পুলিশ প্রধানের অনুরোধক্রমে সরকার কোন এলাকাকে বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, যদি ঐ এলাকার নিরাপত্তা বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, সশস্ত্র কর্মকান্ড বা সংগঠিত অপরাধ গ্র" প বা সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের কর্মকান্ডের কারণে বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। প্রকাশ থাকে যে, এইরূপ ঘোষণামূলক প্রজ্ঞাপন উহা জারীর ছয় মাসের মধ্যে সংসদে অথবা জারীর পর প্রথম সংসদে, যাহা আগে ঘটিবে, অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। আরো প্রকাশ থাকে যে সংসদ কর্তৃক অনুসমর্থিত না হইলে এইরূপ প্রজ্ঞাপন দুই বৎসরের বেশী সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে না।

৬২। পুলিশ প্রধান প্রত্যেক বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা বা বলয়ের জন্য উপযুক্ত আদেশ, নিয়ন্ত্রন ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্বলিত উপযুক্ত পুলিশ কাঠামো গঠন করিবেন।

৬৩। বিশেষ নিরাপত্তা এলাকায় কর্মরত পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক পালনীয় স্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনা সম্বলিত আদেশ পুলিশ প্রধান কর্তৃক জারী করা হইবে।

৬৪। সরকার পুলিশ প্রধানের সুপারিশক্রমে এবং কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন বিশেষ নিরাপত্তা এলাকায় কোন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বিষাক্ত, রাসায়নিক, জীবানু (Biological) বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ, উৎপাদন, বিক্রি, মজুদ বা হস্ত গতকরণ, বা অর্থায়ন বা যে কোন প্রকার প্রচারণা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে, যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে ঐ সকল দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, অর্থ ইত্যাদির ব্যবহার ঐ এলাকার অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও জন শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি স্বর" প।

চলমান পাতা...২৫

Scanned with CamScanner

৬৫। ধারা ৬৪ তে বর্ণিত কর্মকান্ড, যাহা অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বা জন শৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করিতে পারে, উহার নিয়ন্ত্রন এবং প্রতিরোধে কোন বিশেষ নিরাপত্তা এলাকার জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ প্রধান বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৬। **জনগনের অংশগ্রহন**

অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বা জন শৃঙ্খলার সমস্যাবলী কার্যকরভাবে মোকাবেলা করিতে জনগণ ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রধান নাগরিক পুলিশ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমস্যাবলী নিয়ন্ত্রন বা প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহন ও মানবাধিকার রক্ষাকল্পে দিক নির্দেশনা জারী করিতে পারিবেন।

চলমান পাতা...২৬

Scanned with CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন

৬৭। পুলিশ প্রধান যুগোপযোগী ও কার্যকর পুলিশ প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন করিবেন। পুলিশ ষ্টাফ কলেজ ও বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী পুলিশ সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ে স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবে।

৬৮। বিভিন্ন র‌্যাংক বা পদে পুলিশ সদস্যদের পদোন্নতি এবং বিভিন্ন দায়িত্বে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ফলাফল যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

৬৯। সরকার বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে একটি পুলিশ গবেষণা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যুরো পুলিশের কাজ সম্পাদনের মান ও দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষনা ও বিশ্লেষন করিবে। পুলিশী ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা ও গবেষণার জন্য পুলিশ প্রধান যে কোন খ্যাতি সম্পন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সহিত অর্থায়নসহ যে কোনো সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করিতে পারিবে।

৭০। **পুলিশ গবেষণা ব্যুরোর দায়িত্ব**

(ক) অত্র ব্যুরো পুলিশের যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, চিকিৎসা- আইন শাস্ত্র, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা পোষাক বা গিয়ার (Protective gears), দাপ্তরিক ও আবাসিক নিবাসন বা স্থাপনা এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পুলিশী ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ কর্ম- কৌশল ও পরিকল্পনা প্রনয়ন করিবে।

(খ) পুলিশ ব্যবস্থাপনা এবং চাকুরী জীবনের উন্নয়ন (Career Planing) সংক্রান্ত গবেষনা ;

(গ) বিদ্যমান পুলিশী ব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্পর্কে প্রস্তাব রাখা;

(ঘ) বিভিন্ন একাডেমী, প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সহিত সমন্বয় সাধন;

(ঙ) যে সকল যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি বা নিয়মাবলী সফলভাবে বিদেশী পুলিশ সংস্থাসমুহে প্রবর্তন করা হইয়াছে সেইগুলি বাংলাদেশ পুলিশের ক্ষেত্রে সংগতিপুর্ণভাবে প্রবর্তন করা যাইবে কিনা তাহা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

(চ) নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে পুলিশ সম্পর্কে জনগণের ধারণা/প্রতিচ্ছবির মুল্যায়ন এবং সেই সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া তাহা পুলিশ প্রধান ও সরকারের নিকট পেশ করা;

(ছ) জাতীয় পুলিশ কমিশনের স্থায়ী সচিবালয় হিসাবে কাজ করা; এবং

(জ) সরকার ও পুলিশ প্রধান কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা।

চলমান পাতা...২৭

Scanned with CamScanner

অষ্টম অধ্যায়

পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ

৭১। **পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা-** বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের বির" দ্ধে আনীত গুর" তর অভিযোগের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার "পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ"(অতঃপর অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বলিয়া অভিহিত) প্রতিষ্ঠা করিবে।

৭২। **কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ-**

মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রতি প্রতিশ্র" তিবদ্ধ এবং উন্নত সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্• ন্ন পাঁচ জন সদস্যকে লইয়া অভিযোগ কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যাহাদের সংগঠন নিম্ন র" প হইবে:

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা খ্যাতিসম্• ন্ন জাতীয় পর্যায়ে অবস্থান (National repute of standing) ও সুখ্যাতিসম্• ন্ন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি কমিশনের চেয়ারপারসন হইবেন;

(খ) পুলিশের মহাপরিদর্শক বা অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার;

(গ) সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব বা অতিরিক্ত সচিব; এবং

(ঘ) সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যাহাদের একজন মহিলা হইবেন।

৭৩। **সদস্য মনোনয়ন-**

(১) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্য মনোনয়নের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন প্যাণেল থাকিবে, যাহা নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম সদস্য, যিনি কমিশনের চেয়ারপারসন হইবেন।

(খ) দূর্নীতি দমন কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য; এবং

(গ) সরকারী কর্ম কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য।

(২) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সর্বো" চ ছয় মাসের মধ্যে সিলেকশন প্যানেল গঠিত হইবে এবং গঠনের এক মাসের মধ্যে উহা অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করিবে।

(৩) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কোন সদস্য পদ খালি হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব (সর্বো" চ তিন মাসের মধ্যে) শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে।

(৪) কমিশনের সদস্য নির্বাচনে/মনোনয়নে সিলেকশন প্যাণেল স্ব" ছতা অবলম্বন করিবে।

চলমান পাতা...২৮

Scanned with CamScanner

৭৪। অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্য মনোনয়নের মাপকাঠি ও শর্তাবলী-

(১) পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ যথেষ্ট জ্ঞান, পারদর্শী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইবেন।

(২) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্যদের নিয়োগ সার্বক্ষনিক বা খন্ডকালীন হইতে পারিবে।

(৩) কোন সদস্য তিন বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন না।

(৪) চেয়ারপারসন বা কোন সদস্য দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য উপযুক্ত হইবেন না।

৭৫। অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী-

(ক) জাতীয় পুলিশ কমিশন অথবা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হইতে কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে কাজে অবহেলা বা বাড়াবাড়ি বা অন্য কোন অসদাচরণ সম্বলিত লিখিত অভিযোগ গ্রহন।

(খ) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য অভিযোগ কর্তৃপক্ষ সাধারন মানের অভিযোগগুলি উপযুক্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করিবে এবং গুর" তর প্রকৃতির অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

(গ) রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা ইউনিট প্রধান হইতে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ধর্ষণ বা মারাত্মক আঘাত সম্ৎ র্কিত প্রতিবেদন গ্রহন এবং এইরূপ ঘটনা বা দুর্ঘটনার সাক্ষ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন। উল্লেখ থাকে যে, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু এবং ধর্ষন জনিত অপরাধ সম্ব্ল গোচরীভূত হওয়ায় সাথে সাথে অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে অবহিত করা সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের জন্য বাধ্যতামুলক ।

(ঘ) গুর" তর ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য একজন জিলা ও দায়রা জজকে নিয়োগ দানের জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা।

(ঙ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে উ" চতর র‍্যাংক বা পদের একজন পুলিশ অফিসারকে তদন্তকারী অফিসার হিসাবে নিয়োগ দিয়া তদন্ত প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করা।

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণ করিয়া তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহন এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্ৎ র্কে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করার জন্য যথাযথ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান।

(ছ) যথাশীঘ্র সম্ভব অভিযোগকারীকে তদন্তের ফলাফল সম্ৎ র্কে লিখিতভাবে অবহিত করণ।

(জ) অনু" ছদ (চ) অনুযায়ী প্রেরিত কোন তদন্ত প্রতিবেদনের উপর প্রদত্ত আদেশ সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে অভিযোগ কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশ প্রদানকারী অফিসারের পরবর্তী উ" চতর কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য প্রেরণ করিবে এবং প্রয়োজনে সর্বশেষ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে।

(ঝ) মিথ্যা, তু" ছ বা হয়রানিমলক মামলার/নালিশের জন্য নালিশকারীর বির" দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(ঞ) কোন তদন্তকারী অফিসারের বির" দ্ধে তদন্তকার্যে ই" ছাকৃত অবহেলা বা তদন্তকে ভুল পথে পরিচালনা করার জন্য তাহার বির" দ্ধে শৃঙ্খলাজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা।

(ট) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা / কর্মচারী অসদুপায় অবলম্বন বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোনো কার্য সম্ৎ াদন করিলে বা উদ্যোগ গ্রহন করিলে তাহার বির" দ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

Scanned with CamScanner

(ঠ) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন এবং তাহা সংসদে উপস্থাপন করার জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ। কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বা ব্যতিক্রমী বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিবে।

(ড) অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বিচারাধীন কোন বিষয়ের উপর কোন অভিযোগ গ্রহন করিবে না।

৭৬। **সাচিবিক সহায়তা** - পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অধীনে গঠিত শৃঙ্খলা শাখা অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে ইহার কার্য সম্পাদনে সকল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৭৭। **সদস্যদের অপসারণ-**

পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন ও সদস্যদের অপসারণের পদ্ধতি জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্যদের অনুরূপ হইবে।

৭৮। **অভিযোগকারীর অধিকার-**

(১) অভিযোগকারী কোন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ বিভাগীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ অথবা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ কর্তৃপক্ষ এমন কোন অভিযোগ গ্রহন করিবে না যাহার বিষয়বস্তু আদালত বা অন্য কোন কমিশনে পরীক্ষাধীন আছে।

(৩) বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে অভিযোগকারী তদন্তের যে কোন পর্যায়ে তাহা অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে পারিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ (অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ) তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করিবে। তদন্ত ও বিভাগীয় প্রসিডিং শেষে উহার উপসংহার ও গৃহীত চুড়ান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাশীঘ্র সম্ভব অভিযোগকারীকে অবহিত করা হইবে।

(৫) বিভাগীয় তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে অভিযোগকারী যদি এই কারণে অসন্তুষ্ট হয় যে তদন্তে তাঁহাকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ না দিয়া বিচার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নীতি লংঘিত হইয়াছে তাহা হইলে উপযুক্ত নির্দেশের জন্য তিনি অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

Scanned with CamScanner

৭৯। অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর অধিকার-

অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী উভয়েরই সমান অধিকার থাকিবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের পছন্দমত আইনী পরামর্শ গ্রহন করিতে পারিবেন।

৮০। পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী এজেন্সীর কর্তব্য-

(১) সকল পুলিশ অফিসার ও কর্তৃপক্ষ পুলিশ সদস্যদের অসদাচরণের অভিযোগসমূহ (যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে অভিযোগ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে যুক্তিযুক্ত প্রয়োজনে যেই সকল তথ্যাদি চাহিবে সকল পুলিশ ইউনিট প্রধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সী তাহা সরবরাহ করিবে।

(৩) আইনগত কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত কেহ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটাইলে বা খাটাইবার চেষ্টা করিলে তিনি জরিমানা বা সর্বোচ্চ এক বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮১। প্রশিক্ষণ বিষয়াবলী-

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত সদস্যগণকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে -

(ক) বিভাগীয় তদন্ত সংযুক্ত কৌশলগত ও আইনী বিষয়াবলী;

(খ) মানবাধিকার লংঘনের ধরণ সমুহ এবং

(গ) তাঁহাদের কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন আইন বা বিধি বিধান।

চলমান পাতা...৩১

Scanned with CamScanner
CamScanner

নবম অধ্যায়

আচরণ ও শৃঙ্খলা

৮২। **আচরণ বিধি-** (১) পুলিশ সদস্যের আচরণের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে পুলিশের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের নিমিত্ত পুলিশ প্রধান "আচরণ বিধি" জারী করিবেনঃ

(ক) চলাচলের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন ও তল্লাশী করার আইনগত ক্ষমতা;

(খ) থানা তল্লাশী ও সম্পদ জব্দ করা;

(গ) মানবাধিকার প্রতিপালন;

(ঘ) গ্রেফতার, আটকাবস্থা, চিকিৎসা ও ইন্টারভিউ এবং

(ঙ) পুলিশ অফিসার কর্তৃক ব্যক্তি সনাক্তকরণ।

৮৩। **পুলিশ ট্রাইবুনাল-**

কোন পুলিশ সদস্য ধারা ৮৭ এ বর্ণিত কোন অপরাধ বা এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কোনো বিধান লংঘন করিলে পুলিশ ট্রাইবুনালে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

৮৪। **পুলিশ ট্রাইবুনাল গঠন, ইত্যাদি-** (১) সিনিয়র র‍্যাংক অফিসারের অপরাধ বিচারের উদ্দেশ্যে পুলিশ ট্রাইবুনাল নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

(ক) অতিরিক্ত মহা- পুলিশ পরিদর্শক - চেয়ারপারসন; এবং

(খ) অন্যূন পুলিশ সুপার র‍্যাংকের একজন পুলিশ অফিসার - সদস্য।

প্রকাশ, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ সুপার বা সিনিয়র পুলিশ সুপার র‍্যাংকের হইলে (খ) অনুচ্ছেদের সদস্যের র‍্যাংক হইবে উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ র‍্যাংকের হয় তাহা হইলে (খ) অনুচ্ছেদের সদস্য হইবেন অতিরিক্ত মহা -পুলিশ পরিদর্শক এবং সিনিয়র অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক ট্রাইবুনালের চেয়ারপারসন হইবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত পুলিশ ট্রাইবুনাল, পুলিশ প্রধান কর্তৃক গঠিত হইবে এবং ট্রাইবুনালকে সহায়তা করিতে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ প্রধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সহকারী পুলিশ সুপার বা কোর্ট ইন্সপেক্টর নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) জুনিয়র র‍্যাংক অফিসারের অপরাধ বিচারের উদ্দেশ্যে পুলিশ ট্রাইবুনাল নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

(ক) সিনিয়র পুলিশ সুপার বা পুলিশ সুপার - চেয়ারপারসন; এবং

(খ) অন্যূন সহকারী পুলিশ সুপার - সদস্য।

পুলিশ প্রধান কর্তৃক এই ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে এবং ট্রাইবুনালকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ প্রধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সহকারী পুলিশ সুপার বা একজন কোর্ট ইন্সপেক্টর নিয়োজিত থাকিবেন। পুলিশ প্রধান সুনির্দিষ্ট ও লিখিত আদেশের মাধ্যমে অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক এর নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তাকে ট্রাইবুনাল গঠনের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবেন ।

Scanned with CamScanner

৮৫। পুলিশ ট্রাইবুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোন পুলিশ সদস্যকে নিম্নের যে কোন একটি শাস্তি দেওয়া হইবেঃ

(ক) পদাবনতি;
(খ) বাধ্যতামুলক অবসর;
(গ) অপসারণ; এবং
(ঘ) বরখাস্ত।

৮৬। **পুলিশ ট্রাইবুনালের রায়ের বির" দ্ধে আপীল-**

(১) পুলিশ ট্রাইবুনালের রায়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রায়ের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে (ক) সিনিয়র র‍্যাংক অফিসারের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট এবং (খ) জুনিয়র র‍্যাংক অফিসারের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রধানের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) পুলিশ ট্রাইবুনাল বা উহার আপীল কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা রায়ের বির" দ্ধে কোন আদালত বা ট্রাইবুনালে আপীল করা যাইবে না।

৮৭। **পুলিশ ট্রাইবুনালে বিচার্য্য বিষয়-**

নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমুহ সহ আচরণবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের জন্য একজন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইবে অথবা পুলিশ ট্রাইবুনালে বিভাগীয় মামলা করা যাইবে।

(ক) কর্তব্যে অবহেলা;
(খ) অবাধ্যতা বা ঔদ্ধত্বপুর্ন আচরণ;
(গ) অননুমোদিত অনুপস্থিতি বা কর্মে ফাঁকি
(ঘ) কাপুর" ষতা
(ঙ) ক্ষমতার অপব্যবহার; এবং
(চ) একজন অফিসারের জন্য অশোভনীয় কোন কাজ।

৮৮। **অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার-**

এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য নিজে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন এবং তাহার ইউনিটের কোন সিনিয়র বা জুনিয়র র‍্যাংকের অফিসার অথবা একজন আইনজীবীর সহায়তা গ্রহন করিতে পারিবেন।

৮৯। পুলিশ প্রধান একই সময়ে অনেকগুলি পুলিশ ট্রাইবুনাল গঠন করিতে পারিবেন। পুলিশ প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের লিখিত আদেশ না পাইলে পুলিশ ট্রাইবুনাল এই অধ্যাদেশের অধীন বিভাগীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহন করিতে পারিবে না। লিখিত আদেশ প্রাপ্তির পর ট্রাইবুনাল নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

Scanned with CamScanner

১০। বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দন্ড বা শাস্তি-

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদের একজন পুলিশ অফিসার যে পুলিশ অফিসারের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এইর" প অধীনস্থ পুলিশ অফিসারকে নিম্নলিখিত যে কোন একটি শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন:

(ক) পদাবনতি;
(খ) বাধ্যতামূলক অবসর;
(গ) চাকুরী হইতে অপসারণ; অথবা
(ঘ) বরখাস্ত।

(২) পুলিশ সুপার বা তদূর্ধ র‌্যাংকের একজন পুলিশ অফিসার তাঁহার অধীনস্ত জুনিয়র র‌্যাংকের কোন পুলিশ অফিসারকে নিম্নলিখিত যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন:

(ক) বেতন হ্রাস

(খ) বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকরণ;

(গ) পদোন্নতি স্থগিতকরণ;

(ঘ) ভর্ৎসনা বা তিরস্কার;

(ঙ) মৌখিক সতর্কতা;

(চ) উপদেশ; বা

(ছ) সাজা প্যারেড অতিরিক্ত গার্ড বা ক্লান্তিকর কর্তব্য;

প্রকাশ থাকে যে উপধারা (ছ) এ উল্লেখিত শাস্তিগুলি কেবল কনস্টেবলদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হইবে।

(৩) একজন সহকারী পুলিশ সুপার, সার্জেন্ট বা তদনিম্ন একজন পুলিশ অফিসারকে উপধারা (২) এর (ঘ), (ঙ) (চ), বা (ছ) এ উল্লেখিত যে কোন একটি শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) বিভাগীয় বিধি লংঘনের জন্য কোন পুলিশ অফিসার উপধারা (১), (২) বা (৩) এ উল্লেখিত কোন শাস্তি ঐ ঘটনায় কৃত তাহার বির" দ্ধে কোন ফৌজদারী কার্যক্রমকে বারিত করিবে না।

১১। দন্ডাদেশের বির" দ্ধে আপীল- ধারা ১০ এ কোন অফিসারের বির" দ্ধে শাস্তির আদেশ হইলে তাহার বির" দ্ধে নিম্নোক্তভাবে আপীল করা যাইবে

(ক) পুলিশ প্রধান কর্তৃক শাস্তির আদেশ প্রদত্ত হইলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আপীল হইবে

(খ) পুলিশ প্রধানের অধঃস্তন কোন অফিসার কর্তৃক দন্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে আদেশ প্রদানকারী অফিসারের নিকটতম উর্ধতন র‌্যাংকের অফিসারের নিকট আপীল হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এ ধারা লঘু দন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

Scanned with CamScanner

৯২। **শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি-** সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ প্রধান পুলিশ ট্রাইবুনাল, বিভাগীয় মামলা বা প্রসিডিং এবং আপীল পদ্ধতি সম্• র্কিত বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন। চলমান পাতা...৩৪

৯৩। **পুলিশ অফিসারগণের কর্তব্যকাল**

ছুটিতে না থাকিলে বা সাময়িক বরখাস্ত না হইলে প্রত্যেক অফিসার এই অধ্যাদেশের সকল উদ্দেশ্যের জন্য সর্বদা কর্তব্যরত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং দেশের যে, কোন অংশে তাহাকে যে কোন সময় কর্তব্যে নিয়োজিত করা যাইবে।

৯৪। **কর্তব্য পরিহার বা ইস্তফা-**

(১) পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদের কোনো কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন পুলিশ অফিসার স্বীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করিবেন না।

ব্যাখ্যা- ছুটির কারণে অনুপস্থিত কোন পুলিশ অফিসার যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে ছুটি শেষে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হইলে এই ধারামতে তিনি তাঁহার দাপ্তরিক কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) উর্ধতন উপরস্থ অফিসারের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান ব্যাতিরেকে কোন পুলিশ অফিসারকে তাঁহার দাপ্তরিক কর্তব্য হইতে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে না ।

প্রকাশ থাকে যে ইস্তফার কাংখিত তারিখের অন্ততঃ এক মাস পূর্বে এই র" প নোটিশ না দিলে ইস্তফা নোটিশ গ্রাহ্য করা হইবে না।

৯৫। **জুনিয়র র‌্যাংকের সদস্যদের অন্য কর্মে নিয়োজিত হওয়া-**

জুনিয়র র‌্যাংকের কোন পুলিশ সদস্য, তাহার পুলিশী কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পেশা হিসাবে অন্য কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন

৯৬। সাময়িক বরখাস্

এই অধ্যাদেশ ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসারে যে কোন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ করা যাইবে।

Scanned with CamScanner

দশম অধ্যায়

কল্যান

৯৭। কল্যান-

(১) পুলিশ সদস্যদের সর্বাধিক কল্যানের ব্যবস্থা করণে পুলিশ প্রধানকে উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পুলিশ কল্যান ব্যুরো (অতঃপর "ব্যুরো" নামে অভিহিত) প্রতিষ্ঠা করা হইবে, যাহার প্রধান হিসাবে থাকিবেন ন্যূনপক্ষে অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন অফিসার।

(২) নিম্নবর্ণিত কল্যানমূলক পদক্ষেপসমূহের পরিবীক্ষন ও ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অর্ন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(ক) পুলিশ সদস্যগণ ও তাহাদের নির্ভরশীলদের জন্য চাকুরীকালীন ও অবসরকালীন বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা স্কীম;

(খ) কর্তব্য সম্পাদনকালে আঘাত পাইলে বা শরীরের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

(গ) আবাসন/গৃহায়ন;

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের উপর নির্ভরশীলদের বৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রদান;

(ঙ) সরল বিশ্বাসে কর্তব্য সম্পাদনকালে আদালতে মামলায় অভিযুক্ত বা জড়িত পুলিশ সদস্যদের উপযুক্ত আইনী সুবিধাদি প্রদান;

(৩) বিধিতে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য লইয়া ব্যুরো গঠিত হইবে। পুলিশ প্রধান যথাসম্ভব পুলিশের সকল র‍্যাংক হইতে ব্যুরো সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) ব্যুরো পুলিশ কল্যান সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে এবং বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের কল্যান কার্যাদি পরিবীক্ষন করিবে।

(৫) কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী/ নিহত পুলিশ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের লাভজনক নিযুক্তির উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যুরো সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

(৬) পুলিশ কল্যান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে একটি পুলিশ কল্যান তহবিল সৃষ্টি করা হইবে, যাহা ব্যুরোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনে থাকিবে। নিম্নবর্ণিত দুইটি উপাদানের সমন্বয়ে তহবিলটি গঠিত হইবেঃ

(ক) সরকারী,সরকার অনুমোদিত বেসরকারী ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের অনুদান; এবং
(খ) পুলিশ সদস্যদের চাঁদা।

Scanned with CamScanner

চলমান পাতা...৩৬

১৮। **পুলিশ প্রধানের ক্ষমতা-**

পুলিশ প্রধান ব্যুরোর সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেনঃ

(ক) মৃত্যু, মারাত্মক আঘাত, দুরারোগ্য ব্যধি / মানসিক বৈকল্যের ক্ষেত্রে যে কোন পুলিশ সদস্যকে বা তাহার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(খ) সমাজে পুলিশের ভাবমূর্ত্তির উৎকর্ষ সাধন করে বিশেষ কৃতিত্বপুর্ণ কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে, কোন পুলিশ ইউনিট বা শাখাকে উহার সদস্যদের সাহসিকতার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

(গ) কোন পুলিশ ইউনিট বা শাখাকে উহার সদস্যদের খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক বা নিয়মিত কর্তব্য দায়িত্বের অতিরিক্ত অন্যান্য গঠনমূলক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

১৯। **অভিযোগ (Grievances) ব্যবস্থাপনা ঃ**

(১) পুলিশ সদস্যদের দাপ্তরিক সমস্যা বা অভিযোগ বা দুঃখ কষ্টের প্রতিকারের জন্য পুলিশ প্রধান একটি ন্যায়নিষ্ঠ, স্ব" ছ এবং অংশীদারীত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন।

(২) উপযুক্ত মনে করিলে পুলিশ প্রধান যে কোন পুলিশ সদস্যের সমস্যা বা অভিযোগ প্রতিকারের কোন আবেদন জাতীয় পুলিশ কমিশনে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং কমিশন উক্ত সমস্যা বা অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে যথাযথ সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৩) পুলিশ কমিশন সমস্যা বা অভিযোগের আবেদনগুলি বিশ্লেষণপূর্বক উহার কারণসমূহ এবং পুলিশ সদস্যদের মনোবল ও দক্ষতার উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য ইহার বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করিবে।

চলমান পাতা...৩৭

Scanned with CamScanner

একাদশ অধ্যায়

পুলিশ পলিসি গ্র" প

১০০। প্রতিষ্ঠা- সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ প্রধান পুলিশ পলিসি গ্র" প প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১০১। সদস্য মনোনয়ন- নিম্নবর্ণিত পুলিশ অফিসারদের সমন্বয়ে পুলিশ পলিসি গ্র" প গঠিত হইবেঃ

(ক) পুলিশ প্রধান চেয়ারপারসন;

(খ) রেক্টর, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ;

(গ) স্পে• শাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‌্যাব, রেলওয়ে পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ এর প্রধানগণ;

(ঘ) সকল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(ঙ) সকল রেঞ্জ পুলিশ অফিসার ;

(চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী;

(ছ) মহাপরিচালক, পুলিশ গবেষণা ব্যুরো- সদস্য সচিব; এবং

(জ) পুলিশ প্রধান কর্তৃক মনোনীত অন্য যে কোন পুলিশ অফিসার।

১০২। পুলিশ পলিসি গ্র'' পের ভূমিকা ও কার্যাদি - পুলিশ পলিসি গ্র" পের কার্যাদি নিম্নর" প হইবে ঃ

(ক) পুলিশ সদস্যদের পেশাগত মান, নৈতিকতা ও দক্ষতা, স্ব" ছতা, জবাবদিহিতা এবং চাকুরীর শর্তাবলী উন্নয়নে জাতীয় পুলিশ কমিশন, পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ গবেষণা ব্যুরোর সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয়;

(খ) মানব সম্• দ উন্নয়ন ও পুলিশের কর্মকান্ডে উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্• র্কে সরকারের নিকট সুপারিশ করা:

(গ) অপরাধ নিয়ন্ত্রন ও অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সম্• র্কে একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকারের অন্যান্য এজেন্সীর সহিত কার্যকর সমন্বয় বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সম্• র্কে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা ও পরিচালন (Operational) ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থায়ী কর্ম-পদ্ধতি(Standing Operating Procedure) প্রবর্তন করা; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন কর্তব্য।

১০৩। সভার কার্য পরিচালনা-

(১) বৎসরে পুলিশ পলিসি গ্র" পের ন্যূনপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সদস্য সচিব স্বয়ং অথবা পুলিশ প্রধানের ই" ছানুযায়ী সভা আহবান করা হইবে।

(২) মোট সদস্যের অর্ধেকের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় উপস্থিতি গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(৩) উপস্থিত জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পুলিশ পলিসি গ্র" পের পরামর্শের জন্য যে কোন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রন জানাইতে পারিবে।

CamScanner

দ্বাদশ অধ্যায়

জন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা

১০৪। বিদ্যমান অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন হইলে জিলা পুলিশ প্রধান অথবা তৎকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সহকারী পুলিশ সুপারের নিম্নে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসার ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ধারা ২৬৮ হইতে ২৯৪বি এ উল্লেখিত জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, শালীনতা, সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ প্রতিরোধকল্পে এবং জনশৃঙ্খলা সংরক্ষণে যথোপযুক্ত আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

১০৫। **জনগণকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা-** বিধি সাপেক্ষে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে একজন পুলিশ অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

(ক) রাস্তায় বা সড়কে শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ কল্পে;

(খ) শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশকালে, উপাসনার সময় উপাসনালয়ের আশে পাশে, রাজপথ, রেলপথ, বিনোদন কেন্দ্র, জনগনের জন্য উম্মুক্ত ও জনাকীর্ণ স্থানে প্রতিবন্ধকতা রোধকল্পে; এবং

(গ) রাস্তাঘাট, মসজিদ, গির্জা, মন্দির বা অন্যান্য উপসনালয় বা বিনোদন কেন্দ্র অতিরিক্ত জনাকীর্ণ হইলে তথায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে ।

১০৬। **জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রনে লাইসেন্স-**

(১) জিলা পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন জনসমাবেশ বা শোভাযাত্রা করা যাইবে না।

(২) বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজনানুযায়ী জিলা পুলিশ প্রধান উপধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সে সড়ক, জনপথ, রাস্তাঘাট ও উম্মুক্ত জায়গায় জন সমাবেশ ও শোভাযাত্রা সংঘটনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং শোভাযাত্রা কখন কোন্ রাস্তা দিয়া যাইবে, তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৩) জনস্বার্থে প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিলে জিলা পুলিশ প্রধান সড়ক ও জনপথ, রাস্তাঘাট ও উম্মুক্ত জায়গায় গান বাজনা নিয়ন্ত্রণ এবং উম্মুক্ত স্থানে মাইক বা অন্য কোন শব্দযন্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শর্ত সম্বলিত লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবেন ।

(৪) যে কোন সমাবেশে বা জনসভায় বা বিনোদন স্থলে জনগণের প্রবেশ ও নির্গমণ জিলা পুলিশ প্রধান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন; এবং

(৫) জেলা পুলিশ প্রধান সামাজিক শান্তি সংরক্ষণে ও বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা বা গোলযোগ প্রতিরোধও জনসাধারনের অধিকার সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্সে অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

Scanned with CamScanner

প্রকাশ, লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত পেশকালে অথবা লাইসেন্স ইস্যু করিবার সময় কোন ফিস ধার্য্য বা গ্রহন করা যাইবে না।

চলমান পাতা...৩৯

১০৭। লাইসেন্স সংক্রান্ত শর্তাবলী ভঙ্গের ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা-

(১) ধারা ১০৬ অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত লংঘিত হইলে জিলা পুলিশ প্রধান, অতিরিক্ত বা সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ ইন্সপেক্টর বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জনসাবেশ বা শোভাযাত্রা বন্ধ করা এবং জনতাকে ছত্রভংগ বা ঐ স্থান ত্যাগ করার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশ উপধারা (১) মতে প্রদত্ত আদেশ অস্বীকার বা লংঘন করিলে উহা কোডের সংজ্ঞানুযায়ী বেআইনী সমাবেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৮। নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা-

(১) জিলা পুলিশ প্রধানের নিকট প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হইলে তিনি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট শহর বা গ্রাম এলাকায় সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশের মাধ্যমে অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে ঐ এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র, তরবারি, বল্লম, বন্দুক, ছুরি, লাঠি বা অন্য যে কোন বস্তু যাহা সহিংসতা সৃষ্টিতে ব্যবহার্য্য এবং কোন বিস্ফোরক বা করোসিভ দ্রব্য পরিবহনে, পাথর বা মিসাইল বা মিসাইল নিক্ষেপকারী কোন যন্ত্র বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কোন অস্ত্রশস্ত্র বা সহিংসতায় ব্যবহার্য অন্য কোন দ্রব্যাদি নিয়া কোন ব্যক্তি উপরোক্ত এলাকায় প্রবেশ করিলে কোন পুলিশ অফিসার ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তাহার নিকট হইতে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি জব্দ করিতে পারিবেন।

১০৯। বিনোদনস্থলে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা-

(১) জিলা পুলিশ প্রধানকে পুর্বে অবহিত না করিয়া কোন সমাবেশ করা যাইবে না।

(২) জনগণের জন্য উন্মুক্ত কোন গণবিনোদনস্থলে বা কোন গণ সভা সমাবেশে আগত জনগণের নিরাপত্তা বিধানে ও আইনভংগ বা মারাত্মক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে তথায় উপস্থিত সার্জেন্ট বা তদুর্ধ র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসার, আইনসংগত বিধিবিধান সাপেক্ষে, সভা পরিচালনা ও সভায় আগত লোকদের আগমন/নির্গমণ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সকলেই ঐ নির্দেশ মানিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর বিধান ও তদধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কর্তব্যরত প্রত্যেক পুলিশ অফিসার এর যে কোন গণবিনোদনস্থলে বা গণসমাবেশে অবাধ প্রবেশ অধিকার থাকিবে।

Scanned with CamScanner

পাতা-৪০

১১০। রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি-

নানপক্ষে সহকারী ইন্সপেক্টর পদের কোন পুলিশ অফিসার কোন জর" রী অবস্থা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে যে কোন রাস্ত াঘাট বা উম্মুক্ত স্থানে জনগণ বা যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

১১১। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা যানবাহন তল্লাশী করার ক্ষমতা-

কোন রাস্তায় বা অবকাশ কেন্দ্রে কোন পুলিশ অফিসার যুক্তিসংগতভাবে যদি এইরূপ সন্দেহ করে যে কোন ব্যক্তি বা যানবাহন বেআইনী কোন দ্রব্য বহন করিতেছে যাহা কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইতে পারে, তবে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বা যানবাহনে তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তি বা যানবাহনের দখলকারীর বক্তব্য তাঁহার নিকট মিথ্যা বা সন্দেহজনক মনে হইলে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং যানবাহনে বহনকৃত সন্দেহজনক দ্রব্যাদি জব্দ করিতে পারিবেন এবং তাহার বির" দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনকল্পে আদালতকে অনুরোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উক্ত ঘটনা সম্ পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন মহিলার দেহ তল্লাশী করিতে হইলে তাঁহার মানসম্ভ্রমের প্রতি কঠোরভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া শালীনতার সহিত অন্য কোন মহিলা দ্বারা তল্লাশী চালাইতে হইবে।

Scanned with CamScanner

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা

১১২। শান্তি রক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন-

(১) কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বা এই অধ্যাদেশের কোন বিধান কার্যকর করণে বা কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ সম্পর্কিত অন্য কোন আইনের বিধান পালনার্থে অথবা পুলিশের উপর আরোপিত অন্য কোন কর্তব্য সম্পাদনার্থে পুলিশ কমিশনার বা রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা জিলা পুলিশ প্রধান পুলিশ প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিতে পারিবেন।

(২) বিধি সাপেক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের খরচ আবেদনকারী বহন করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে নিয়োজিত অতিরিক্ত পুলিশ প্রত্যাহারের জন্য এক সপ্তাহের পূর্বে নোটিশ প্রদান করিলে আবেদনকারী উহার খরচ বহন হইতে অব্যহতি লাভ করিবে।

(৪) উপরোক্ত ব্যয় পরিশোধ সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে জিলা পুলিশ প্রধান বিষয়টি পুলিশ প্রধানের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং পুলিশ প্রধানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

১১৩। আয়োজকদের খরচে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন-

(১) যখন জিলা পুলিশ প্রধানের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হইবে যে- (ক) কোন স্থানে বিশেষ বা বড় ধরণের কোন কাজ চলিতেছে বা গণবিনোদন ব্যবস্থা বা এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হইতেছে যাহাতে অনেক লোকের সমাগমের ফলে যানবাহন বা লোক চলাচল বিঘ্নিত হইতে পারে, অথবা (খ) রেলপথ, খাল বা অন্যান্য সরকারী কার্য্যে, বা নির্মাণাধীন/চালু কোন কারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত উৎকণ্ঠা হইতে অতিরিক্ত পুলিশ কাজে লাগানো প্রয়োজন তখন তিনি যত সময়ের জন্য প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিবেন তত সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

(২) বিধি সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের খরচ আয়োজক বা পার্টি বা অবকাঠামো বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বহন করা হইবে।

১১৪। আনসার, গ্রাম পুলিশ, ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগ- পুলিশের সহায়তার প্রয়োজন হইলে সরকার কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে আনসার, গ্রাম পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োজিত করা আইনসংগত হইবে এবং এইরূপে নিয়োজিত আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল এবং ব্যাটালিয়ন আনসারগন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনে থাকিবে।

Scanned with CamScanner

১১৫। বেআইনী সমাবেশ সংক্রোন্ত ক্ষতিপুরণ-

বেআইনী জনসমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কৃত কোন কর্মের ফলে যদি কোন সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয় বা কোন লোকের মৃত্যু ঘটে বা কেউ মারাত্বক আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত ক্ষতি, মৃত্যু বা আঘাতের ক্ষতিপুরণের অংক নির্ধারণ করিতে পারিবে যাহা বেআইনী সমাবেশে সমবেত লোকজন যথাসম্ভব সমষ্টিগতভাবে পরিশোধ করিবে। কিন্তু ইহা তাহাকে ফৌজদারী অপরাধ হইতে দায়মুক্ত করিবে না।

১১৬। ধারা ১১২ ও ১১৩ এর অধীনে আদায়যোগ্য অর্থ-

ধারা ১১২ ও ১১৩ মোতাবেক প্রদেয় অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১১৭। আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা-

ধারা ১১২ ও ১১৩ এর অধীন প্রদেয় ও আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হইবে।

১১৮। পুলিশের নিকট মিথ্যা বক্তব্য- কোন সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন পুলিশ অফিসারের নিকট মিথ্যা বা মূলতঃ বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখিলে ঐ ব্যক্তি অনুর্ধ ছয় মাসের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১১৯। পুলিশ ইউনিফরম সদৃশ পোষাক পরা নিষিদ্ধ-

(১) যদি পুলিশ প্রধান বা পুলিশ কমিশনার বা রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা জিলা পুলিশ প্রধানের নিকট সন্তোষ-জনকভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সমিতি বা সংগঠনের কোন সদস্যের জনসমক্ষে পরিহিত পোষাক পুলিশ ইউনিফরম সদৃশ তবে বিশেষ আদেশবলে তিনি উক্ত ব্যক্তি বা সংগঠনের সদস্য কর্তৃক পোষাক পরা বা প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা- জনগণের জন্য উম্মুক্ত কোন জায়গায় উপধারা (১) এ বর্ণিত পোষাক পরা বা প্রদর্শন করা হইলে তাহা জনসমক্ষে পরিহিত বা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২০। ক্যাম্প, প্যারেড নিয়ন্ত্রণ- জিলা পুলিশ প্রধান জননিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থে পুলিশ সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ বা ক্যাম্প, প্যারেড বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনে সহায়তা প্রদানকল্পে বিশেষ আদেশবলে সমগ্র জিলা বা উহার কোন অংশে সকল প্রকার সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

১২১। গ্রাম পুলিশের উপর জিলা পুলিশ প্রধানের কর্তৃত্ব- বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গ্রাম পুলিশের উপর জিলা পুলিশ প্রধানের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আইনসংগত হইবে।

Scanned with CamScanner
CamScanner

চতুর্দশ অধ্যায়
অপরাধ ও শাস্তি

১২২। ধারা ১০(২) এ চিহ্নিত কোন অপরাধ বা বেআইনী কাজের শাস্তি হইবে ছয় মাস হইতে দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড বা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড।

১২৩। **পশু বা যানবাহন দ্বারা রাস্তায় ক্ষয়ক্ষতি বা বিপদ সৃষ্টি করা-** নির্ধরিত বিধি বিধান লংঘন করিয়া কেহ কোন রাস্তায় বা উম্মুক্ত স্থানে অবহেলাপূর্ণ বা বিপজ্জনকভাবে গাড়ী চালানো বা কাঠ, পোল বা অন্যান্য অতিস্থুলকায় বেসামাল দ্রব্য বহনকারী পশু বা যানবাহন চালানোর মাধ্যমে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদসংকেত (alarm) সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১২৪। **রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি-** কোন ব্যক্তি কোন ব্যস্তও সকলের জন্য উম্মুক্ত সড়ক, জনপথ, রাস্তা, বা খোলা জায়গায় নিম্নবর্ণিত কোন একটি কার্য করিয়া যাত্রী বা আশে পাশের অধিবাসীদের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি, বিপদ, বিরক্তি বা অসুবিধার উদ্রেক করিলে তিনি অনূর্ধ পাঁচ হাজার টাকা অথবা অনূর্ধ তিন মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং যে কোন পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে ঐ ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নিতে পারিবেন:

(ক) পশু জবাই, পশুর মৃতদেহ পরিষ্কার, বিপজ্জনকভাবে কোন পশুর উপর সওয়ার হওয়া বা উহাকে চালানো, ঘোড়া বা অন্য পশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া;

(খ) নিষ্ঠুরভাবে কোন পশুকে মারপিট করা, অত্যাচার বা অপব্যবহার করা;

(গ) মালামাল বা যাত্রী উঠানামার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কোন পশু বা যানবাহনকে রাস্তার উপর রাখা অথবা জনগণের অসুবিধা বা বিপদ হয় এমনভবে কোন যানবাহন ফেলিয়া যাওয়া;

(ঘ) রাস্তায় বিক্রীর পশরা সাজানো/প্রদর্শন করা;

(ঙ) রাস্তায় ময়লা, আবর্জনা, রাবিশ, পাথর, নির্মাণ সামগ্রী ফেলা বা জমানো, গর" র/ঘোড়ার ঘর বা দোকান তৈরী করা এবং বাড়ী, কারখানা, গোবরস্তূপ ইত্যাদি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ রাস্তায় ফেলা;

(চ) মদ্যপ, মারমুখী বা বেসামাল অবস্থায় রাস্তায় উপদ্রব করা;

(ছ) অশালীন ব্যবহার, ই" ছাকৃত ও অশালীনভাবে দেহ প্রদর্শন, দৃষ্টি কটু দৈহিক বৈকল্য ও রোগাক্রান্ত দেহাংশ প্রদর্শন, পায়খানা প্রশাব করা, অনির্ধারিত পানির ট্যাংক বা জলাধারে গোসল করা বা হাত পা ধৌত করা;

(জ) পুকুর, জলাধার, ট্যাংক, কূপ বা অন্যান্য বিপজ্জনক স্থানে বেড়া বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা না দেওয়া বা অবহেলা করা;

(ঝ) অন্য কোনভাবে রাস্তাঘাটে প্রতিবন্ধকতা, বিরক্তি বা উপদ্রব সৃষ্টি করা।

Scanned with CamScanner

১২৫। দেওয়ালে নোটিশ লাগানো- মালিক বা অবস্থানকারীর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন দেওয়াল, দালান বা অন্যান্য স্থাপনা বিবর্ণ/বিকৃত করিবে না বা তথায় বিজ্ঞাপন, নোটিশ ইত্যাদি লাগাইবে না বা দেওয়াল চিত্র অংকন করিবে না।

চলমান পাতা...৪৪

১২৬। পোষা প্রানী দ্বারা অনিষ্ট সাধন - কোন রাস্তা বা সড়কে বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোন স্থানে অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত কোনো কার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রানীকে কোন পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে হেফাজতে লইতে পারিবে।

(ক) কোন পোষা পশু প্রানীকে ই" ছাকৃতভাবে বা অবহেলা করিয়া ছাড়া অবস্থায় রাখা যাহা অন্যের জন্য বিপদ, অনিষ্ট, বিরক্ত ও ভীতি সঞ্চার করিতে পারে;

(খ) মুখবন্ধ ছাড়া হিংস্র পোষা প্রানীকে মুক্ত অবস্থায় রাখা; অথবা

(গ) অন্য প্রানী বা মানুষকে আক্রমন করিবার উদ্দেশ্যে পোষা প্রানী ছাড়া/মুক্ত অবস্থায় রাখা।

১২৭। ধারা ১২৩, ১২৫ ও ১২৬ এর অপরাধের শাস্তি- ধারা ১২৩, ১২৫ ও ১২৬ এর বিধান লংঘন করার অপরাধে কোন ব্যক্তি সর্বো" চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে অনুর্ধ ত্রিশ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১২৮। বিশৃঙ্খল আচরণে সম্মতি প্রদান- কোন বিনোদন কেন্দ্র বা অবকাশ কেন্দ্রের মালিক বা পরিচালক জ্ঞাতসারে তথায় বিশৃঙ্খল আচরণ বা জুয়া খেলা, বা অন্য কোন অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হইতে অনুমতি বা নীরব সম্মতি দিলে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৯। ধারা ১০৪ এর আদেশ লংঘনের শাস্তি-

যে কেহ ধারা ১০৪ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের কোন বিধান অথবা ধারা ১০৬ এর অধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের কোন শর্ত লংঘন করিবে বা লংঘনে সহায়তা করিবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩০। ধারা ১০৫, ১০৮ ও ১০৯ লংঘনের শাস্তি-

(১) যে কেহ ধারা ১০৫ ও ১০৯ এর অধীনে কোন পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করিবে, অমান্য করিবে বা উহার বিরোধিতা করিবে বা উহার সহিত সংগতি রক্ষায় ব্যর্থ হইবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যে কেহ ধারা ১০৮ এর উপধারা (১) এর অধীনে প্রণীত প্রজ্ঞাপন বা আদেশ লংঘন করিবে তাঁহাকে তিন মাস হইতে দুই বছর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

১৩১। ধারা ১১৯ ও ১২০ লংঘনের শাস্তি- যে ব্যক্তি ধারা ১১৯ ও ১২০ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ লংঘন করিবে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩২। প্রতারণা করিয়া পুলিশ অফিসার হিসাবে নিয়োগ লাভের শাস্তি- যে কেউ পুলিশ অফিসার হিসাবে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য/বিবরণ বা মিথ্যা/জাল দলিল ব্যবহার করিবে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

Scanned with CamScanner
CamScanner

১৩৩। প্রথম অপরাধে সতর্কতা-

জিলা পুলিশ প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বা তদুর্ধ র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসার ১২৩ হইতে ১২৬ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ প্রথমবার সংঘটন করার ক্ষেত্রে অপরাধীকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতকে অনুরোধ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়বার উক্ত অপরাধ সংঘটন করিলে অপরাধীকে নির্ধারিত শাস্তির অন্ততঃ অর্ধেক শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

১৩৪। পানির উৎস কলুষিত করা-

যদি কেউ জনগণের ব্যবহার্য পানির কূপ, ট্যাংক, জলাধার, পুকুর, বা নদীর কোন অংশ, ঝরনা, নালা ও পানি সরবরাহের উৎস বা উপায় কলুষিত করে, এইরূপে যে উহা নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তি অনুর্ধ ছয় মাসের কারাদন্ড বা সর্বো" চ ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৫। মিথ্যা অগ্নি সংকেত-

যে কেহ কোন পুলিশ সদস্যকে মিথ্যা জানা সত্বেও অগ্নিসংকেত প্রদান করে বা করায় তিনি অনুর্ধ তিন মাসের কারাদন্ড বা অনুর্ধ পনের হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৬। ধারা ১১০ এর আদেশ লংঘনের শাস্তি- যে কেউ ধারা ১১০ এর অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করিবে অথবা লংঘনে সহায়তা করিবে তিনি অনুর্ধ তিন মাসের কারাদন্ড বা দশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৭। পুলিশ ইউনিফরম ব্যবহারের শাস্তি- পুলিশ সদস্য নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি অনুমোদন ব্যতীত পুলিশ ইউনিফরম বা দেখিতে তদ্র" প কোন পোষাক বা পুলিশ ইউনিফরমের বিশেষ চিহ্ন বহনকারী কোন পোষাক বা উহার অংশ পরিধান করে তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ তিন বৎসরের কারাদন্ড বা এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৮। তু" ছ বা বিরক্তিকর নালিশের শাস্তি- কোন পুলিশ সদস্যের বির" দ্ধে কোন অভিযোগ পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের তদন্তে তু" ছ বা বিরক্তিকর প্রতীয়মান হইলে অভিযোগকারী তিন মাসের কারাদন্ড বা বিশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৯। ধর্তব্য অপরাধ- কোডে যাহাই থাকুক না কেন ১৩৪ হইতে ১৩৮ ধারাধীন অপরাধসমুহ বিচারার্থে গ্রহন করা হইবে।

১৪০। অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা- এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ সমূহের বিচার কোডে বিধৃত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে করিবার এখতিয়ার আদালতের থাকিবে।

Scanned with CamScanner CamScanner

পঞ্চদশ অধ্যায়
বিবিধ

১৪১। থানায় সাধারণ ডায়েরী সংরক্ষণ-

নির্ধারিত ফরমে ছাপানো কাগজে বা ইলেকট্রনিক ফরমে প্রত্যেক থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী সংরক্ষণ করিতে হইবে। একজন পুলিশ অফিসার যাহা যথাযথ মনে করিবেন এমন সব ঘটনা উহাতে রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা হইবে। পুলিশের কাজে যে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপের বিবরন ও এই সাধারন ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

১৪২। জননিরাপত্তা তহবিল-

(১) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সরকার একটি জননিরাপত্তা তহবিল গঠন করিতে পারিবে, যাহা মুলতঃ নিম্নবর্ণিত অনুদান ও দানে সংগঠিত হইবেঃ

(ক) সরকার, স্থানীয় সরকার, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকার স্বীকৃত বেসরকারীসংস্থাসমূহ (এনজিও), আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান;

(২) ট্রাফিক জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত অর্থের অর্ধেক সরকার জননিরাপত্তা তহবিলে জমা দিতে পারবে।

(৩) এই তহবিল কখনও অবসিত হইবে না।

(৪) এই তহবিলের জমা খরচের সঠিক হিসাব থাকিবে, যাহা প্রতি অর্থ বৎসরে অডিটর জেনারেল বা মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করা হইবে।

(৫) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিবিধান সাপেক্ষে পুলিশ প্রধানের সার্বিক তত্ত্বধানে জননিরাপত্তা তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৬) জননিরাপত্তা তহবিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবেঃ

- (ক) থানায় পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান এবং জনগণের জন্য সুবিধাদির প্রবর্তন ও উন্নয়ন;
- (খ) ট্রাফিক পুলিশসহ সকল পুলিশের সেবার মান উন্নয়ন; এবং
- (গ) ভালোভাবে কর্তব্য সম্ংাদনের জন্য পুলিশ সদস্যদের পুরস্কৃত করা।

১৪৩। ভারপ্রাপ্ত বা স্থলাভিষিক্ত অফিসারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা-

পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ পুলিশ প্রধান বা জিলা পুলিশ প্রধানের অনুপস্থিতিতে যিনি উপযুক্ত নিয়োগ কর্তৃপক্ষের আদেশে ঐ পদে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত হইবেন তিনি এই অধ্যাদেশে রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা জিলা পুলিশ প্রধানের সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রয়োগ ও সম্ংাদন করিবেন।

CamScanner

১৪৪। সরল বিশ্বাসে কর্তব্য সম্ • াদনের কারণে কোন পুলিশ অফিসার দন্ডিত হইবেন না-

এই অধ্যাদেশে বা বলবৎ অন্য কোন আইনে বা তদধীন প্রণীত বা প্রদত্ত কোন বিধিবিধান, আদেশ বা নির্দেশনাধীন আরোপিত কর্তব্য বা প্রদত্ত কর্তৃত্ব অনুসরণে সরল বিশ্বাসে সম্ • াদিত কোন কাজের জন্য কোন পুলিশ অফিসার কোন দন্ডে দন্ডিত হইবেন না বা কোন ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন না।

১৪৫। পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে মামলা- সরকার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক অথবা অনুরূপ কোন অফিসারের পূর্ব অনুমোদনের ভিত্তিতে লিখিত প্রতিবেদন (যাহাতে অপরাধ সম্ • ৃক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ থাকিবে) ব্যতীত কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে আনীত অভিযোগ সম্ • র্কে কোন ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহন করা যাইবে না।

১৪৬। কর্তব্যের আবরণে কৃত কাজের বির" দ্ধে ছয় মাসের মধ্যে মামলা- নালিশী কাজ সংঘটনের তারিখ হইতে অথবা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ এর নিকট অভিযোগ দায়ের করার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দায়ের করা না হইলে কোন আদালত কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে এই অধ্যাদেশের অধীন কর্তৃত্ব প্রয়োগে বা কর্তব্য সম্ • াদনকালে অথবা কর্তব্যের আবরণে কৃত কোন অন্যায় বা অপরাধের অভিযোগে কোন মামলা গ্রহন করিবে না।

১৪৭। ১৪৬ ধারাধীন মামলায় দুই মাসের নোটিশ-

(১) ১৪৬ ধারায় কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে মামলা করিতে হইলে অভিযোগকারী/বাদী কর্তৃক অভিযোগের যথেষ্ট বর্ণনাসহ দেওয়ানী কার্য্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮০ ধারানুযায়ী দুই মাসের নোটিশ দিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রদেয় নোটিশের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্য্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮০ ধারার বিধান প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে প্রযোজ্য হইবে।

১৪৮। লাইসেন্স ও অনুমতিপত্রে শর্তাবলী নির্দিষ্টকরণ-

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রে এলাকা, সময়, বাধা-নিষেধ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরে উক্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে।

১৪৯। লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র বাতিলকরণ-

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র, প্রাপক কর্তৃক উহার বাধা-নিষেধ বা শর্তাবলী লংঘন বা পরিহার করা হইয়াছে এই মর্মে তাহার প্রতি নোটিশ জারীর পর অথবা উক্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সম্ • র্কিত কোন অপরাধে তিনি সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাতিল করা যাইবে।

Scanned with CamScanner
CamScanner

১৫০। লাইসেন্স বাতিলকরণের পর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সবিহীন বলিয়া গণ্য হইবেন-

কোন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হইলে অথবা উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে উক্ত বাতিলকরণ আদেশ প্রত্যাহার বা লাইসেন্সের মেয়াদ নবায়ন না করা পর্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বক্তি এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র বিহীন গন্য হইবেন।

১৫১। পুলিশ অফিসারের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স উপস্থাপন বা প্রদর্শন-

লাইসেন্স বলবৎ থাকাকালীন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের চাহিদানুযায়ী যে কোন যুক্তিযুক্ত সময়ে লাইসেন্স উপস্থাপন বা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৫২। গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ধরণ-

এই অধ্যাদেশের অধীন কোন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইলে তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত দুই বা ততোধিক উপায়ে প্রকাশ ও প্রচার করিতে হইবেঃ

(ক) একাধিক সুদৃশ্য স্থানে নোটিশ লাগাইয়া/ঝুলাইয়া দেওয়া;

(খ) ঢোল শহরতের মাধ্যমে ঘোষণা করা;

(গ) প্রিন্ট এবং অথবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে।

১৫৩। কর্তৃপক্ষের সম্মতির প্রমাণ-

যখন এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কিছু করা বা না করা, বা কোন কিছুর বৈধতা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মতি, অনুমোদন, ঘোষণা, মতামত বা সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরকৃত কোন কাগজ বা দলিল, যাহা উপরোক্ত সম্মতি, অনুমোদন, ঘোষণা, মতামত বা সন্তুষ্টি বুঝায়, উহার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫৪। নোটিশে স্বাক্ষর ও সীলমোহরের ব্যবহার- এই অধ্যাদেশ বা তদধীন কোন বিধিমতে কোন লাইসেন্স, অনুমতিপত্র, নোটিশ বা অন্য কোন দলিলে (সমন, ওয়ারেন্ট ও তল্লাশী ওয়ারেন্ট ব্যতীত) জিলা পুলিশ প্রধানের সহি মোহরের প্রয়োজন হইলে সেই স্থলে ফ্যাকসিমিলি সহি মোহর থাকিলে উহাকেই সঠিক সহি মোহর বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৫৫। কোন বিধি বা আদেশ বাতিল, পুর্বানুবৃত্তি (Reverse) বা পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী ব্যক্তির আবেদন-

এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বা প্রদত্ত কোন বিধি বা আদেশ, যাহা দ্বারা জনগণ বা তাহাদের বিশেষ কোন শ্রেণীকে কোন কিছু করিতে বা না করিতে বলা হয়, অথবা বিবৃতিমতে তাহাদের বা তাহাদের অধীনস্তদের আচরণ বা চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে, বেআইনী, নিপীড়ণমুলক বা অযৌক্তিক হওয়ার কারণে আগ্রহী কোন ব্যক্তি উহা বাতিল, পুর্বানুবৃত্তি বা পরিবর্তনের জন্য উক্ত আদেশ বা বিধি প্রণয়নকারী কতৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

Scanned with CamScanner

প্রকাশ থাকে যে সরকার উপরোক্ত আদেশ বা বিধি পুনর্বিবেচনা করিবার এখতিয়ার প্রয়োগ করিবে।

চলমান পাতা...৪৯

১৫৬। সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা-

এই অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর করার জন্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা-

(১) পুলিশ প্রধান বিভিন্ন সময়ে এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নয় এমন প্রবিধান ও আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারণ প্রয়োগ ক্ষুন্ন না করিয়া প্রবিধানমালায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

(ক) প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসহ পুলিশের মানব সম্• দ ব্যবস্থাপনা;

(খ) পুলিশ সদস্যদের নিকট সরবরাহযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবার" দ ও সাজসরঞ্জামের প্রাধিকার নির্ধারণ ।

(গ) পুলিশ সদস্যদের চৌকষ আচরণ;

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের আবাসন, অব-কাঠামো, মেসিং সুবিধাদি;

(ঙ) পুলিশের সাধারণ প্রশাসন, অপারেশন, গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা; এবং

(চ) কর্তব্যে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং পুলিশের কর্মকান্ডে সার্বিক শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও শালীনতা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন।

১৫৮। বিধিমালা ও প্রবিধানমালার প্রজ্ঞাপন-

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রত্যেকটি বিধি ও প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হইবে।

১৫৯। অন্য আইনে মামলা করার ক্ষমতা অপরিবর্তিত-

কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে বিধানসাপেক্ষে তাহার বির" দ্ধে মামলা করা যাইবে।

১৬০। সংশোধনের ক্ষমতা-

পুলিশ প্রধান হইতে লিখিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

CamScanner

১৬১। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ-

(১) পুলিশ আইন, ১৮৬১ (অতঃপর 'ঐ আইন' নামে অভিহিত) এতদ্বারা রহিত করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) ঐ আইনে বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমতে বিধি প্রণয়ন, নিয়োগদান, ক্ষমতা অর্পন, আদেশ, সম্মতি, অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান, সমন বা ওয়ারেন্ট বা তল্লাশী পরোয়ানা জারীকরণ, গ্রেফতার, আটক ও জামিনে বা বন্ডে মুক্তি, জামিন বন্ড বাজেয়াপ্তকরণ, দন্ড প্রদান ইত্যাদি যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহা এই অধ্যাদেশের সহিত সংগতিপুর্ণ হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ঐ আইন বা অন্য কোন আইনের প্রতি সকল রেফারেন্স এই অধ্যাদেশের অনুরূপ বিধানের প্রতি রেফারেন্স হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ঐ আইনের রহিতকরণ সত্ত্বেও নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকিবেঃ

(ক) ঐ আইনের অধীন যাহা কিছু করা হইয়াছে বা বিনা বাধায় সংঘটিত হইয়াছে তাহার বৈধতা, অবৈধতা, কার্যকরতা ও ফলাফল;

(খ) অধিকার, বিশেষ সুবিধা, দায়-দেনা, যাহা ঐ আইনের অধীন অর্জিত, উপচিত বা গৃহীত হইয়াছে;

(খ) ঐ আইনের অধীন কৃত কোন কাজ বা অপরাধের শাস্তি বা দন্ড, বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(গ) উপরোক্ত অধিকার, বিশেষ সুবিধা, দায়-দেনা, দন্ড-শাস্তি সম্পর্কে কোন তদন্ত, মামলা-মোকদ্দমা বা প্রতিকার;

এবং উপরোক্ত তদন্ত, মামলা-মোকদ্দমা বা প্রতিকার দায়ের করা, চালাইয়া যাওয়া ও কার্যকর করা যাইতে পারে এবং উপরোক্ত দন্ড, শাস্তি বা বাজেয়াপ্তকরণ আরোপ করা যাইতে পারে, যেন ঐ আইন রহিত করা হয় নাই;

(ঘ) ঐ আইনে কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষ সমীপে রুজুকৃত ও বিচারাধীন কোন মামলা-মোকদ্দমা এবং এইরূপ মামলা-মোকদ্দমা হইতে উদ্ভুত কোন আপীল বা রিভিশন রুজু করা, চালাইয়া যাওয়া বা নিষ্পন্ন করা যাইবে যেন ঐ আইন রহিত করা হয় নাই।

১৬২। বিদ্যমান পুলিশ সার্ভিস এই অধ্যাদেশের অধীন সংগঠিত হইয়াছে-

১৬১ ধারার বিধানসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য কোনরূপে ক্ষুন্ন না করিয়া এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পুর্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্য এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সময় হইতে ইহার অধীনে সংগঠিত পুলিশ সার্ভিস বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬৩। অসংগতি দুরীকরণের ক্ষমতা-

CamScanner

(১) এই অধ্যাদেশের কোন বিধান কার্যকর করিতে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ অসংগতি দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন বিবেচিত বিধান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপন জাতীয় সংসদে পেশ করিতে হইবে।

চলমান পাতা...৫১

প্রথম তফসীল

(ধারা-২)

সিনিয়র ও জুনিয়র র‌্যাংকেস/পদসমূহ

(১) **সিনিয়র পুলিশ র‌্যাংকেস/পদসমূহ**

(ক) মহা-পরিদর্শক

(খ) অতিরিক্ত মহা-পরিদর্শক

(গ) উপ-মহাপরিদর্শক

(ঘ) অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক

(ঙ) সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(চ) সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(ছ) অতিরিক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(জ) সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(২) **জুনিয়র পুলিশ র‌্যাংকেস/পদসমূহ**

(ক) ইন্সপেক্টর

(খ) সহকারী ইন্সপেক্টর

(গ) সার্জেন্ট

(ঘ) কনস্টেবল

চলমান পাতা...৫২

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় তফসীল

(ধারা-২৭)

শপথনামা

আমি শপথ করিতেছি যে বাংলাদেশ পুলিশের একজন সদস্য হিসাবে আইন সংগতভাবে আমার উপর ন্যস্ত পেশাগত ও সরকারী দায়িত্ব-কর্তব্য আমি সঠিকভাবে সততা ও আন্তরিকতার সহিত পালন করিব। আমি সর্বদা রাষ্ট্র, সংবিধান ও আমার পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিব।

আমি আরো শপথ করিতেছে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আমার উপর ন্যস্ত সকল কর্তব্য আমি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিব এবং যে কোন অবস্থায় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিব এবং দেশের সেবায় জীবন বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় তফসীল

(ধারা-২৮)

সূত্র নং-.........................

তারিখঃ ....

নিয়োগ সার্টিফিকেট/ছাড়পত্র

২০০৭ ইং সনের পুলিশ অধ্যাদেশের ২৮ ধারা অনুযায়ী প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে জনাব/ .... কে .... পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

পুলিশ অধ্যাদেশ অনুযায়ী উক্ত পদের একজন পুলিশ অফিসারের সকল দায়-দায়িত্ব , কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল এবং তিনি উক্ত পদের সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

তাঁহার চাকুরী- .... ইউনিটে ন্যস্ত করা হইল।

কাজে যোগদান করিবার তারিখ হইতে এই নিয়োগ কার্যকর হইবে।

সহি ....

মোহর ....

Scanned with CamScanner
CamScanner

চতুর্থ তফসীল
(ধারা-২৯)

ক। ইন্সপেক্টর থেকে সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির পদ্ধতি-

১। পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হইতেছে- (ক) অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা, (খ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং (গ) লিখিত পরীক্ষার ফলাফল।

২। পদোন্নতির ভিত্তি হইবে ১০০ নম্বরর মধ্যে কোন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত নম্বর।

৩। বিবেচ্য বিষয়গুলিতে নম্বর বিতরণ নিম্নরূপ হইবেঃ

৩.১। **অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা-** অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার জন্য ১০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে । পুলিশ পরিদর্শক পদে প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ১ নম্বর দেওয়া হইবে। এইভাবে কেহ আট বৎসর চাকুরী করিলে জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতার জন্য তিনি ৮ নম্বর পাইবেন। শর্ত এই যে, পরিদর্শক পদে দশ বৎসরের বেশী চাকুরী হইলেও কেউ এই বিষয়ে ১০ নম্বরের বেশী পাইবেন না।

৩.২। **বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন-** বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য ৩০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন অফিসারের গত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মল্যায়ন হইবে। জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মুল্যায়িত হইবে না। কোন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত নম্বর মোট ৩০ নম্বরের অনুপাতে মল্যায়ন করা হইবে। যেমনঃ কোন অফিসার গত পাঁচ বৎসরে মোট ৪০০ নম্বর পাইলে তিনি ৩০ নম্বরের অনুপাতে পাইবেন ৪০০/৫০০X৩০= ২৪ নম্বর। কোন অফিসারের কোন এক বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে এবং বিধি অনুযায়ী এই না পাওয়া অবস্থা গৃহীত/অনুমোদিত হইলে অন্যান্য বৎসরের গড়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩০ নম্বরের অনুপাত করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ-কোন অফিসারের তিন বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রাপ্ত নম্বর ২৪০ হইলে ৩০ নম্বরের অনুপাতে তিনি পাইবেন ২৪০/৩০০X৩০= ২৪ নম্বর।

৩.৩। **লিখিত পরীক্ষা-** সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির জন্য প্রার্থীদের নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে হইবেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	মোট নম্বর	পাশ নম্বর%
১।	আইন	১০০	৫০
২।	পুলিশ ও অফিস ব্যবস্থাপনা	১০০	৫০

Scanned with CamScanner

৩।	চাকুরী বিধিমালা (ছুটি,পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা,বদলী, শৃঙ্খলা,আর্থিক বিধিসমূহইত্যাদি)	১০০	৫০

চলমান পাতা...৫৫

৩.৩.১। উপরোক্ত লিখিত পরীক্ষার জন্য সর্বমোট ৬০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত গড় নম্বর ৬০ এর অনুপাতে হিসাব করা হইবে। যেমনঃ একজন অফিসার পরীক্ষায় ৭০% নম্বর পাইলে, ৬০ এর অনুপাতে তিনি পাইবেন ৭০/১০০X৬০= ৪২ নম্বর।

৪। প্রতি লঘু দন্ড প্রাপ্তির জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে কোন অফিসারের পদোন্নতি এক বৎসর স্থগিত থাকিবে এবং প্রতি গুর" দন্ড প্রাপ্তির জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে কোন অফিসারের পদোন্নতি তিন বৎসর স্থগিত থাকিবে।

৫। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ নম্বর প্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই শুধু পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হইবে।

৬। প্রাপ্ত নম্বরের মেধাক্রম অনুযায়ী কর্মকর্তাদেরকে পরিদর্শক হইতে সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি দেওয়া হইবে।

৭। একাধিক অফিসার সমান নম্বর প্রাপ্ত হইলে বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার পদোন্নতি পাইবেন।

৮। পদোন্নতির জন্য বিবেচিত কর্মকর্তাদের সার্ভিস রেকর্ড অনুমোদনের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। পদোন্নতি প্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে :-

(ক) পুর্বের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসার পরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসারের উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(খ) একই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসারদের মধ্যে বেশী নম্বর প্রাপ্ত অফিসার জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(গ) কনস্টেবল হইতে পদোন্নতি প্রাপ্ত অফিসারের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে ঘোষনার দিন হইতে জ্যেষ্ঠতা গণ্য করা হইবে।

১০। উপরোক্ত বিধানসমূহবাস্তবায়নে বা কোন অফিসারের প্রাপ্ত নম্বরের মূল্যায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে অথবা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে অথবা কোন বিধি সংশোধন বা প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে সেই সম্‌পর্কে পুলিশ প্রধানের নির্দেশ বা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Scanned with CamScanner

১১। প্রতি বৎসর জুন-জুলাই মাসে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। সকল বিষয় একবারেই পাশ করিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। তবে একজন অফিসার একই বিষয়ে তিন বারের বেশী পরীক্ষা দিতে পারিবে না। তৃতীয়বার পরীক্ষায়ও যদি কোন অফিসার কোন বিষয়ে পাশ করিতে না পারে তবে ইহাকে তাহার অদক্ষতা বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থায়ীভাবে সহকারী পুলিশ সুপার পদের অযোগ্য ঘোষণা করা হইবে।

খ। সহকারী পুলিশ সুপার/সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার পদ হইতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির পদ্ধতি-

১। অফিসারকে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে।

২। পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হইবে- (ক) মৌলিক প্রশিক্ষণ, এবং (খ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন।

৩। বিবেচ্য বিষয়গুলিতে নম্বর বিতরণ নিম্নরূপ হইবেঃ

৩.১। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য মোট ৬০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন অফিসারের গত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মুল্যায়ন হইবে। জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মুল্যায়িত হইবে না। কোন অফিসার কর্তৃক পাঁচ বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রাপ্ত নম্বর এই বিষয়ে নির্ধারিত ৬০ নম্বরের অনুপাতে মুল্যায়ন করা হইবে। যেমনঃ কোন অফিসার গত পাঁচ বৎসরে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে মোট ৪০০ নম্বর পাইলে তিনি সংরক্ষিত ৬০ নম্বরের অনুপাতে পাইবেন ৪০০/৫০০X৬০= ৪৮ নম্বর। কোন অফিসারের কোন এক বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে এবং সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক এই না পাওয়া অবস্থা গৃহীত/অনুমোদিত হইলে অন্যান্য বৎসরের গড়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সংরক্ষিত ৬০ নম্বরের অনুপাত হিসাব করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ- কোন অফিসারের তিন বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদনে পাওয়া নম্বর ২৪০ হইলে, ৬০ নম্বরের অনুপাতে তিনি পাইবেন ২৪০/৩০০ X ৬০= ৪৮ নম্বর।

৩.২। **মৌলিক প্রশিক্ষণ-** কোন অফিসার কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী ও বাংলাদেশ জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর এই বিষয়ে সংরক্ষিত ৪০ নম্বরের অনুপাতে হিসাব করা হইবে। যেমন- মৌলিক প্রশিক্ষণে কোন অফিসারের ৭০% নম্বর পাইলে তিনি পাইবেন ৭০/১০০X৪০= ২৮ নম্বর।

CamScanner

৪। প্রতি লঘু দন্ড প্রাপ্তির জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে কোন অফিসারের পদোন্নতি দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে এবং প্রতি গুর" দন্ডের জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন বৎসর স্থগিত থাকিবে।

চলমান পাতা...৫৭

৫। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য একজন অফিসারকে অন্ততঃপক্ষে ৮০% নম্বর পাইতে হইবে এবং ৮০% নম্বর প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্য হইতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা হইবে।

৬। পদোন্নতি সম্পর্কিত উপরোক্ত বিধানসমূহ বাস্তবায়নে বা কোন অফিসারের প্রাপ্ত নম্বর মূল্যায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে বা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে বা কোন বিধি সংশোধন বা প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে সেই সম্পর্কে পুলিশ প্রধানের আদেশ চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

গ। পুলিশ সুপার ও তদুর্ধ পর্যায়ের বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডার অফিসারদের পদোন্নতির পদ্ধতি-

১। পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হইবে- (ক) অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা, (খ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, (গ) মৌলিক প্রশিক্ষণ (ঘ) ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ এবং (ঙ) সততা, মেধা ও পুলিশের ভাবমুর্তি গঠনে অবদান।

২। বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে নম্বর বিতরণ নিম্নরূপ হইবেঃ

২.১। **অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা-** অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার জন্য মোট ৩০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। প্রতি বৎসরের চাকুরীর জন্য ১.৫ নম্বর দেওয়া হইবে। এইরূপে ১০ বৎসরের চাকুরীর জন্য একজন অফিসার ১৫ নম্বর পাইবেন। তবে কোন অবস্থাতেই অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার জন্য কোন অফিসার ৩০ নম্বরের বেশী পাইবেন না।

২.২। **বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন-** মোট ৪৫ নম্বর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য সংরক্ষিত। একজন অফিসারের গত পাঁচ বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হইবে। জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত সময়ের জন্য কোন অফিসারের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়িত হইবে না। বিগত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রাপ্ত নম্বর মোট ৪৫ নম্বরের অনুপাতে হিসাব করা হইবে। যেমনঃ কোন অফিসার গত পাঁচ বৎসরে ৪০০ নম্বর পাইলে এই আইটেমে তাহার প্রাপ্য নম্বর হইবে ৪০০/৫০০X৪৫= ৩৬ নম্বর। কোন অফিসারের এক বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পাওয়া না গেলে এবং বিধিমতে সেই অবস্থা গৃহীত হইলে অন্যান্য বৎসরের গড় নম্বরের ভিত্তিতে তাহার প্রাপ্য নম্বর ধরা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ- কোন অফিসারের যদি তিন বৎসরের প্রতিবেদন পাওয়া যায় এবং

Scanned with CamScanner

তাহাতে তিনি যদি ২৪০ নম্বর পাইয়া থাকেন তবে উক্ত অফিসার পাইবেন ২৪০/৩০০X৪৫= ৩৬ নম্বর।

২.৩। **মৌলিক প্রশিক্ষণ-** বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী ও বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে গৃহীত মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরকে আনুপাতিক হারে ১০ নম্বরের মধ্যে বন্টন করা হইবে। যেমন- কোন অফিসার গড়ে উক্ত প্রশিক্ষনদ্বয়ে ৭০% নম্বর পাইলে তাহার প্রাপ্য নম্বর হইবে ৭০/১০০X১০= ৭ নম্বর।

চলমান পাতা...৫৮

২.৪। **ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ (মৌলিক প্রশিক্ষণ ব্যতীত)-** চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের জন্য ৫ (পাঁচ) নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ (এইড টু ওড ইনভেষ্টিগেশন ও বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী হইতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স) এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হইবে না। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য প্রাপ্য নম্বর নিম্নরূপঃ

(ক) অনুর্ধ ৭ দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা ওয়ার্কশপ/কর্মশালা	- .২ নম্বর
(খ) ৮ হইতে ১৫ দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা ওয়ার্কশপ	- .৪ নম্বর
(গ) ১৬-৩০ দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ	- .৬ নম্বর
(ঘ) ৩১-৪৫দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ	- .৮ নম্বর
(ঙ) ৪৫ দিনের উর্দ্ধে প্রতি প্রশিক্ষন	-১.৫ নম্বর

তবে শর্ত থাকে যে এইরূপ প্রশিক্ষণের জন্য কোন অফিসার ৫(পাঁচ) নম্বরের বেশী প্রাপ্ত হইবে না ।

২.৫। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন অফিসার যদি কোর্স পরিচালক, সমন্বয়ক, পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসাবে প্রশিক্ষণের সহিত সংশিষ্ট থাকেন, তবে তিনি ঐ কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে এবং ঐ প্রশিক্ষনের জন্য সংরক্ষিত নম্বর তিনি পাইবেন।

২.৬। সততা, মেধা ও পুলিশের ভাবমূর্তি বিনির্মাণে অবদান-

পুলিশ সুপার ও তদূর্ধ পর্যায়ের পুলিশ অফিসারের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সততা, মেধা ও পুলিশের ভাবমূর্তি বিনির্মাণে কোন অফিসারের অবদানের জন্য ১০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। পুলিশ সুপার, সিনিয়র পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই বিষয়ে মন্ত্রালয়ের জন্য পুলিশ প্রধান এর নেতৃত্বে মহা-পরিচালক (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) এবং সংশিষ্ট উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (যাঁহার অধীনে কর্মকর্তা কর্মরত আছেন) সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি থাকিবে। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই বিষয় মুল্যায়নের জন্য পুলিশ প্রধান এর নেতৃত্বে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্ততঃপক্ষে পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি থাকিবে। একজন পুলিশ অফিসারের মুল্যায়নে তাঁহার সার্ভিস

Scanned with CamScanner

রেকর্ড এবং পুলিশের অভ্যন্তরীন পর্যবেক্ষণ ইউনিটের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচিত হইবে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী / ফেব্র" য়ারী মাসে নিম্নলিখিত ছকে কমিটি ইহার মল্যায়ন সমাপ্ত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন্ অফিসার কত নম্বর পাইয়াছেন তাহা ঐ অফিসারকে জানাইবে।

চলমান পাতা...৫৯

ডিআইজি (প্রশাসন) প্রতি বৎসর কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন এবং এই সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি তাঁহার অফিসে সংরক্ষিত থাকিবে এবং সময়মত এই সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বির" দ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে ।

নিম্নলিখিত ছকে নম্বর প্রদান করা হইবেঃ

আইটেম	সংরক্ষিত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
সততা ও সুনাম	৪		
পুলিশ সার্ভিসের ভাবমূর্তি বিনির্মাণে অবদান	২		
মেধা	২		
দায়িত্ব পালন কালে সার্বিক নিরপেক্ষতা ও শৃঙ্খলা	২		

৩। প্রত্যেক লঘু দন্ডের কারণে এক বৎসর এবং প্রত্যেক গুর" দন্ডের কারণে তিন বৎসর কোন অফিসারের পদোন্নতি স্থগিত থাকিবে (দন্ড প্রদানের তারিখ হইতে)।

৪। পুলিশ সুপার ও সিনিয়র পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত উপ- মহাপরিদর্শক পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য একজন অফিসারকে অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ব্যতীত অবশিষ্ট ৭০ নম্বরের মধ্যে নন্যিতম ৮০% নম্বর পাইতে হইবে। ৮০% নম্বর প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে।

৫। উপ- মহাপুলিশ পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির জন্য ১০০ নম্বরের মধ্যে নন্যিপক্ষে ৮০ নম্বর পাইতে হইবে। ৮০ নম্বর প্রাপ্ত অফিসারদেরকে প্রাপ্ত নম্বরের মেধা ক্রম অনুসারে পদোন্নতি দেওয়া হইবে।

Scanned with CamScanner

৬। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে একাধিক অফিসার সমান নম্বর প্রাপ্ত হইলে পুর্বের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার পরের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারের পুর্বে পদোন্নতি পাইবেন। একই বিজ্ঞাপন/ঘোষণার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বর্তমান পদে বেশী নম্বর প্রাপ্ত অফিসারকে সিনিয়র গণ্য করিয়া পূর্বে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে।

চলমান পাতা...৬০

৭। অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পর্যন্ত কোনো পদে কোনো কর্মকর্তা যখনই পদোন্নতি পান না কেন পদোন্নতি প্রাপ্তির পর ঐ পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী গন্য করা হইবে। উপ-মহাপরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত অফিসারদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবেঃ

(ক) সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পূর্বের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার পরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসারের উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(খ) একই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের মধ্যে বেশী নম্বর প্রাপ্ত অফিসার কম নম্বর প্রাপ্ত অফিসারের উপর জ্যেষ্ঠতা লাভ করিবে।

৮। আলোচ্য পদ্ধতি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তার পদোন্নতির নম্বর নির্ধারণে কোনোর" প জটিলতা দেখা দিলে বা কোন বিধি সংশোধনের প্রয়োজন হইলে অথবা উলিখিত পদ্ধতি সম• র্কে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে অথবা কোন নতুন নিয়ম প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে সরকারের অনুমোদন গ্রহন করিয়া পুলিশ প্রধান প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করিবেন যাহা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৯। পদ শুন্য থাকিলে পুলিশ প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ত্রিশ দিনের মধ্যে পদোন্নতি কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিবে।

১০। পদোন্নতি বিবেচনার জন্য শুন্য পদের দ্বিগুন সংখ্যক অফিসারের নাম ও সার্ভিস রেকর্ড পদোন্নতি কমিটির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

Scanned with CamScanner

চলমান পাতা...৬১

পঞ্চম তফসীল

(ধারা-২৯)

সিনিয়র র‍্যাংকে নিয়োগ পদ্ধতি

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরণ	যোগ্যতা	বাছাই/পদোন্নতি বোর্ড (বোর্ডের গঠন)
১	মহাপুলিশ পরিদর্শক	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ২০ (বিশ) বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী - চেয়ারপার্সন ২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব - সদস্য ৩। স্বরাষ্ট্র সচিব - সদস্য ৪। সংস্থাপন সচিব - সদস্য ৫। অর্থ সচিব - সদস্য ৬। পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব
২	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক হিসাবে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ পুলিশ সার্ভিসে ১৭ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী - চেয়ারপার্সন ২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব - সদস্য ৩। স্বরাষ্ট্র সচিব - সদস্য ৪। সংস্থাপন সচিব - সদস্য ৫। অর্থ সচিব - সদস্য ৬। পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব
	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	১৪ বৎসর পুলিশ সার্ভিসে চাকুরীর অভিজ্ঞতা;	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী - চেয়ারপার্সন ২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব - সদস্য ৩। স্বরাষ্ট্র সচিব - সদস্য ৪। সংস্থাপন সচিব - সদস্য ৫। অর্থ সচিব - সদস্য ৬। পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব
	অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সিনিয়র পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে বাছাইয়ের মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ১২ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক- সদস্য সচিব (প্রশাসন)।
	সিনিয়র পুলিশ সুপার	পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সুপার পদে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ১২ বৎসর পুলিশ সার্ভিসে চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। স্বরাষ্ট্র সচিব - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের - সদস্য প্রতিনিধি

Scanned with CamScanner

				৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক- সদস্য সচিব (প্রশাসন)
৬	পুলিশ সুপার	অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ১০ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের - সদস্য প্রতিনিধি ৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক-সদস্য সচিব

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরণ	যোগ্যতা	বাছাই/পদোন্নতি বোর্ড (বোর্ডের গঠন)
৭	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	সহকারী পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ০৫ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক-সদস্য সচিব (প্রশাসন)।
৮	সহকারী পুলিশ সুপার (সিলেকশন গ্রেড)	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ০৪ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের - সদস্য প্রতিনিধি ৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক - সদস্য সচিব (প্রশাসন)।
৯	সহকারী পুলিশ সুপার	সরকার নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী। তবে পুর" ষের উ" চতা সর্বনিম্ন ৬৪" এবং মহিলাদের উ" চতা সর্বনিম্ন ৬১" হইবে।	(ক) এক তৃতীয়াংশ পুলিশ ইন্সপেক্টরদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে (খ) দুই তৃতীয়াংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক। তবে মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে পুলিশ প্রধানের মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকিবেন।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ প্রণয়নের পটভূমি ও ইহার দর্শনগত ও প্রয়োগিক ভিত্তি

যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাদেশ একটি অতি পুরাতন পুলিশ আইন নিয়া চলিতেছে, যাহা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উপযুক্ত নয়। ঔপনিবেশিক আমলে পুলিশ ছিল প্রভুদের সেবাদাস আর স্বাধীনতা উত্তরকালে গত কয়েক যুগ যাবৎ রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা অবৈধ প্রভাবের মাধ্যমে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত রাখে। পুলিশ সার্ভিসের ভিতরে ও বাহিরে পুলিশী ব্যবস্থা সম্ং র্কে জনগণের অসন্তোষ ও মোহমুক্তি এখন সুস্বীকৃত বিষয়। ক্ষমতাসীনদের অবৈধ যন্ত্র হইতে রূপান্তর করিয়া জনগণের সেবায় নিবেদিত একটি পুলিশ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ বাংলাদেশে রহিয়াছে।

এই পটভূমিতে প্রধান উপদেষ্টার অফিস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল ২০০৭ সালের মে মাসের ৩ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত একটি নতুন পুলিশ আইনের খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুর" র উদ্দেশ্যে কক্সবাজারে মিলিত হয়।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীগণের অলোচনা ও পর্যবেক্ষন ছিল নিম্নরূপঃ

জনগণের জীবনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য প্রয়োজন একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত পরিবেশ, যাহা লিংগ, জাতি, সামাজিক মর্যাদা, বয়স ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষের একটি মৌলিক মানবাধিকার।

বাংলাদেশ পুলিশের জন্য আইনগত অবকাঠামোতে অপ্রতুলতা আছে, যাহা পুলিশের উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। বাংলাদেশের জনগণের একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত পরিবেশের অভাব আছে। ইহার পরিবর্তন দরকার।

ক্ষমতার কেন্দ্র হইতে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে অতীতে পুলিশ সার্ভিস ইহার মখ্য উদ্দেশ্য "জনগণের সেবা করা" হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। অবৈধ ও অনাকাংখিত প্রভাবমুক্ত হইয়া ন্যায়সংগতভাবে এবং আইনের শাসনের সাথে সংগতি রাখিয়া তাঁহাদের কার্যাবলী সম্ং াদন করিতে হইলে পুলিশী ব্যবস্থার পরিচালনাগত(Operational) বিষয়াবলীর উপর পুলিশের সম্ং র্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

অধিক দায়িত্বের সংগে সংগে প্রয়োজন সামঞ্জস্যপর্ণ দায়বদ্ধতা। রাষ্ট্রের তিনটি অংগ (সরকার, সংসদ ও আদালত) এবং সমাজের সাধারণ জনগণের প্রতি থাকিবে পুলিশের এই দায়বদ্ধতা।

Scanned with CamScanner

জনগণকে সেবা প্রদানকারী সংগঠন হিসাবে পুলিশকে কেবল শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডে সীমিত থাকিলেই চলিবে না। বরং অপরাধ প্রতিরোধমূলক কর্মকান্ডসহ অপরাধের শিকার লোকদের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের ভূমিকা গ্রহন করিতে হইবে। অন্যদিকে পুলিশ সার্ভিসের অন্তিম ব্যবহারকারী হিসাবে জনগণকেও পুলিশের কর্মকান্ড মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং পুলিশকে পথনির্দেশ ও সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

অতীতে ও বর্তমানে পুলিশ সার্ভিস প্রয়োজনীয় সম্পদের মারাত্মক অপ্রতুলতায় ভুগিতেছে। বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত একটি পুলিশ সার্ভিস পাইতে হইলে এই খাতে অধিক সম্পদ বরাদ্দ করিতে হইবে। প্রোটোকল কাজে প্রায়শঃ ব্যবহারের ফলে পুলিশের মূল কর্তব্য সম্পাদনে সম্পদের টান পড়ে। অপরাধের প্রতিরোধ ও তদন্ত সম্পর্কিত কাজে যথোপযুক্ত মনোযোগ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করিতে হইবে।

খসড়া প্রণয়ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

- ✓ বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন পুলিশ আইন প্রয়োজন।
- ✓ তদন্ত ও পুলিশী কর্মকান্ডে অবৈধ হস্তক্ষেপকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে, কারণ ইহা পুলিশের সততার সহিত আপোষকামী এবং আইনের শাসনের সহিত সরাসরি সংঘাতমূলক।
- ✓ পরিচালনাগত(Operational) সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের থাকিতে হইবে, যাহা তাহারা লিংগ, জাতি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান বা বয়স নির্বিশেষে সমভাবে প্রয়োগ করিবে।
- ✓ পুলিশের কর্মকান্ড হইবে সৎ, দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ এবং আইনের শাসনের সহিত সংগতিপূর্ণ।
- ✓ পুলিশ তাহাদের কাজের জন্য সাধারণ জনগণসহ রাষ্ট্রের তিন অংগ- সরকার, সংসদ ও আদালতের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।
- ✓ পুলিশের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান এর মৌলিক ভাবার্থ হইবে তাহাদের কাজকর্ম আইনের শাসনের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা ইহা নিশ্চিত করা।
- ✓ পুলিশ সার্ভিসের এই উদ্দেশ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হইবে যে পুলিশের কাজ হইল বাংলাদেশের জনগণের সেবা করা, ক্ষমতাসীনদের নয়।
- ✓ শক্তি প্রয়োগ ন্যূনতম থাকিবে।
- ✓ আইন প্রয়োগের নামে নানান বেআইনী উপায়ের ব্যাপক ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।
- ✓ অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- ✓ পুলিশ সার্ভিসে পেশাদারিত্ব সংরক্ষণে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা ও মেধার ভিত্তিতে হইতে হইবে।
- ✓ কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতেই পুলিশের মূল্যায়ন হইবে এবং এই সম্পর্কিত মানদন্ড নির্ধারণ করিতে হইবে।
- ✓ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসারে কার্যসম্পাদনের জন্য পুলিশকে যথেষ্ট সম্পদ প্রদান করিতে হইবে।

Scanned with CamScanner

নাম ও পদবী

জনাব এ.এস. এম. শাহজাহান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
সাবেক মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
চেয়ারম্যান, ড্রাফটিং কমিটি

জনাব মুস্তাফিজুর রহমান
পরিচালক
প্রধান উপদেষ্টার অফিসের প্রতিনিধি

জনাব এন.বি.কে. ত্রিপুরা
অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ

জনাব ডঃ বাহার'' ল আলম
অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
স্পে• শাল ব্রাঞ্চ

জনাব শেখ মোঃ সাজ্জাত আলী
উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ

জনাব জসিম উদ্দীন

নাম ও পদবী

জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন
যুগ্ম-সচিব
আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

জনাব রাশেদুল ইসলাম
উপ-সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

জনাব সরেন লরসেন
প্রোগাম অফিসার
জাতিসংঘের প্রতিনিধি

জনাব হিউবার্ট স্টেবারহফার
প্রোজেক্ট ম্যানেজার
জাতিসংঘের প্রতিনিধি, পুলিশ পুনর্গঠন কর্মসূচী

জনাব বেনজীর আহমদ
উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সদর দপ্তর

জনাব মতিউর রহমান

Scanned with CamScanner
CamScanner

যুগ্ম- পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ
পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তর

জনাব মোঃ হাসান-উল-হায়দার
সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সদর দপ্তর

জনাব গোলাম রসুল
বিশেষ পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ

জনাব সালমা বেগম
অতিরিক্ত উপ- পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

Scanned with CamScanner

প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন: **(মূল প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬.২৩ দ্রষ্টব্য ৮৯ পৃষ্ঠা):**

১। পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা:

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে জনসাধারনের মানবাধিকার সুরক্ষা করা। এ দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশ পুলিশের যথাযথ পেশাদারি দায়িত্ব সুনিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তি আত্মীকরণ, বিজ্ঞান-ভিত্তিক তদন্ত, গবেষণাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, পুলিশিং কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনায় পুলিশের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ নিরসন, পুলিশের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, পুলিশ সদস্যদের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কল্যাণসহ সাবিক কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। এসব উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার যথাশীঘ্র গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করবেন।

(খ) এই কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কমিশন হিসেবে বিবেচিত হবে।

২। শিরোনাম:

এই কমিশনের শিরোনাম হবে “পুলিশ কমিশন”।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের মহান সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহের সুরক্ষা ও নাগরিক কর্তব্যবোধের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন দায়িত্ব পালন করবে।

- রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা;
- মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা;
- পুলিশের সর্বদা জনগণের সেবা করবার আবশ্যিক কর্তব্য পালন সুনিশ্চিত করা;
- সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা সংক্রান্ত নাগরিকের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা;
- মানবাধিকার সুরক্ষা, কর্ম স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে জন-কাঙ্খিত ধারায় পরিচালিত করা;
- বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সদস্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পুলিশের কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

 পুলিশের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ রোধ করা এবং পুলিশ সদস্যদের পেশদারি বিষয় সংক্রান্ত সংক্ষোভ নিরসনে ভূমিকা রাখা।

৪। কমিশনের কার্যালয়:

এই কমিশনের একটি কার্যালয় থাকবে যা রাজধানী ঢাকার যেকোন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত হবে। কমিশনের দাপ্তরিক কর্মকান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্থায়ী ও প্রেষণে নিয়োজিত জনবল দ্বারা সাচিবিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৫। কমিশনের সদস্য:

পদাধিকারবলে নিযুক্ত চেয়ারপারসনসহ ১১ (এগার) জন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হবে।

৫.১ । কমিশনের চেয়ারপারসন নিয়োগ:

(১) আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি কমিশনের চেয়ারপারসন হবেন।

(২) কমিশনের সকল সভায় চেয়ারপারসন সভাপতিত্ব করবেন।

৫.১.১। চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতি:

চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে কমিশনের সদস্যদের মধ্য হতে একজন কমিশনের সভার সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

৫.২। সদস্য নির্বাচন/মনোনয়ন:

(১) পুলিশ কমিশনের সদস্যগণ স্থায়ী ও খন্ডকালীন হিসেবে নিম্নরূপে মনোনীত/নির্বাচিত/নিযুক্ত হইবেন।

(ক) জাতীয় সংসদের "স্পীকার", সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার সাথে পরামর্শক্রমে ৪ (চার) জন সংসদ সদস্য মনোনীত করবেন। তন্মধ্যে ০২ (দুই) জন সরকারি দলের ও ০১ (এক) জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ০১ (এক) জন অন্যান্য দলগুলোর সমাঝোতার ভিত্তিতে মনোনীত হবেন ।

(খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই কমিশনের ৬ (ছয়) ধারায় বর্ণিত পুলিশ কমিশন সিলেকশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৬ (ছয়) জনের তালিকা হতে ৪ (চার) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মনোনীত করবেন।

(গ) উপধারা ৫.২ এর (খ) এ বর্ণিত মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে ১ (এক) জন আইন বিশেষজ্ঞ, ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি, ১ (এক) জন সমাজ বিজ্ঞান বা পুলিশিং বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একাডেমিশিয়ান ও ১ (এক) জন মানবাধিকারকর্মী। এ সকল সদস্য অরাজনৈতিক সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

(ঘ) অরাজনৈতিক সদস্যদের মধ্যে অন্তত একজন (০১) নারী হবেন।

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং

(চ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ- যিনি কমিশনের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন ।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ প্রজ্ঞাপন ও সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবে।

(৩) (ক) স্থায়ী সদস্য: উপধারা ৫.১ এর ১ মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনের চেয়ারম্যান এবং উপধারা ৫.২ এর ১(খ) মোতাবেক মনোনীত ৪ (চার) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ মোট ৫ (পাঁচ) জন স্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) খন্ডকালীন সদস্য: উপধারা ৫.২ এর ১(ক) মোতাবেক মনোনীত ৪ (চার) জন সংসদ সদস্য, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশসহ মোট ৬ (ছয়) জন খন্ডকালীন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান আপিল বিভাগের বিচারপতির সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং অন্যান্য স্থায়ী সদস্যগণ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে। এছাড়া খন্ডকালীন সদস্যগণ পদাদিকার বলে বিবেচিত হবেন।

৬। পুলিশ কমিশন সিলেকশন কমিটি ও অরাজনৈতিক সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি:

সরকার পুলিশ কমিশনের ৪ (চার) জন অরাজনৈতিক সদস্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে নামের তালিকা প্রণয়নের নিমিত্তে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পুলিশ কমিশন সিলেকশন কমিটি গঠন করবে, যার চেয়ারপার্সন হবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁর কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি। অন্যান্য সদস্যরা হবেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের কম্পোট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও পুলিশের একজন অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি ।

কমিটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়নের জন্য ছয়জন (০৬) উপযুক্ত ব্যক্তির নামের একটি প্যানেল উপস্থাপন করবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্যানেলভুক্ত ছয়জনের (০৬) মধ্যে চারজনকে (০৪) কমিশনের সদস্য হিসেবে মনোনীত করবেন।

এ উদ্দেশ্যে কমিটি একটি সুনির্দিষ্ট সিলেকশন বা নির্বাচন পদ্ধতি প্রণয়ন করবেন। পুলিশ কমিশনের সচিবালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৬.ক। অরাজনৈতিক সদস্য নির্বাচন:

(১) পুলিশ কমিশন সিলেকশন কমিটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে অরাজনৈতিক সদস্যের নামের তালিকা প্রণয়ন করবে।

(২) পুলিশ কমিশন সিলেকশন কমিটি কর্তৃক নির্বাচনী বা বাছাই প্রক্রিয়া শুরুর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ইহা সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) অরাজনৈতিক সদস্যগণ নিখুঁত চরিত্র, সততা ও প্রমাণিত/প্রতিষ্ঠিত পেশাগত দক্ষতার অধিকারী হবেন।

৬.খ। চেয়ারম্যান ও অরাজনৈতিক সদস্যদের বাছাই করার মাপকাঠি:

কোন ব্যক্তি পুলিশ কমিশনের সদস্য হবার যোগ্য হবেন না যদি-

(১) তিনি নিয়োগপূর্ব ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রতিনিধি বা জনসেবক থাকেন; বা

(২) তিনি দেওলিয়া, ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হন; বা

(৩) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন; বা

(৪) তিনি বাংলাদেশের সেবায়/চাকুরীতে একটি লাভজনক পদে থাকেন; বা

(৫) তিনি চাকুরীরত থাকেন কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় বা সরকারি মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থায় বা যাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক অংশ বা স্বার্থ আছে এমন কোন সংস্থায়;

(৬) তিনি দুর্নীতি বা অন্য কোন অসদাচরণের কারণে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামুলক অবসরপ্রাপ্ত হন;

(৭) তিনি ফৌজদারি অপরাধে কারাদন্ড ভোগ করেন; বা

(৮) ইহাতে তার কোন স্বার্থের সংঘাত ঘটে বা থাকে।

৭। পুলিশ কমিশনের কার্যাবলী:

(১) পুলিশ কমিশন এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে এর কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসের নিম্নলিখিত কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করবে এবং পুলিশি ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণে সহায়তা করবে। কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে সরকারের সাথে সমন্বয়পূর্বক জনস্বার্থে পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(ক) জাতীয় জননিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা;

(খ) পুলিশ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/প্রবিধি প্রস্তুত, সংশোধন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়) প্রেরণ করা;

(গ) পুলিশের আইনগত বলপ্রয়োগের পরিধি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা;

(ঘ) পুলিশের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রমিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা;

(ঙ) পুলিশের প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সময়ের চাহিদার আলোকে বিশেষায়িত ইউনিট সমূহের গঠন সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;

(চ) পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিষয়গুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ছ) পুলিশ সদস্যদের সংক্ষোভ নিরসন বা Grievance Redress এর বিষয়গুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(জ) পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ ব্যবস্থাপনা (Wellbeing) পর্যালোচনা করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সরকারের কাছে দাখিল করা;

(ঝ) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় (Criminal Justice System) বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অধিকতর গতিশীল করা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতের বাধা দূর করার ব্যবস্থা করা;

(২) নিয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার স্বার্থে পুলিশ কমিশন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেঃ

(ক) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ হিসাবে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত অতিরিক্ত আইজিপির নিম্ন পদস্থ নন এমন তিনজন (০৩) কর্মকর্তার একটি প্যানেল মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা;

(খ) স্বাভাবিক অবসরের তারিখ যাই হোক না কেন নিযুক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ এর অফিসের মেয়াদ সর্বনিম্ন দুই (০২) বছর এবং সর্বোচ্চ তিন (০৩) বছর হবে;

(গ) পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও বিশেষায়িত ইউনিটসমূহের প্রধান, রেঞ্জ ডিআইজি ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার পদায়নের লক্ষ্যে প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সুপারিশ করবেন।

(ঘ) ধারা ৭ এর ২ (খ) এ বর্ণিত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশকে নিম্নবর্ণিত কারণে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সিদ্ধান্তানুযায়ী/সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপসারণ করতে পারবেন

(১) ফৌজদারি অপরাধে কারাদন্ড প্রাপ্ত হলে:

(২) নৈতিক স্খলন;

(৩) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা;

(৪) দেউলিয়া বা ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হলে;

(ঙ) ধারা ৭ এর ২ (গ) এ বর্ণিত পুলিশ অফিসারদের দুই (০২) বৎসরের স্বাভাবিক মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে বদলী করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদানের পর সরকারের নিকট কারণ উল্লেখপূর্বক পদায়নের সুপারিশ করা;

(৩) প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে নিম্নরূপ তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের নিকট পেশ করা:

(ক) কমিশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

(খ) পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকান্ডের সাধারণ বিবরণ;

(গ) দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা;

(ঘ) পুলিশ, ফৌজদারি মামলা রুজুকরণ, কারাগার এবং প্রবেশন বিষয়ক আইন ও কার্যবিধি এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনসমূহের আধুনিকায়ন ও সংস্কারের সুপারিশ করা;

(ঙ) পুলিশিং কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহের প্রস্তাবনা বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদে সুপারিশ করা;

(চ) পূর্ববর্তী বছরে দেশের অপরাধ পরিস্থিতি, অপরাধ নিবারণ, নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত ইত্যাদি বিষয়ে তুলনামূলক বিবরণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

(৪) পুলিশ সদস্যদের কর্মদক্ষতা, কল্যাণ ও মনোবলের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহের কারণ, তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং তা দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে সুপরিশ করা;

(৫) সমাজে অপরাধ প্রবণতা, নাগরিকদের সচেতনতা, অপরাধ-ভীতি, অপরাধের ফলে মানসিক ও আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করতঃ অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশ বাহিনী ও সরকারের করণীয় সুপারিশ করা;

(৬) কমিশন তার কর্মের প্রয়োজনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বা অন্য কোন সংস্থার নিকট তথ্য চাইতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কমিশনকে ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবেন।

৮। কমিশনের সদস্যের মেয়াদ:

(১) কমিশনের সংসদ সদস্য ও অরাজনৈতিক সদস্যেদের মেয়াদ চার (০৪) বৎসর হবে যদি না তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা পদ হতে অপসারিত হন। তবে সংসদ ভেঙ্গে গেলে জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের সদস্য পদ শূন্য ঘোষিত হবে।

(২) কোন সদস্যই দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সদস্য হবার যোগ্য হবেন না।

(৩) কমিশনের সভায় উপস্থিতির জন্য বিধিমতে সদস্যদের ভ্রমনভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে।

(৪) বিধি অনুযায়ী সকল সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

৯। কমিশনের সদস্যদের অপসারণ:

নিম্ন বর্ণিত কারণে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সিদ্ধান্তানুযায়ী/সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পুলিশ কমিশনের কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারবেন:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব না থাকলে;

(খ) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা থাকলে;

(গ) কমিশনে উপস্থাপিত কোন বিষয়ে তাঁহার স্বার্থ থাকার বিষয় গোপন করিলে;

(ঘ) ফৌজদারি অপরাধে কারাদন্ড প্রাপ্ত হলে:

(ঙ) দেউলিয়া বা ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হলে;

(চ) কমিশনের সুখ্যাতি নষ্ট বা দুর্নামের কারণ হলে;

(ছ) কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

১০। সভার মাধ্যমে কার্য পরিচালনা:

(১) পুলিশ কমিশনের কাজকর্ম সভার মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে।

(২) চেয়ারপারসন কর্তৃক অথবা তিন জন (০৩) সদস্যের তলব নামায় সভা আহবান করা যাবে।

(৩) কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতি সভার কোরাম পূর্ণ করবে।

(৪) কার্যসূচিসহ অন্ততঃপক্ষে এক সপ্তাহের নোটিশ প্রদান করে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় আহবানকৃত সভায় সদস্যগণ উপস্থিত থাকবেন। তবে প্রতি মাসে কমিশনের অন্ততঃপক্ষে একটি সভা হতে হবে এবং ন্যূনপক্ষে ২৪ ঘন্টার স্বল্প নোটিশে জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

(৫) কমিশনের চেয়ারম্যান সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট প্রদান করবেন না। তবে কোন বিষয়ে সদস্যদের ভোট সমান দুই ভাগে বিভক্ত হলে চেয়ারপারসন নির্ধারণী (কাস্টিং) ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(৬) কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের (Majority) ভোটেই গৃহীত হবে।

(৭) কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জনগণের সহিত পরামর্শ করতে পারবে।

(৮) বিশেষ কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য কমিশন যে কোন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(৯) কার্যাদি পরিচালনার জন্য কমিশন ইহার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

১১। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Complaint Management Committee)

১) কমিশনের তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে।

২) এই কমিটি মূলত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রচলিত যে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

৩) পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে পুলিশ সদর দপ্তরে যে অভিযোগ আসে সেগুলো অনুসন্ধানের পর অভিযোগকারি সংক্ষুব্ধ হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল কমিটির নিকট লিখিত আবেদন করবে।

৪) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অভিযোগকারীর লিখিত আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপীল নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে।

৫) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আপীল রিভিউকালে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৬) কমিটি এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবেন। কমিশন প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭) কমিটির সদস্যদের সম্মানী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কমিশনের বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৮) এই অধ্যাদেশে যাই থাকুক না কেন কমিটির সদস্যগণ আপীল পর্যালোচনাকালে বিধি দ্বারা নির্ধারিত আইনি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সুরক্ষা ভোগ করবে।

৯) কমিটি আপীল নিষ্পত্তি ও তার প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে করবে।

১২। সংক্ষোভ নিরসন কমিটি-জিআরসি (Grievance Redress Committee-GRC):

(১) কমিশনের তিনজন (০৩) সদস্যের সমন্বয়ে পুলিশ সদস্যদের পেশাগত সমস্যা ও তা থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত সমস্যা নিরসনের জন্য একটি 'সংক্ষোভ নিরসন কমিটি' গঠিত হবে। এই কমিটি সংক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্যদের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

(২) এই কমিটি সংক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্যদের ক্ষোভ নিরসনের লক্ষ্যে তদন্ত/অনুসন্ধানকারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত/অনুসন্ধানের পর অভিযোগকারি পুলিশ সদস্য সংক্ষুব্ধ হলে সেই পুলিশ সদস্য জিআরসিতে আবেদন করতে পারবে।

(৩) সংক্ষোভ নিরসন কমিটি সংক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্যর লিখিত আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপীল নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে।

(৪) সংক্ষোভ নিরসন কমিটি কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তিকালে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫) কমিটি এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবেন। কমিশন প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬) কমিটির সদস্যদের সম্মানী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কমিশনের বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৭) এই অধ্যাদেশে যাই থাকুক না কেন কমিটির সদস্যগণ আপীল পর্যালোচনাকালে বিধি দ্বারা নির্ধারিত আইনি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সুরক্ষা ভোগ করবে।

৮) কমিটি আপীল নিষ্পত্তি ও তার প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষুব্ধ পুলিশ সদস্যকে অবহিত করবে।

১৩। গবেষণা সেল গঠন:

দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলের অপরাধ পরিস্থিতি, পুলিশের আভিযানিক সক্ষমতা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অপরাধ প্রতিরোধে জনগণের অংশীদারিত্ব, পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস, পুলিশি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, পুলিশের কর্মপরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে পুলিশ কমিশনের একটি গবেষণা সেল থাকবে।

এ সেল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুলিশ স্টাফ কলেজসহ পুলিশের নীতি-নির্ধারণী পযায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্ম সম্পাদন করবেন এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৪। কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা:

(ক) কমিশন সদস্যগণ সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানজনক ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(খ) সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়া, গণযোগাযোগ, জরিপ, গবেষণাসহ অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য কমিশনকে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে ।

(গ) সফরকালে কমিশন সদস্যগণ কমিশন নির্ধারিত হারে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন।

(ঘ) কমিশনের বিবিধ ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট বাংলাদেশ পুলিশ কিংবা সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হবে।

(ঙ) কমিশন সামগ্রিক বাজেট পরিকল্পনা সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন।

১৫। বিবিধ বিষয়:

(১) যদি কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এমন কিছু করণীয় যা এই কমিশনের ধারাতে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নাই অথচ জনস্বার্থে তার প্রয়োজন রয়েছে, কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সেই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় কাযক্রম গ্রহণ করতে পারবে ।

(২) কমিশনের কার্যক্রম শুরু হবার পূর্বে সরকার বা পুলিশ কমিশনের আওতায় পড়ে এমন কার্যক্রম শুরু হয়ে থাকলে সেইসব কার্যক্রম সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের আইন, বিধি ও পদ্ধতি অনুসারে কার্যক্রম চলতে থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

নং- ৪৪.০০.০০০০.০৯৬.৯৯.০১৬.২৪-২৩৭

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪৩১ / ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয় : পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রথম খসড়া প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: পুলিশ সংস্কার কমিশনের স্মারক নং:৪৪.০০.০০০০.০৬০.৯৯.০০১.২৩-৯৪, তারিখ: ০৫-১২-২০২৪ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রথম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য "কেমন পুলিশ চাই" বিষয়ক জনমত গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জরিপের সুপারিশ মালা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপস্থাপিত খসড়ায় সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রতিবেদনের মুদ্রণে ত্রুটি, ভাষাগত সম্পাদনা, আইনকানুন ও বিধিবিধানের পুর্নবিবেচনা ও সম্পাদনার উপরে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য এ বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে।

এমতাবস্থায়, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রথম খসড়া প্রতিবেদনে উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের মতামত নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

(রেবেকা খান)
উপসচিব
ফোনঃ ০২-২২৩৩৫৪৫২৯
Email: police3@mhapsd.gov.bd

সদস্য সচিব
পুলিশ সংস্কার কমিশন

Scanned with CamScanner
CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

বিষয়: পুলিশ সংস্কার কমিশন এর প্রথম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	নাসিমুল গনি সিনিয়র সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৪ পৌষ ১৪৩১/২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

১৪ পৌষ ১৪৩১/২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে "কেমন পুলিশ চাই" বিষয়ক পুলিশ সংস্কার কমিশন এর প্রথম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, পুলিশ উইং এর সকল উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব এবং র‍্যাব শাখার উপসচিব সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্য বিষয়: পুলিশ সংস্কার কমিশন এর প্রথম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন।

০২। **উপস্থাপনা ও আলোচনা:**

পুলিশ সংস্কার কমিশনের ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৬০.৯৯.০০১.২৩-৯৪ নম্বর স্মারকে প্রেরিত প্রস্তাবটি উপসচিব (পুলিশ-৩) জনাব রেবেকা খান সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত প্রস্তাবটি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশ বাহিনীর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা/সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা, একবিংশ শতাব্দীর চালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিদ্যমান আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো হালনাগাদ করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রণয়ন করা, অপরাধ তদন্ত পদ্ধতি, সনাতন ও ডিজিটাল ফরেনসিক কর্মদক্ষতাসহ প্রয়োজনীয় জনবল, সম্পদ ও প্রযুক্তির যৌক্তিক পুন:বিন্যাস বা বৃদ্ধি করে যে কোন আইন শৃংখলা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশ তথা আইন শৃংখলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন/জেলা পুলিশের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন পুলিশ/জেলা পুলিশে আইনি পরামর্শক, পদায়ন/নিয়োগ।

আরও দেখা যায় যে, কমিশনে ব্যবহৃত যে পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হলো-গবেষণা ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিতভাবে চাহিদা নিরূপন, "কেমন পুলিশ চাই" জনমত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ ও মতামত, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মী ও সমাজের সকল স্তরের অংশীজনদের জড়িত করা, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মী ও সমাজের সকল স্তরের অংশীজনদের জড়িত করা।

কমিশন কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়াদি- আইনী ও প্রবিধানিক: পুলিশ আইন ১৮৬১সহ ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮, পিআরবি ১৯৪৩ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুননিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ, প্রস্তাব, প্রতিষ্ঠানিক বিষয়াদি: লোকবল, সাজ-সরঞ্জাম, অবকাঠামো, যানবাহন, অস্ত্র-গোলাবারুদ, মানবাধিকার ও আইনের শাসন, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ড সংক্রান্ত, বল প্রয়োগ (use of force), অযাচিত/বহি:স্থ প্রভাবমুক্ত পেশাদারী পরিচালনার ব্যবস্থাগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় নাগরিক/স্বাধীন তদারকী সংগঠন প্রতিষ্ঠান,বাংলাদেশ পুলিশের প্রস্তাবিত সংস্কার ও পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে কী পারফরম্যান্স, ইন্ডিকেটরস (KPIs)-এর ভূমিকা,বাংলাদেশ পুলিশের দুর্নীতি: বিস্তার, প্রকার ও প্রতিকার [দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থাপনা,সাইবার ক্রাইম, ইকোনমিক

Scanned with CamScanner
CamScanner

ক্রাইম, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইকোনমিক ক্রাইম ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম মোকাবেলায় দক্ষ প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্ত আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক , সিআইডি ফরেনসিক সংস্কার প্রস্তাব, চাকুরীপ্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন, সংগঠনগত পরিচালন ব্যবস্থা OOS (Organisational Operating System)।

সংস্কার প্রস্তাবসমূহ-স্বল্প মেয়াদী সংস্কার, মধ্য মেয়াদী সংস্কার, দীর্ঘ মেয়াদী সংস্কার।

সমাপনী মন্তব্য-সংক্ষেপে কমিশন কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরা, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি পেশাদার পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠার অংগীকার।

০৩। পুলিশ সংস্কার কমিশন এর প্রথম খসড়া প্রতিবেদনের উপর জননিরাপত্তা বিভাগের নিম্নোক্ত বিষয়ে মতামত পুলিশ সংস্কার কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের (খসড়া) এর উপর জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতঃ

মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, আইনশৃংখলা রক্ষা করা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সর্বোপরী পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশ বাহিনীর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা/সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিশন এর পুলিশ সংস্কার এ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল প্রতিবেদন এর আলোকে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনার জন্য মতামত প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা একবিংশ শতাব্দীর চালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশের সক্ষমতা একদিকে বৃদ্ধি করতে এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান মেনে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জনগনের আস্থার স্থানে অবস্থান করবে এবং সার্বিকভাবে পুলিশ বাহিনীকে একটি দক্ষ, কর্তব্য পরায়ণ, মর্যাদাশীল বাহিনী হিসেবে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জীবন, সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

১। সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করাঃ

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বাহিনীর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং, অভিযোগ নিষ্পত্তি, পলিসি প্রণয়ন এবং পুলিশের নিরাপত্তা সামগ্রিক বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশের অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একই সাথে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য ও জননিরাপত্তা বিভাগ , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দক্ষতার সাথে কাজ করছে। স্বাধীন পুলিশ কমিশন করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সচিবকে কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে এবং সদস্য সচিব রাখা হয়েছে পুলিশ প্রধানকে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ যেখানে মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ বাহিনী উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাহিনী সেখানে সিনিয়র সচিবকে সদস্য হিসেবে রেখে পুলিশ প্রধানের অধিনস্থ হয়ে কাজ করার প্রস্তাবের সামিল। স্বাধীন পুলিশ কমিশন করলে নিয়ন্ত্রণকারী কোন কতৃপক্ষ থাকবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং পুলিশ বাহিনীকে যৌক্তিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে না। সুতরাং স্বাধীন পুলিশ কমিশন করার প্রস্তাবের সাথে জননিরাপত্তা বিভাগ যৌক্তিক কারণে দ্বিমত পোষণ করছে।

২। মেট্রোপলিটন/জেলা পুলিশের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগঃ

পুলিশ বাহিনী আইন শৃংখলা রক্ষার্থে এবং জনগনের জান মাল রক্ষার্থে নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করে। বিচার করা/আদেশ দানের কাজ নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নয়। বিচার করা/নির্বাহী আদেশ দানের জন্য সরকারের পর্যাপ্ত সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা স্বাপেক্ষে সরকার এ ক্ষেত্রে বিধিসম্মত পদ্ধতিতে অধিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দান করতে পারে। পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চাওয়ার প্রেক্ষিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কার্যসম্পাদনের জন্য দেয়া হয়নি এই পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়নি কোথাও। এছাড়া এক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যক্রম পরিচালনায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে যার পরিণতি অনুমেয়। কেউ কারো কাজ করবে না। পুরো শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। বিদ্যমান আইনী কাঠামোতে উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য নয় মর্মে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কাছে প্রতিয়মান হয়। "An armed man shall be controlled by an unarmed man". বিষয়টি মাথায় রেখে পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতায়ন এর প্রস্তাব করতে হবে।

Scanned with CamScanner

CamScanner

৩। আইনী ও প্রবিধানিক: ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮, পিআরবি ১৯৪৩, পুলিশ আইন ১৮৬১,সহ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ প্রস্তাবঃ

বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান সমূহ পুলিশ বাহিনীকে দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতার সাথে কাজ করার জন্য যথেষ্ট। উক্ত আইন বিধিসমূহ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নেই। উক্ত আইন ও বিধি বিধানসমূহ মেনে কাজ করলে অবশ্যই পুলিশ বাহিনী জবাবদিহিতার সাথে কাজ করতে পারবে। কতিপয় পুলিশ সদস্যের আইন না মানার কারণে এবং আইন বহির্ভূতভাবে রাজনৈতিক প্রভাবে, নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করার জন্যই পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। সংস্কার প্রস্তাবে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮, পিআরবি ১৯৪৩, পুলিশ আইন ১৮৬১,সহ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আইন ও বিধিগুলোর কোন সেকশন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীর স্বচ্ছ এবং জবাব দিহিতার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে কতিপয় নতুন অপরাধের ধরণ বিবেচনায় (যেমন সাইবার ক্রাইম) এবং আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার/পদ্ধতি অনুসরণে তদন্তকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা বিবেচনায় আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে/অন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে কতিপয় বিষয় সংশোধনের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

৪। জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠনঃ

জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কমিশনের যে কার্যপরিধি রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশনের কার্যাবলী:

(১) জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে এর কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসের নিম্নলিখিত কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করবে এবং পুলিশি ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণে সহায়তা করবে। কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে সরকারের সাথে সমন্বয়পূর্বক জনস্বার্থে পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(ক) জাতীয় জননিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা;

(খ) পুলিশ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/প্রবিধি প্রস্তুত, সংশোধন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়) প্রেরণ করবেন;

(গ) পুলিশের আইনগত বলপ্রয়োগের পরিধি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা;

(ঘ) পুলিশের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রমিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করা;

(ঙ) পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়গুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(চ) পুলিশ সদস্যদের সংক্ষোভ নিরসন বা Grievance Redress এর বিষয়গুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ছ) পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ ব্যবস্থাপনা (Wellbeing) পর্যালোচনা করা এবং এতদসংক্রান্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সরকারের কাছে দাখিল করা;

(জ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট পর্যালোচনা ও ঝুঁকির অগ্রাধিকার নিরূপনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) পুলিশ ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্ত: প্রতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্তে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ঞ) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি আত্মীকরণ, ব্যবহার নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ট) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় (Criminal Justice System) বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অধিকতর গতিশীল করা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতের বাধা দূর করার ব্যবস্থা করা;

উক্ত সকল কাজ বর্তমানে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা হচ্ছে। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের GRS সিস্টেমের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণ রয়েছে এর অধীনে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে এবং নিয়মিত প্রতিবেদন দেয়া হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও করা হচ্ছে সেখানে নতুন করে পুলিশের জন্য আলাদা GRS সিস্টেম চালু করা হলে তা জাতীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি সিস্টেমের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠন করা হলে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজের ওভারল্যাপিং হবে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। এ বিবেচনায় যেহেতু জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাতীয়

Scanned with CamScanner

CamScanner

জননিরাপত্তা কমিশনের প্রস্তাবিত সকল কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেহেতু জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠন যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয় না।

৫। বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ড এবং তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত:

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৫৪ এবিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও ধারা ১৬৭ এর অধীনে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতনের বিষয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক কারণে কেবল হয়রানির উদ্দেশ্যে পুলিশ উক্ত সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরোয়ানা ছাড়াই হাজার হাজার বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতালম্বীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রেফতারকৃতদেরকে সরকারের আজ্ঞাবহ নিম্ন আদালতের মাধ্যমে যুক্তিহীন ও অসংখ্য দিনের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে। অধিকতর তদন্তের জন্য রিমান্ডের কথা বলা হলেও রিমান্ডে নিয়ে মূলতঃ আসামীদেরকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এরূপ নির্যাতনে বহু মানুষকে পঙ্গুত্ববরণ, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মতামত হলো ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৫৪ এর অধীনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে হলে গ্রেফতারের ক্ষেত্র সমূহ ফৌঃ কাঃ ৫৪ ধারায় উল্লেখিত ৯ টি ক্ষেত্র সমূহ এর উপস্থিতি আছে কিনা এটা নিশ্চিত করতে হবে জনগনকে প্রচারের মাধ্যমে উক্ত ০৯ টি ক্ষেত্র সমূহ জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে, এবং আদালতের শুনানী ছাড়া কারাগারে প্রেরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে ৫৪ ধারার নামে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে এনে অন্য কোন মামলায় যেখানে অজ্ঞাত আসামী উল্লেখ করা আছে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করে জন হয়রানী করা হয়। হয়রানী বন্ধে বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে অবশ্যই লিখিত ভাবে রিপোর্টে থাকতে হবে তাকে ৫৪ ধারাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রমাণের দায়িত্ব দু'পক্ষেরই থাকবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। প্রমাণের দায়িত্ব দু'পক্ষেরই থাকবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সকল গ্রেফতারের সময় পুলিশের নির্ধারিত পোশাকে এবং বডি ক্যামেরাসহ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে ১৬৭ ধারায় রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জিজ্ঞাসাবাদ এর কক্ষটি কাচ দিয়ে ঘেরা থাকবে। আসামীর প্রতি নির্যাতন এর অভিযোগ হ্রাস পাবে।

এক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট মামলার হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করা যেতে পারে।

৬। বাংলাদেশ পুলিশ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাঃ

বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল যৌক্তিকতা প্রদান করা হয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আরো দক্ষ এবং উপযোগী করতে এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার প্রয়োজন রয়েছে তবে যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তার সকল বিষয়ে বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এবং বর্তমান প্রচলিত বিধি অনুযায়ী আবেদন করলে উক্ত বিষয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ব্যয় বিবেচনায় উক্ত প্রস্তাব ব্যয় বহুল। উক্ত ব্যয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ না করে পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ জীবন মান উন্নত করণ, লজিস্টিক বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার নির্মাণ, তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত প্রতিয়মান হয়।

৭। ডিজিটাল ফরেন্ সিক ল্যাব প্রতিষ্ঠাঃ

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছভাবে তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটি আধুনিক মানসম্মত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তবে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে উক্ত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালের অধীন করা যেতে পারে।

৮। "কেমন পুলিশ চাই" জনমত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ ও মতামতঃ

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বিগত ৩১-১০-২০২৪ ইং তারিখে 'কেমন পুলিশ চাই' উপপাদ্যের আওতায় একটি প্রশ্নমালা অনলাইনে প্রচার করা হয়। মোট ২৪,৪৪২ জন মতামত প্রদান করেছেন। জরীপের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে মর্মে প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত জরীপে মাত্র ২৪,৪৪২ জনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে এবং উক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি বা টুলস (Statistical measures and tools) ব্যবহার করা হয়নি। কোনো তথ্য সংগ্রহকারী (data collector) নিয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা এ কারণে সাধারণ জনগন এবং দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বড় অংশ শিক্ষার্থীদের মতামত আলাদাভাবে নেয়া হয়েছে কিনা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। ফলে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী বা আমজনতার মতামত প্রতিফলিত হয়নি। উক্ত জরীপে যেন দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি অনুসরণ করে জরীপ করা যেতে পারে এবং এ

Scanned with CamScanner

CamScanner

ক্ষেত্রে বিগত সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা, সমসাময়িক পটপরিবর্তন, ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যে সকল ছাত্র জনতা শহীদ হয়েছেন এবং অঙ্গহানী হয়ে শারীরীকভাবে বিকলাঙ্গ হয়েছে এবং যারা এখন ও অসুস্থ আছেন সে সকল তালিকা অনুযায়ী শহীদ গণের পরিবারের সদস্য এবং শারীরীক ভাবে বিকলাঙ্গ হয়েছে এবং যারা এখন ও অসুস্থ আছেন তাদের মতামত জরীপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যে সকল প্রশ্ন কেমন পুলিশ চাই জরীপে আলাদা ভাবে করা হয়েছে (প্রশ্ন মালা) প্রত্যেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ন পুলিশ সংস্কার প্রস্তাবে ভূমিকা রাখার জন্য প্রসংশনীয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নের বিষয়ে পৃথক জরীপ করা যেতে পারে এবং উপাত্তে যেন সকল জনগনকে বিবেচনায় রেখে জরীপ করা হয় এ বিষয় বিবেচনায় রেখে সংস্কার প্রস্তাব করা যেতে পারে।

৯। বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন পুলিশ/জেলা পুলিশে আইনি পরামর্শক, পদায়ন/নিয়োগঃ
দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধী সনাক্তকরণের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা পুলিশের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তদন্তকাজে আইনী সহায়তা ও আদালতে আসামী পক্ষের উকিলের সওয়াল/জেরা যথাযথভাবে মোকাবিলার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশ/জেলা পুলিশে দক্ষ, নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ আইনজ্ঞ/আইন বিশারদ/আইনজীবীদের সমন্বয়ে (৩/৫ জন) **"লিগ্যাল প্যানেল"** সৃষ্টি করা যেতে পারে। (চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এর মাধ্যমে)

১০। পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট গুলো যেমন শিল্প পুলিশ, নৌ পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, পর্যটন পুলিশ এই ইউনিটগুলোর কাজের ওভার ল্যাপিং বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিবেচনায় পুলিশ বাহিনীতে নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২। কমিউনিটি পুলিশের বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। জনগনের জন্যই পুলিশ। জনবান্ধব পুলিশের গুরুত্ব অনস্বিকার্য। তবে পুলিশ বাহিনীকে আইন বিধি এর মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক কাজ করা নিশ্চিত করলে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা যাবে। পুলিশের উপর জনগনের আস্থা ফিরে আসবে।

উক্ত প্রস্তাব পুলিশ সংস্কার কমিশনে প্রেরণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাসিমুল গনি
সভাপতি
ও
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

Scanned with CamScanner

CamScanner

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৬.৯৯.০১১.২৪-২৩৬

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪৩১
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (পুলিশ-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এবং র‌্যাব ১ ও ২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(রেবেকা খান)
উপসচিব
ফোনঃ ০২-২২৩৩৫৪৫২৯
Email: police3@mhapsd.gov.bd

Scanned with CamScanner
CamScanner

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের (খসড়া) এর উপর জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতঃ

মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, আইনশৃংখলা রক্ষা করা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সর্বোপরী পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশ বাহিনীর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা/সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিশন এর পুলিশ সংস্কার এ গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল প্রতিবেদন এর আলোকে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনার জন্য মতামত প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশের সক্ষমতা একদিকে বৃদ্ধি করতে এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান মেনে, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জনগনের আস্থার স্থানে অবস্থান করবে এবং সার্বিকভাবে পুলিশ বাহিনীকে একটি দক্ষ, কর্তব্য পরায়ণ, মর্যাদাশীল বাহিনী হিসেবে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জীবন, সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

১। সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করাঃ

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বাহিনীর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং, অভিযোগ নিষ্পত্তি, পলিসি প্রণয়ন এবং পুলিশের নিরাপত্তা সামগ্রিক বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশের অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একই সাথে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য ও জননিরাপত্তা বিভাগ , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দক্ষতার সাথে কাজ করছে। স্বাধীন পুলিশ কমিশন করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সচিবকে কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে এবং সদস্য সচিব রাখা হয়েছে পুলিশ প্রধানকে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ যেখানে মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ বাহিনী উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাহিনী সেখানে সিনিয়র সচিবকে সদস্য হিসেবে রেখে পুলিশ প্রধানের অধিনস্থ হয়ে কাজ করার প্রস্তাবের সামিল। স্বাধীন পুলিশ কমিশন করলে নিয়ন্ত্রণকারী কোন কতৃপক্ষ থাকবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং পুলিশ বাহিনীকে যৌক্তিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে না। সুতরাং স্বাধীন পুলিশ কমিশন করার প্রস্তাবের সাথে জননিরাপত্তা বিভাগ যৌক্তিক কারণে দ্বিমত পোষণ করছে।

২। মেট্রোপলিটন/জেলা পুলিশের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগঃ

পুলিশ বাহিনী আইন শৃংখলা রক্ষার্থে এবং জনগনের জান মাল রক্ষার্থে নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করে। বিচার করা/আদেশ দানের কাজ নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নয়। বিচার করা/নির্বাহী আদেশ দানের জন্য সরকারের পর্যাপ্ত সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা স্বাপেক্ষে সরকার এ ক্ষেত্রে বিধিসম্মত পদ্ধতিতে অধিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দান করতে পারে। পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চাওয়ার প্রেক্ষিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কার্যসম্পাদনের জন্য দেয়া হয়নি এই পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়নি কোথাও। এছাড়া এক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যক্রম পরিচালনায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে যার পরিণতি অনুমেয়। কেউ কারো কাজ করবে না। পুরো শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। বিদ্যমান আইনী কাঠামোতে উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য নয় মর্মে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কাছে প্রতিয়মান হয়। "An armed man shall be controlled by an unarmed man". বিষয়টি মাথায় রেখে পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতায়ন এর প্রস্তাব করতে হবে।

৩। আইনী ও প্রবিধানিক: ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮, পিআরবি ১৯৪৩, পুলিশ আইন ১৮৬১,সহ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ প্রস্তাবঃ

বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান সমূহ পুলিশ বাহিনীকে দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতার সাথে কাজ করার জন্য যথেষ্ট। উক্ত আইন বিধিসমূহ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নেই। উক্ত আইন ও বিধি বিধানসমূহ মেনে কাজ করলে অবশ্যই পুলিশ বাহিনী জবাবদিহিতার সাথে কাজ করতে পারবে। কতিপয় পুলিশ সদস্যের আইন না মানার কারণে এবং আইন বহির্ভূতভাবে রাজনৈতিক প্রভাবে ,নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজ করার জন্যই পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। সংস্কার প্রস্তাবে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮, পিআরবি ১৯৪৩, পুলিশ

Scanned with CamScanner

CamScanner

আইন ১৮৬১,সহ ও বিদ্যমান আইন-প্রবিধানের পুনর্নিরীক্ষণ ও হালনাগাদকরণ প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত আইন ও বিধিং কোন সেকশন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীর স্বচ্ছ এবং জবাব দিহিতার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা স্বরুপ তা উল্লেখ করা হয়নি। কতিপয় নতুন অপরাধের ধরণ বিবেচনায় (যেমন সাইবার ক্রাইম) এবং আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার/পদ্ধতি অনুসরণে তদং পরিচালনার ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা বিবেচনায় আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে/আন্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে কতিপয় f সংশোধনের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

৪। জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠনঃ

জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কমিশনের যে কার্যপরিধি রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশনের কার্যাবলী:

(১) জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে এর কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসের নিম্নলিখি কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করবে এবং পুলিশি ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণে সহায়তা করবে। কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়ে সময়ে সমে সরকারের সাথে সমন্বয়পূর্বক জনস্বার্থে পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে

(ক) জাতীয় জননিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা;

(খ) পুলিশ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/প্রবিধি প্রস্তুত, সংশোধন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়) প্রেরণ করবেন:

(গ) পুলিশের আইনগত বলপ্রয়োগের পরিধি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা;

(ঘ) পুলিশের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রমিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরন করা;

(ঙ) পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়গুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(চ) পুলিশ সদস্যদের সংক্ষোভ নিরসন বা Grievance Redress এর বিষয়গুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ছ) পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ ব্যবস্থাপনা (Wellbeing) পর্যালোচনা করা এবং এতদসংক্রান্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সরকারের কাছে দাখিল করা;

(জ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট পর্যালোচনা ও ঝুঁকির অগ্রাধিকার নিরুপনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) পুলিশ ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্ত: প্রতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্তে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ঞ) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি আত্মীকরণ, ব্যবহার নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ট) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় (Criminal Justice System) বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অধিকতর গতিশীল করা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতের বাধা দূর করার ব্যবস্থা করা;

উক্ত সকল কাজ বর্তমানে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা হচ্ছে। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের GRS সিস্টেমের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণ রয়েছে এর অধীনে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে এবং নিয়মিত প্রতিবেদন দেয়া হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও করা হচ্ছে সেখানে নতুন করে পুলিশের জন্য আলাদা GRS সিস্টেম চালু করা হলে তা জাতীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি সিস্টেমের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠন করা হলে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজের ওভারল্যাপিং হবে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। এ বিবেচনায় যেহেতু জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশনের প্রস্তাবিত সকল কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেহেতু জাতীয় জননিরাপত্তা কমিশন গঠন যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয় না।

Scanned with CamScanner

CamScanner

৫।**বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ড এবং তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত:**
ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯৯৮ এর ধারা ৫৪ এবিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও ধারা ১৬৭ এর অধীনে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতনের বিষয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক কারণে কেবল হয়রানির উদ্দেশ্যে পুলিশ উক্ত সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরোয়ানা ছাড়াই হাজার হাজার বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রেফতারকৃতদেরকে সরকারের আজ্ঞাবহ নিম্ন আদালতের মাধ্যমে যুক্তিহীন ও অসংখ্য দিনের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে। অধিকতর তদন্তের জন্য রিমান্ডের কথা বলা হলেও রিমান্ডে নিয়ে মূলতঃ আসামীদেরকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এরূপ নির্যাতনে বহু মানুষকে পঙ্গুত্ববরণ, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মতামত হলো ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯৯৮ এর ধারা ৫৪ এর অধীনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে হলে গ্রেফতারের ক্ষেত্র সমূহ ফৌঃ কাঃ ৫৪ ধারায় উল্লেখিত ৯ টি ক্ষেত্র সমূহ এর উপস্থিতি আছে কিনা এটা নিশ্চিত করতে হবে জনগনকে প্রচারের মাধ্যমে উক্ত ০৯ টি ক্ষেত্র সমূহ জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে, এবং আদালতের শুনানী ছাড়া কারাগারে প্রেরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে ৫৪ ধারার নামে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে এনে অন্য কোন মামলায় যেখানে অজ্ঞাত আসামী উল্লেখ করা আছে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করে জন হয়রানী করা হয়। হয়রানী বন্ধে বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে অবশ্যই লিখিত ভাবে রিপোর্টে থাকতে হবে তাকে ৫৪ ধারাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রমাণের দায়িত্ব দু'পক্ষেরই থাকবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। প্রমাণের দায়িত্ব দু'পক্ষেরই থাকবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সকল গ্রেফতারের সময় পুলিশের নির্ধারিত পোশাকে এবং বডি ক্যামেরাসহ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে ১৬৭ ধারায় রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জিজ্ঞাসাবাদ এর কক্ষটি কাচ দিয়ে ঘেরা থাকবে। আসামীর প্রতি নির্যাতন এর অভিযোগ হ্রাস পাবে।

এক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট মামলার হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করা যেতে পারে।

৬। **বাংলাদেশ পুলিশ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাঃ**
বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল যৌক্তিকতা প্রদান করা হয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আরো দক্ষ এবং উপযোগী করতে এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার প্রয়োজন রয়েছে তবে যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তার সকল বিষয়ে বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এবং বর্তমান প্রচলিত বিধি অনুযায়ী আবেদন করলে উক্ত বিষয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ব্যয় বিবেচনায় উক্ত প্রস্তাব ব্যয় বহুল। উক্ত ব্যয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ না করে পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ, জীবন মান উন্নত করণ, লজিস্টিক বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার নির্মাণ, তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত প্রতিয়মান হয়।

৭। **ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব প্রতিষ্ঠাঃ**
আধুনিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছভাবে তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটি আধুনিক মানসম্মত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তবে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে উক্ত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালের অধীন করা যেতে পারে।

৮। **"কেমন পুলিশ চাই" জনমত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ ও মতামতঃ**
পুলিশ সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বিগত ৩১-১০-২০২৪ ইং তারিখে 'কেমন পুলিশ চাই' উপপাদ্যের আওতায় একটি প্রশ্নমালা অনলাইনে প্রচার করা হয়। মোট ২৪,৪৪২ জন মতামত প্রদান করেছেন। জরীপের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে মর্মে প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত জরীপে মাত্র ২৪,৪৪২ জনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে এবং উক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি বা টুলস (Statistical measures and tools) ব্যবহার করা হয়নি। কোনো তথ্য সংগ্রহকারী (data collector) নিয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা এ কারণে সাধারণ জনগন এবং দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বড় অংশ শিক্ষার্থীদের মতামত আলাদাভাবে নেয়া হয়েছে কিনা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। ফলে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী বা আমজনতার মতামত প্রতিফলিত হয়নি। উক্ত জরীপে যেন দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি অনুসরণ করে জরীপ করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে বিগত সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা, সমসাময়িক পটপরিবর্তন, ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে বৈষম্য বিরোধী

Scanned with CamScanner

CamScanner

ছাত্র আন্দোলনে যে সকল ছাত্র জনতা শহীদ হয়েছেন এবং অঙ্গহানী হয়ে শারীরীকভাবে বিকলাঙ্গ হয়েছে এবং যারা এখন ও অসুস্থ আছেন সে সকল তালিকা অনুযায়ী শহীদ গণের পরিবারের সদস্য এবং শারীরীক ভাবে বিকলাঙ্গ হয়েছে এবং যারা এখন ও অসুস্থ আছেন তাদের মতামত জরীপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যে সকল প্রশ্ন কেমন পুলিশ চাই জরীপে আলাদা ভাবে করা হয়েছে (প্রশ্ন মালা) প্রত্যকেটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ন পুলিশ সংস্কার প্রস্তাবে ভূমিকা রাখার জন্য প্রসংশনীয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নের বিষয়ে পৃথক জরীপ করা যেতে পারে এবং উপাত্তে যেন সকল জনগনকে বিবেচনায় রেখে জরীপ করা হয় এ বিষয় বিবেচনায় রেখে সংস্কার প্রস্তাব করা যেতে পারে।

৯। বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন পুলিশ/জেলা পুলিশে আইনি পরামর্শক, পদায়ন/নিয়োগঃ দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধী সনাক্তকরণের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা পুলিশের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তদন্তকাজে আইনী সহায়তা ও আদালতে আসামী পক্ষের উকিলের সওয়াল/জেরা যথাযথভাবে মোকাবিলার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশ/জেলা পুলিশে দক্ষ, নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ আইনজ্ঞ/আইন বিশারদ/আইনজীবীদের সমন্বয়ে (৩/৫ জন) **"লিগ্যাল প্যানেল"** সৃষ্টি করা যেতে পারে। (চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এর মাধ্যমে)

১০। পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট গুলো যেমন শিল্প পুলিশ, নৌ পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, পর্যটন পুলিশ এই ইউনিটগুলোর কাজের অভার ল্যাপিং বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিবেচনায় পুলিশ বাহিনীতে নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২। কমিউনিটি পুলিশের বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। জনগনের জন্যই পুলিশ। জনবান্ধব পুলিশের গুরুত্ব অনস্বিকার্য। তবে পুলিশ বাহিনীকে আইন বিধি এর মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক কাজ করা নিশ্চিত করলে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা যাবে। পুলিশের উপর জনগনের আস্থা ফিরে আসবে।

Scanned with CamScanner

(মূল প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬.২৬ দ্রষ্টব্য ৯৯ পৃষ্ঠা):

বাংলাদেশ পুলিশের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ দমন। এনভাইরনমেন্টাল ক্রিমিনোলজি অপরাধের স্থান, সময় এবং ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করে, যা অপরাধ দমনে একটি কার্যকর কৌশল। এনভাইরনমেন্টাল ক্রিমিনোলজি অনুসারে অপরাধ সংঘটিত হয় তখনই, যখন অপরাধের ইচ্ছা, সুযোগ এবং অপরাধ প্রতিরোধে দুর্বলতা এক সূত্রে কাজ করে। বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট এই ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট এলাকায় দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ পুলিশ দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা এবং অপরাধ দমনে বিভিন্ন বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করেছে। প্রতিটি ইউনিট তার নির্দিষ্ট কার্যক্রম ও কর্মপরিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সেগুলোতে কর্মরত পুলিশ ইউনিটগুলোর কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

১. পার্বত্য এলাকা: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ভৌগলিকভাবে দুর্গম এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই এলাকায় ভূমি বিরোধ, সশস্ত্র সংঘাত এবং আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত বিরোধ সাধারণ অপরাধকে সহিংসতায় রূপান্তরিত করে। এনভাইরনমেন্টাল ক্রিমিনোলজি দৃষ্টিকোণ থেকে, এই এলাকার ভৌগলিক এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতা অপরাধ প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে।

- পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগলিক বৈচিত্র্য এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা একটি জটিল চ্যালেঞ্জ। এই অঞ্চলে বিশেষ পুলিশ ইউনিট আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে।

- অবস্থান: বান্দরবান, রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়ি।
- আয়তন: চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন প্রায় ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার।
- জনসংখ্যা: চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ১.৬ মিলিয়ন জন বসবাস করে।
- অপরাধের ধরন: ভূমি বিরোধ, সশস্ত্র সংঘাত, এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিট: স্থানীয় থানা পুলিশ, বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) এবং এপিবিএন।
- বিশেষ কার্যক্রম:
  - ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।
  - স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা।

২. নদী অঞ্চল: বাংলাদেশের নদীমাতৃক ভৌগলিক অপরাধের জন্য কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। চোরাচালান, জলদস্যুতা এবং মানবপাচারের মতো অপরাধ এই অঞ্চলের সাধারণ সমস্যা। অপরাধীরা সুযোগের সন্ধানে থাকে এবং নৌপথের মতো স্থান তাদের জন্য দ্রুত পালানোর সুযোগ প্রদান করে।

- নদী অঞ্চলের জটিল নৌপথ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে নদী পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- অবস্থান: বরিশাল, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, খুলনা, এবং ভোলা।
- আয়তন: নদী নেটওয়ার্কের মোট আয়তন প্রায় ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার।
- জনসংখ্যা: এই অঞ্চলে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে।

- অপরাধের ধরন: নদীপথে দস্যুতা, চোরাচালান, এবং মানবপাচার।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিট: নৌ পুলিশ এবং স্থানীয় ইউনিট।

- বিশেষ কার্যক্রম:
  - নৌ-পথে নিয়মিত টহল।
  - নদীপথে অবৈধ কার্যকলাপ রোধ।

৩. হাইওয়ে এলাকা: বাংলাদেশের মহাসড়কগুলো দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হলেও এগুলো ট্রানজিট অপরাধের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরাধীরা দ্রুত স্থানান্তরের সুবিধার জন্য মহাসড়ক ব্যবহার করে। তাই মহাসড়কগুলোতে পুলিশিং কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- বাংলাদেশের জাতীয় মহাসড়কগুলোতে যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে হাইওয়ে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- হাইওয়ে জোন সংখ্যা: ১০টি।
- অবস্থান: ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কসহ প্রধান করিডোর।
- মোট দৈর্ঘ্য: প্রায় ৩,৮০০ কিলোমিটার।
- জনসংখ্যা: প্রায় ৫০ মিলিয়ন।
- অপরাধের ধরন: যানবাহনের চুরি, সড়ক দুর্ঘটনা এবং ছিনতাই।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিট: হাইওয়ে পুলিশ।
- বিশেষ কার্যক্রম:
  - সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ।
  - দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার।

৪. শিল্প এলাকা: শিল্পাঞ্চল এলাকাগুলো শ্রমিক আন্দোলন, আর্থিক প্রতারণা এবং নিরাপত্তাহীনতাজনিত সংঘাতের জন্য অপরাধপ্রবণ। অপরাধীরা অর্থনৈতিক কেন্দ্রে সংঘাতের সুযোগ কাজে লাগায়। গুজব, বৈষম্য এবং শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশের শিল্প পুলিশ কাজ করছে।

- শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক এবং কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিল্প পুলিশ বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।
- শিল্প পুলিশ জোন সংখ্যা: ১১টি।
- অবস্থান: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, সাভার, এবং কুমিল্লা।
- অপরাধের ধরন: চুরি ও কারখানা ভাঙচুর।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিট: শিল্প পুলিশ।
- বিশেষ কার্যক্রম:
  - শ্রমিকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সংলাপ।
  - শিল্প কারখানার শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ে কাজ করা।

৫. বনাঞ্চল: বাংলাদেশের বনাঞ্চল পরিবেশগত অপরাধের প্রধান ক্ষেত্র। কাঠ চোরাচালান, বন্যপ্রাণী শিকার এবং কৃষিজমি দখল এ অঞ্চলের সাধারণ সমস্যা।

- বনাঞ্চল রক্ষায় এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বন পুলিশ ও স্থানীয় থানা পুলিশ বিশেষভাবে নিয়োজিত।
- অবস্থান: সুন্দরবন, লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।
- আয়তন: সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।
- অপরাধের ধরন: কাঠ চোরাচালান, অবৈধ শিকার।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিট: স্থানীয় থানা পুলিশ, বন রক্ষী বাহিনী।

৬. পর্যটন এলাকা: বাংলাদেশের পর্যটন এলাকা যেমন কক্সবাজার, সুন্দরবন, এবং বান্দরবান, দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়। তবে অপরাধীরা এই স্থানগুলোতে পর্যটকদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

- বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত ট্যুরিস্ট পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
- পর্যটন পুলিশ স্পট সংখ্যা: ১২টি।
- অবস্থান: কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন, সুন্দরবন, সাজেক ভ্যালি, এবং জাফলং।
- পর্যটকদের সংখ্যা: পর্যটন মৌসুমে ২-৩ মিলিয়ন।
- অপরাধের ধরন: চুরি, ছিনতাই, পর্যটকদের হয়রানি।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিট: ট্যুরিস্ট পুলিশ, স্থানীয় থানা।
- বিশেষ কার্যক্রম:
  - পর্যটকদের তথ্য ও সহায়তা প্রদান।
  - অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিত টহল।

অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নেওয়া অপরিহার্য। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি বিশেষায়িত ইউনিট এই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করছে। তবে কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি ইউনিট তাদের নির্ধারিত ভূখন্ড এবং প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিটগুলোর কার্যক্রম আরও দক্ষ করতে প্রযুক্তি সংযোজন, প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন।